গাযওয়াতুল হিন্দ

কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে

মাওলানা আবু মুসআব হাফিযাহুল্লাহ

গাযওয়াতুল হিন্দ
কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে

ড. আইমান সাদীদ

সম্পাদনা
মাওলানা আবু মুসআব হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশনায়
শায়েখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আয্যাম রিসার্চ সেন্টার

অর্পণ...

সাইয়্যেদুল মুজাহিদীন নবীউস-সাইফ,
নবীউল-মালাহিম, রাহমাতুল লিল আলামীন
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরে।
যিনি ১৪১০ বছর আগে "গাযওয়াতুল হিন্দ"-এর
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

ও

আসন্ন *গাযওয়াতুল হিন্দ*-এ
অংশগ্রহণকারী
সকল আনসার ও মুহাজিরগণের
সাফল্য কামনায়...

দ্বিতীয় সংস্করণের অভিব্যক্তি

সকল প্রশংসা শুধুই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করে ঈমানের মতো মহা-মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন এবং সাথে সাথে সেই সম্পদ রক্ষার কার্যকরি পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন। শত-কোটি দুরুদ ও সালাম সাইয়্যেদুল মুজাহিদীন নবীউস-সাইফ নবীউল-মালাহিম রাহমাতুল লিল আলামীনের উপর যিনি বদর থেকে উহুদ, উহুদ থেকে খন্দক, খন্দক থেকে হুনাইন এভাবে মাত্র দশ বছরে ২৭ টি রণাঙ্গনে নিজের পবিত্র রক্ত ও ঘাম ঝরিয়ে এবং ৫৬ টি রণাঙ্গনে সাহাবায়ে কেরামের কাফেলা প্রেরণ করে তার জীবদ্দশায়ই মোট ৮৩ টি লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়ে উম্মতকে একটি সুরক্ষিত দীন উপহার দিয়ে গেছেন এবং নিজের দান্দান মোবারক শহীদ করে ও নিজের শত শত প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামের জীবন উৎসর্গ করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে এই মহান দীনের হেফাজত ও সংরক্ষণের বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! যে শিক্ষার ফলে আজ দেড় হাজার বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় এসেও আমরা বিশ্বব্যাপী সেই দীনের জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী একটি রক্ত পিচ্ছিল কাফেলার বিজয়ী পদচারণা দেখতে পাই। যেই কাফেলার নিকট এ পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় সকল সুপারপাওয়ার তথা পরাশক্তি তাদের পরাজয়ের স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। ইন শা' আল্লাহ ভবিষ্যতেও হতেই থাকবে। আর হক-বাতিলের এই জয়-পরাজয়ের বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের নাম **"গাজওয়াতুল হিন্দ"** তথা হিন্দুস্তানের লড়াই। যা নিয়েই রচিত এই গ্রন্থটি। আলহামদুলিল্লাহ মাত্র দুই মাসে যার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে

যাওয়াই প্রমান করে বাংলাদেশী পাঠকদের নিকট বিষয়টির গুরুত্ব কতোটা অপরিসীম। একে একে পাঁচ মাসে শেষ হয় প্রায় ৬ হাজার কপি। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলা ভাষায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিই একমাত্র অবলম্বন। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ বিষয়টির শূন্যতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করেই আমাদের বর্তমান সংস্করটি। যা সত্যানুসন্ধানী পাঠককে গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য কিছুটা হলেও যথাযথ ও পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই যে সকল পাঠক পূর্বের বইটি সংগ্রহ করেছেন তাদের জন্য বর্তমান সংস্করণটিও সংগ্রহ করা একান্ত জরুরি বলে মনে করছি।

অবশেষে প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যথাযথভাবে গাজওয়াতুল হিন্দ ও মালহামা তথা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফিক দান করুন। ক্ষুদ্র এ কাজটি লেখক এবং পাঠক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য কাল হাশরে নাজাতের জরিয়া বানান। শাহাদাতে উযমা নসীব করুন। আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

ড. আইমান সাদীদ

১৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী

১৫ জানুয়ারী ২০২০ ঈসায়ী

০১ মাঘ ১৪২৬ বাংলা

রাত. ২ টা ২১ মিনিট

আপনাকে কেন?

গাযওয়াতুল হিন্দ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জবাননিসৃত দুটি শব্দ। ১৪০০ বছরের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস জড়িয়ে আছে মধু মাখা শব্দ যুগলে। কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পুঁজি করে কত সাহাবী ও তাবেয়ী লহু লাল ঝরিয়েছেন এই পবিত্র মাটিতে। নাম না জানা কত তাবেয়ী ও আইম্মাহ জীবনের শেষ রক্তটুকু উৎসর্গ করেছেন এই হিন্দের মাটিতে। নববী ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যরূপে প্রস্ফুটিত করতে কে জানে কত জীবন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে এই মাটিতে। হাদিসের ভাষ্যমতে কালের অন্তিম লগ্নে (কেয়ামত অবধি) খুন ঝরাবে মুসলিম এই মাটিতে। লাখো কোটি মুসলিম এই পবিত্র মাটির বরকত উসিলায় পেয়েছেন শহিদ-গাজীর মর্যাদা। ইনশাআল্লাহ এ লড়াই চলবে। কেয়ামত অবধি চলবে সভ্যতার এ সংঘাত। পৃথিবীতে হক ও বাতিলের, সত্য ও মিথ্যার, আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ-সংঘাত চিরন্তন ও আপোষহীন। ইসলামের শুরুলগ্ন থেকেই দানা বেঁধেছে হক ও বাতিলের চিরন্তন সেই সংঘাত। সর্বপ্রকার বাঁধা বিপত্তি, বিরোধিতা ও আক্রমণের ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে ইসলাম সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছে। "মুসলিম" জাতি মরতে পায় না ভয়। প্রতিটি মুসলিম শিশু জন্মগত ভাবে নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করতে শেখে। দিলের শেষ রক্ত কণিকা জিইয়ে সে শহিদের তামান্না অন্তরে আগলে রাখে।

কিন্তু যদি তামান্নার বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি হয় রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত পথে! যদি সে কন্টকময় পথের শেষে মেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিজয় সুসংবাদ!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কখনই মুমিন হতে পারবে না, যাবৎনা আমাকে ভালোবাসো দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি। নিজের জান মাল এবং সন্তান সন্তানাদীর থেকেও বেশী।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জান ও মালকে খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। মুসলিম তো সওদা করতেই এসছে। দুনিয়ার সেরা সওদা তো সেটাই যা দুনিয়ার রবের সাথে করা হয়।

সত্যিকারের সঠিক ও চৌকান্না সওদাকারী তো সেই যে, ক্রেতার হক পূর্ণরূপে আদায় করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত প্রতিটি যুগে পাঠিয়েছেন তার উপযোগী বাসিন্দাকেই। যেমন ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু -এর প্রসিদ্ধ উক্তি "আরে তারা তো প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী সাহাবি, আল্লাহ তাদেরকে বেছে নিয়েছেন একমাত্র প্রিয়নবীর সান্নিধ্যের জন্য!।

হ্যা; আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নবীর সোহবতের জন্যই বাছাই করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময় প্রয়োজন ছিল দ্বীনের এমন ধারক বাহক যারা দ্বীনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝবে এবং দ্বীনের প্রতিটি আহকাম সঠিকরূপে মুখস্থ করে হেফাযত করবে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর সাথী করেছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী সাহাবিগণকে এবং তাদের সাথী বানিয়েছেন তাবেয়ীগণকে।

যখন মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র হাদিসসমূহে, তখন আল্লাহ দুনিয়াতে নবীর ওয়ারিশ করে পাঠান এমন ওয়ারিশে নবী মুহাদ্দিসগণকে যারা মিথ্যা ও মিথ্যার মিশ্রণ থেকে সহিহ ও সঠিক হাদিসকে বের করে আনেন। যেমন সূক্ষ্মদর্শী আটার খামিরা থেকে চিকন চুলকে বের করে থাকেন।

ঠিক তেমনই ইতিহাসের এই অন্তিমলগ্নে আপনার ও আমার অবস্থান কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। ইসলামকে কফিনবদ্ধ করে যখন শেষ পেরেকটি এঁটে দেয়া হচ্ছে এমন সময়ে আমার আপনার অবস্থান কোনো নিছক ঘটনাপ্রবাহ নয়। বরং আলিমুন হাকিম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোন কিছুই খেলতামাশা নয়। অবশ্যই আপনার আমার অবস্থানের পেছনে রয়েছে ঐশী ভাবধারার এক গভীর অন্তমিল।

দিলের কান দিয়ে, গভীর নিশ্বাস ফেলে, আখিদ্বয় বন্ধ করে অন্তত একবার চিন্তা করুন, কেন? কোন্ ঐশী প্রেক্ষাপটকে বাস্তবায়নের জন্য উম্মাহর ব্যথাতুর লগ্নে আপনাকে প্রেরণ করেছেন।

কারণ আল্লাহ আপনার সাথে কৃত সওদা পূর্ণ করতে চান। আল্লাহ আপনাকে সাজরব পূর্ণ বাগবাগিচার মালিক বানাতে চান। আল্লাহ আপনাকে কবরের আঁস্তাকুড়ে বদ্ধ রাখতে মোটেও চাননা। আল্লাহ চান আপনাকে মারযিয়ার স্বামী বানাতে। আল্লাহ চান আপনি সবুজ পাখি হয়ে, সবুজ পাখির বুকে হয়ে জান্নাতে ঘুরে বেড়ান। আল্লাহ চান আপনি ১৪০০ বছর পরে এসেও ১৪০০ বছর পূর্বের নববী গাযওয়ার সাওয়াব হাসিল করেন।

হ্যা! আমার প্রিয় ভাই, আমি সত্যিই বলছি, আল্লাহ আপনাকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই অন্তিমলগ্নে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই হিন্দের যোদ্ধা মাটিতে জন্মদান করেননি। আল্লাহ চান আপনি খাইরুশ শুহাদা শুহাদা -এর মর্যাদা হাসিল করেন। আল্লাহ চান আপনি গাজী হয়ে গুনাহমুক্ত জীবনযাপন করেন।

আর এ মহা সফলতার উপলব্ধি আপনি তখনই করতে পারবেন যখন আপনি হিন্দ বিষয়ক নববী ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পর্যালোচনা করতে শিখবেন। যখন আপনি হিন্দ -এর অতিত ও বর্তমান ইতিহাস সামনে রেখে নিজ অবস্থানকে বিবেচনা করবেন এ সত্য ভোরের ন্যায় আপনার কাছে প্রস্ফুটিত হবে।

সত্যি বলতে প্রতিটি মুসলমানের মতো আমরাও বর্তমান হিন্দ ও আমাদের অবস্থান নিয়ে ভাবতাম। বক্ষমান গ্রন্থটি আমাদের দীর্ঘ ভাবনার ঘরে তোলা ফসল। আজ আপনাদেরকে শুনাবো ভাবনার প্রতিটি পরতের আঁছড়ে পড়া ঢেউ তরঙ্গের আর্তনাদ। আজ আপনাদের শুনাবো হৃদয় নিঙরানো শেষ ব্যথাটুকু।

তো প্রিয় পাঠক, একটু নড়েচড়ে বসুন। কিছু সময়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়নে নিজেকে নিমগ্ন রাখুন। ইনশাআল্লাহ হয়তো আল্লাহ আমাদের জন্য কোন খাইর ও কল্যাণ সুপ্ত রেখেছেন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে।

গ্রন্থটির ধারা সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করছি

প্রথম পাঠ : হাদিসসমূহের পর্যালোচনা ও হাদিস থেকে মৌলিক কিছু পাঠ উপলব্ধি।

দ্বিতীয় পাঠ : কিছু অপপ্রচার নিধনে যইফ হাদিস নিয়ে একটি পর্যালোচনা।

তৃতীয় পাঠ : হিন্দ ও সিন্দ-এর ভৌগলিক বিশ্লেষণ।

চতুর্থ পাঠ : যুগে যুগে হিন্দ এলাকায় মসিলমানদের অভিযান ও প্রতিশ্রুত গাযওয়াতুল হিন্দ।

পঞ্চম পাঠ : হাদিসে বর্ণিত হিন্দে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা।

ষষ্ঠ পাঠ : বর্তমানের খণ্ড ঘটনাপ্রবাহ ও বিশ্ব পর্যালোচনা।

পরিশিষ্ট:

১. আখেরি গুয়ারিশ।

২. কোন জামা'আর সাথে জিহাদ করবো? বাংলাদেশে কি উপযুক্ত জামা'আ আছে যারা সঠিকভাবে জিহাদ করছে?

৩ জিহাদের সাধারণ দিক-নির্দেশনা

৪. মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহবান

৫. মাওলানা আসিম উমার হফিযাহুল্লাহ -এর একটি বার্তা: আপনাদের মহাসাগরে কোনো ঝড় নেই কেন?

৬. শাইখ আইমান আল-জাওয়াহেরী হাফিজাহুল্লাহ -এর একটি বার্তা: কাশ্মীরকে ভুলে যেও না!

প্রথম পাঠ

আমদের আলোচনার প্রথম পাঠ মূলত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ঃ "*গাযওয়াতুল হিন্দ*" একটি মোবারক ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ "*গাযওয়াতুল হিন্দ*" ব্যাপারে নববি ভবিষ্যদ্বাণী।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ *গাযওয়াতুল হিন্দ* -এর হাদিসসমূহ থেকে উপলব্ধ শিক্ষা ও ইশারাসমূহ।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়
"গাযওয়াতুল হিন্দ"
একটি মোবারক ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী

গাযওয়াতুল হিন্দ ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবময় উজ্জ্বল অধ্যায়। ঈসা আলাইহিস সালাম -এর আগমনের পূর্বেই কাঙ্ক্ষিত মোবারক "গাযওয়াতুল হিন্দ"-এর সূচনাঘন্টা বাজবে।

অপরদিকে দ্বীনি বুনিয়াদ এবং শরয়ী উসুল বা মূলনীতিসমূহ নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করলে এবিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাস্তবেই গাযওয়াতুল হিন্দ এক দিক থেকে নববি গাযওয়াহ্ এবং সারিয়া সমূহেরও অন্তর্ভুক্তও বটে।

গাযওয়া দুই প্রকার

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গাযওয়াহসমূহ সংগঠিত হওয়ার দিক থেকে দুটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত।

১. غزوة واقعة *"গাযওয়ায়ে ওয়াকিআহ্"*।

২. غزوة موعدة *"গাযওয়ায়ে মাওইদাহ্"*।

১. "গাযওয়ায়ে ওয়াকিআহ বা অতীতে সংগঠিত গাযওয়াহসমূহ।

অর্থাৎ, ঐ সমস্ত গাযওয়াহসমূহ যেগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় তার জিন্দেগীতেই সংগঠিত হয়েছে। সীরাতগবেষক এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে এসকল গাযওয়াহসমূহ দু ভাগে বিভক্ত। *১. গাযওয়াহ। ২. সারিয়্যাহ।*

নীচে এ দুই প্রকারের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা সবিস্তার আলোচনা করা হল।

ক. *গাযওয়াহ্* -এর আভিধানিক বিশ্লেষণ।

الغزوة في اللغة اسم،

"আলগাযওয়াহ্" (যুদ্ধাভিযান, আক্রমণ) এটি বিশেষ্য বাচক শব্দ।

وجمعها: غَزَوات، وغَزْوات،

-এর বহুবচন *গাযাওয়াতুন* এবং *গাযওয়াতুন*।

الغَزْوُ: السيرُ إلى قِتالِ العَدُو،

শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যাত্রা করা।[১]

والغزوة مصدر مرّةٍ؛ فهي المرّة من الغَزْو،

আলগাযওয়াতু এটা একক নির্দেশক ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ, একবার আক্রমণ করাকে গাযওয়াহ্ বলা হয়।[২]

গাযওয়াহ্ -এর পারিভাষিক অর্থ

গাযওয়াহ্ (غزوة) বলা হয় ঐ সকল যুদ্ধসমূহকে, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং যুদ্ধে মুজাহিদিন ও সাহাবাগণের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সংখ্যার দিক থেকে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। মুসা ইবনে উকবা, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রাহিমাহুমাল্লাহ সহ আরো অনেকে বলেন-২৭টি।[৩] জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিআল্লাহু থেকে বর্ণিত ২১টি।[৪] এবং যায়েদ ইবনে আরকাম রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ১৯টি।[৫]গাযওয়াতুল হিন্দকে কেন গাযওয়া বলা হয় অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

١. [مجمع البحرين : ١ / ٣١٥، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي، المولود سنة : ٩٧٩ هجرية بالنجف / العراق، والمتوفى سنة : ١٠٨٧ هجرية بالرماحية، والمدفون بالنجف / العرا، الطبعة الثانية سنة : ١٣٦٥ شمسية، مكتبة المرتضوي، طهران / إيران].

2. [https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ غزوة/]

৩. [মালেকি মাযহাবের ফকিহ্ , ইমাম ইবনে আল যুযী রাহিমাহুল্লাহ (আল কাওয়ানিনুল ফিকহ্,২/২৭২,২৭৩)]

৪. [সীরাতে মুস্তফা.২-৫২]

٥. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن زيد بن أرقم، الرقم: ٣٩٤٩، متفقٌ عليه.

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এই যুদ্ধ-অভিযান পরিচালনা করবেন না? ইনশাআল্লাহ *গাযওয়াতুল হিন্দ* -এর হাদিসসমূহ থেকে লব্ধ হেদায়েত ও ইশারা" শিরোনামের অধীনে আমরা এ বিষয়ে স্ববিস্তার আলোচনা করবো।

খ. সারিয়াহ্

মুহাদ্দিসিনে কেরাম এবং সীরাত গবেষকগণের পরিভাষা অনুযায়ী ঐ সকল গুরত্বপূর্ণ জিহাদকে সারিয়া বলা হয় যে সকল জিহাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে স্বশরীরে উপস্থিত হননি, কিন্তু তিনি কোন না কোন সাহাবিকে সে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে আদেশ দিয়েছেন।

ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সারিয়ার সংখ্যা ৪০টি। ইবনে আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত ৩৫টি। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ থেকে ৩৮টি। ওয়াকিদী রাহিমাহুল্লাহ থেকে ৪৮টি। এবং ইবনে জাওযী রাহিমাহুল্লাহ থেকে ৫৬টির বর্ণনা পাওয়া যায়।[১]

কাশ্‌শাফ ইসতিলাহাতুল ফুনুন ওয়াল উলুম গ্রন্থে মুহাম্মাদ আলি থানবী রাহিমাহুল্লাহ লিখেন,

هي الجيش الذي يخرج من بلاده أو موطنه؛ قاصداً قتال أهل الكفر ومواجهتهم، وقد كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قائداً ومُشاركاً في العديد من الغزوات، أمّا المواجهة التي لا يكون فيها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فيُطلَق عليها اسم السريّة[২].

অর্থাৎ, গাযওয়াহ্ বলা হয়, "এমন সেনা দল, যে নিজ দেশ থেকে অথবা জন্মভূমি থেকে আহলে কুফরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়েছে। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। আর যে সকল যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন না সেগুলোর ক্ষেত্রে সারিয়া ব্যবহার করা হয়।"

---

১. সীরাতে মুস্তফা.২-৫২

২. محمد علي التهانوي (١٩٩٦)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (الطبعة الأولى)، بيروت: مكتبة لبنان، صفحة: ١٢٥٣، جزء: ٢. بتصرّف.

এ সকল গাযওয়া পরিচালনার কারণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

অর্থ: যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ জন্য বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে,আমাদের রব আল্লাহ। আর আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।[৩]

২. গাযওয়ায়ে মাওঈদাহ বা ভবিষ্যদ্বাণীকৃত গাযওয়াহসমূহ:

প্রথম উদাহরণ:

عن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر

৩. সূরা আল হাজ্জ ২২-৩৯-৪১

আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্কি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্‌টা এবং মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।[১]

<u>দ্বিতীয় উদাহরণ:</u>

গাযওয়ায়ে মাওইদাহ্ -এর আরেকটি উদাহরণ যা কুস্তুন্তুনিয়্যাহ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বহন করে।

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم . فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا . فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم . فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشأم خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته " .

আবূ হুরাইরাহ্ রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসুল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় (সিরিয়ার অন্তর্গত) সেনাবাহিনী আ'মাক[২] অথবা দাবিক নহরের কাছে অবতীর্ণ হবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মাদীনাহ্ হতে এ দুনিয়ার সর্বোত্তম

---

১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯২৮

২. এই হাদিসটি মুহাদ্দিসিনে কেরামগণের নিকট হাদিসে আমাক নামে সুপরিচিত। এটি মালহামায়ে আমাক নামেও পরিচিত। এটি কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে ক্রসেডার এবং মুসলিম মুজাহিদিনগণের মাঝে সংগঠিত হবে। সুনানে আবু দাউদ ৮-১৯৬, মু জামুল বুলদান লিল হুমাইদি ২-২২২, সিয়ারু আলমিন নুবালা ৬-৩৫৭।

মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। তারপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার পর রোমীয়গণ বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, যারা আমাদের লোকদেরকে বন্দী করেছে। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। তখন মুসলিমগণ বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কক্ষনো সম্পর্কচ্ছেদ করব না। পরিশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পলায়নপর হবে। আল্লাহ তা'আলা কক্ষনো তাদের তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহর কাছে শহীদানের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে আর কক্ষনো তারা ফিত্নায় আক্রান্ত হবে না। তারাই কুস্তুনতুনিয়া বিজয় করবে। তারা নিজেদের তালোয়ার যাইতুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তদের মধ্যে শাইতান উচ্চৈ:স্বরে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা সংবাদ। তারা যখন সিরিয়া পৌঁছবে তখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হতে শুরু করা মাত্র সালাতের সময় হবে। অত:পর ঈসা আলাইহিস সাল্লাম অবতরণ করবেন এবং সালাতে তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহর শত্রু তাকে দেখামাত্রই বিচলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে মিশে যায়। যদি ঈসা আলাইহিস সাল্লাম তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সাল্লাম-এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা আলাইহিস সাল্লাম-এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন।[৩]

কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহাবীগণ গাজওয়াসমূহে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে অংশগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা পোষণ করতেন। আর এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা ঈমানের চাওয়া এবং প্রকৃত নবীপ্রেমের নিদর্শন। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগের পরে যখন তাঁর নেতৃত্বে জিহাদের সৌভাগ্য

---

৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭১৭০

অর্জনের সুযোগ নাই, তাই সালফে সালেহীনগণ এমন সুযোগের সন্ধানে থাকতেন, অন্তত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য যেন অবশ্যই অর্জন করা যায়।

এ প্রসংগে একটি চমৎকার দিলকাশ ঘটনা উল্লেখ করা যায়। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ -এর চাচা, সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ি কমান্ডার হজরত মাসলামাহ্ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান রাহ. -এর ব্যাপারে কতক হাদিসের কিতাবে এবং ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে,

حدثني عبد الله بن بشر الخشعمي عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش قال فدعاني مسلمة بن عبد المالك فسالني فحدثته فغزي فلسطين » روه الإمام أحمد في مسنده

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বাশার আল-খাশ'আমী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা হজরত বাশার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে এক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "ইস্তাম্বুল শহর অবশ্যই বিজয় হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ী বাহিনীর আমির হবে উত্তম আমির এবং এই বাহিনীর মুজাহিদগণ হবে উত্তম বাহিনী। এই হাদিস সম্পর্কে যখন হজরত মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক অবগত হলেন তখন তিনি বর্ণনাকারী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বাশার রাহিমাহুল্লাহকে ডেকে পাঠালেন। হজরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি আমার কাছ থেকে এই হাদিস শোনার পরে ইস্তাম্বুল আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন।" [১]

এই হাদিস যখন হযরত মাসলামা ইবনে আব্দুল মালেক রাহিমাহুল্লাহ শুনলেন তখন তিনি রারী আব্দুল্লাহ ইবনে বাশারকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো। হযরত আবব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, তার সাথে দেখা করলে, তিনি যখন আমার থেকে হাদিসটি শুনলেন তখনই তিনি ফিলিস্তিন আক্রমন করার ফায়সালা করলেন।

---

১. মুসনাদে আহমাদ। হাদিস নং: ১৮১৮৯

গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসে ইমাম বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর যে উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন, তাতে হজরত ইমাম আবু ইসহাক ফাজারী রাহিমাহুল্লাহ-এর বাণী উদ্ধৃত করেছেন, যখন তিনি এই হাদিস শুনেছেন তখন ইবনে দাউদের নিকট এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন,

وددت أني شهدت مارید بکل غزوة غزوتها في بلاد الروم

"হায়! আমার যদি রোমকদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদে অতিবাহিত গোটা জীবনের বিনিময়ে হলেও হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে নববী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ হতো।"[২]

ইমাম আবু ইসহাক ফাজারী রাহিমাহুল্লাহ-এর এই আগ্রহের কারণ ও তার গুরুত্বের পরিমাণের প্রশংসা- হজরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ-এর ঐ স্বপ্নের দ্বারা করা যায়, যা ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, "নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস চলছে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসার একটি স্থান খালি। আমি তখন এমন সুযোগকে দুর্লভ ও গনিমত মনে করে সেখানে বসার চেষ্টা করলাম। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে নিষেধ করলেন যে, এই বসার স্থানটি খালি নয়, বরং আবু ইসহাক ফাজারীর জন্য নির্ধারিত।"[৩]

---

২. সুনানে কুবরা: ৯/১৭৬

৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৮/৫৭২-৫৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে নববী ভবিষ্যদ্বাণী

গাযওয়াতুল হিন্দ নববি ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ঐ সকল গাযওয়ার অন্তর্ভুক্ত যার ফযিলত বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদিস বর্ণিত আছে। আহলে ইলম ও মুসলিম মনীষীগণ তাদের বর্ণনা এবং লেখালেখির মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। এখানে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী অনেক নির্ভরযোগ্য হাদিসের কিতাব থেকে সুন্দর তারতিব দিয়ে হাদিস বর্ণনা করবো। তারপর হাদিসসমূহের সহিহ্ এবং যইফ হওয়ার দিক নিয়ে আলোচনা করবো। -এরপর হাদিসগুলোর অর্থ, মর্ম ও মাফহুম-উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যালোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

সবশেষে আমরা এই হাদিসসমূহের আলোকে বর্তমান যামানায় তার বাস্তবতা এবং চলমান নানান প্রেক্ষাপট নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

যে সকল সাহাবি থেকে গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত আছে:

১.হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু।

২. হযরত ছাওবান রাযিআল্লাহু আনহু।

৩. হযরত কাআব ইবনে আমর রাযিআল্লাহু আনহু।

যে সকল সাহাবি থেকে গাযওয়ায়ে হিন্দে সম্পর্কিত আছার বর্ণিত আছে:

১. হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহুম।[১]

---

১. [নুআইম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতান, হা/১২৩৬; মুসনাদে ইসহাক্ব ইবনে রাহওয়াইহ, হা/৫৩৭]

২. হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু ।[২]

যে সকল আয়িম্মায়ে হাদিসগণ (হাদিস বিশারদগণ) গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করেছেন:

১. ইমাম আহমাদ তার *মুসনাদে আহমাদ* গ্রন্থে।
২. ইমাম ইবনে কাসির তার *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে।
৩. ইমাম নাসাঈ তার আস সুনানুল মুযতাবা ও *আস সুনানুল কুবরা গ্রন্থে।*
৪. ইমাম বাইহাকি *আস সুনানুল কুবরা* ও *দালায়েলুন নাবুয়াত* গ্রন্থে।
৫. ইমাম সুয়ুতি তার *আল জা'মেউল সাগির* ও *আল জামেউল কাবির* গ্রন্থে।
৬. আবু নাইম আসফাহানি তার *হিল ইয়াতুল আওলিয়া* গ্রন্থে।
৭. ইমাম হাকেম আল *মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইনে* গ্রন্থে।
৮. ইমাম সাঈদ ইবনে মানসুর *আস সুনান* গ্রন্থে।
৯. খাতিবে বাগদাদি তার *তারিখে বাগদাদ* গ্রন্থ।
১০. ইমাম নুআঈম ইবনে হামাদ *'আল-ফিতান'* গ্রন্থে।
১১. ইমাম ইবনে আবি আসেম *আল জিহাদ* গ্রন্থে।
১২. ইমাম ইবিনে আবি হাতেম তার আল *ঈলাল* গ্রন্থে।
১৩. ইমাম বুখারি তার আত *তারিখুল কাবির* গ্রন্থে।
১৪. ইমাম মিযিয় তার *তাহযিবুল* কামাল, গ্রন্থে।
১৫. ইমাম ইবনে হাজার আস-কালানি তার *তাহযিবুত তাহযিব* গ্রন্থে।
১৬. ইমাম তাবারানী তাঁর *আল-আওসাত* গ্রন্থে।
১৭. ইমাম ইবনে আদি তার আল *কামেল* গ্রন্থে।
১৮. ইমাম যাহাবি তার *মুসনাদে ফিরদাউস* গ্রন্থে।
১৮. ইমাম মুনাবি তার *আল জামে'উল সাগির* -এর ব্যাক্ষা *ফায়যুল ক্বাদির* গ্রন্থে।
২০. ইমাম ইবনে আসাকের তার *তারিখে দিমাশক* গ্রন্থে।

---

[২]. [মাযমাউজ যাওয়ায়েদ,৭/৩১০]

২১. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ্ তার *মুসনাদ* গ্রন্থে।

২২. আলহায়াতামি তার আল *মাজমাউয যাওয়ায়েদ* গ্রন্থে।

২৩. ইমাম বাযযার তার *মুসনাদ* গ্রন্থে।

যে সকল কিতাবে গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে

১. *মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থের,২/৩৬৯, ২/২২৯, ২/২৭৮*

২. *মুসনাদে আবু হুরাইরা গ্রন্থের-৮৪৬৭, ৬৮৩১*

৩. *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থের ৬/২২৩*

৪. *আস সুনানুল মুযতাবা ৬/৪২ কিতাবুল জিহাদ, বাব- গাযওয়াতুল হিন্দ, হাদিস ৩১৭৩,৩১৭৪*

৫. *আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৩/২৮, বাব- গাযওয়াতুল হিন্দ হাদিস ৪৩৮২,৪৩৮৩*

৬. *আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি ৯/১৭৬,কিতাবুস সিয়ার,বাবু মাযা'আ ফি কিতালিল হিন্দি, হাদিস ১৮৫৯৯ , ৯/১৭৬,কিতাবুস সিয়ার,বাবু মা যা'আ ফি কিতালিল হিন্দি, হাদিস ১৮৬০০*

৭. *দালায়েলুন নাবুয়াত, সুরা আল আনআম ৬/৭১২৮*

৮. *আলজা'মেউল সাগির লিস সুয়ুতি ৫৪১৮*

৯. *আল-জা'মেউল কাবির লিস সুয়ুতি ৪/৩১৭*

১০. *আল-খাসায়েসুল কুবরা, ২/১৯০*

১১. *হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/৩১৬-৩১৭*

১২. *মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন ৩/৫১৪, হাদিস ৬১৭৭*

১৩. *আস সুনান লি সায়িদ ইবনে মানসুর ২/১৭৮,হাদিস ২৩৭৪*

১৪. *তারিখে বাগদাদ ১০/১৪৫*

১৫. *আল-ফিতান বাব গাযওয়াতিুল হিন্দ,১/৪০৯*

১৬. *আল জিহাদ, পরিচ্ছেদ- নৌ যুদ্ধের ফযিলত,২/৬৬৮, হাদিস ২৯১*

১৭. *আল ঈলাল ১/৩৩৪*

১৮. *আত তারিখুল কাবির, ২/২৪৩*

১৯. তাহযিবুল কামাল, ৪/৪৯৪,৩৩/১৫১

২০. তাহযিবুত তাহযিব, ২/৫২

২১. আলমু'জামুল আওসাত ৭/২৩-২৪, হাদিস ৬৭৪১

২২. আলকামলে লি ইবনে আদি ২/১৬১

২৩. মুসনাদে ফিরদাউস ৩/৪৮, হাদিস ৪১২৪

২৪. মিযানুল ইতিদাল লিয যহাবি ১/৩৮৮

২৫. ফায়যুল ক্বাদির,৪/৩১৭

২৬. তারিখে দিমাশক ৫২/২৪৮

২৭. মুসনাদে ইসহাক্ব ইবনে রাহুইয়াহ ১/৪৬২, হাদিস ৫৩৭

২৮. তাখরিজুল মুসনাদ ২২৩৯৬,৭১২৮,১২/২৯

২৯. আল মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/২৮৫

৩০. যাখিরাতুল হুফ্ফায ৩/১৫৭৯

৩১. মুসনাদে বাযযার,১৫/৩০২

৩২. তারিখুল ইসলাম লিযযাহাবি, ১/৩৭৯

আমাদের অনুসন্ধানের পর আমরা এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাধারার একাধিক সনদে সর্বমোট সাতটি রেওয়ায়াত পেয়েছি। যা একাধিক জালিলুল ক্বদর সাহাবা ও তাবেয়ীগণ বর্ণনা করেছেন।

১.হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু -এর প্রথম হাদিস

حَدَّثَنِي خَلِيلِي الصَّادِقُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْثٌ إِلَى السِّنْدِ وَالْهِنْدِ، فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَذَاكَ، وَإِنْ أَنَا - فَذَكَرَ كَلِمَةً - رَجَعْتُ وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، قَدْ أَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ.

আবু হুরাইরাহ রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সত্যবাদী বন্ধু রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন, এ উম্মাহর একটি দল সিন্দ ও হিন্দের দিকে যাবে। আমি তা পেয়ে শাহাদাত বরণ করলে, সেটিই কাম্য। আমি যদি-তারপর কিছু উল্লেখ করলেন-ফিরে

আসি, তো আমি আবু হুরাইরাহ মুক্ত। আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।[১]

এই শব্দে এই হাদিস শুধু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তার *মুসনাদ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এবং ইবনে কাসির তার উদ্ধৃতিতে দিয়েই *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২]

কাজী আহমাদ শাকের মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থের ব্যাখ্যাা গ্রন্থে এই হাদিসের তাহকিক বর্ণনা করে *হাসান* সাব্যস্ত করেছেন।[৩]

ইমাম নাসায়ী তার *আস সুনানুল মুযতাবা* ও *আস সুনানুল কুবরা গ্রন্থে* এ হাদিস দুটি কিছু পার্থক্যের সাথে উল্লখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ. ح قَالَ : وَأَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَزْوَةَ الْهِنْدِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي ، فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ. "

আবু হুরাইরাহ রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে গাযওয়াতুল হিন্দের অঙ্গীকার করেছেন। আমি তা পেলে তাতে আমার জান ও মাল উৎসর্গ করে দিব। যদি শহীদ হয়ে যাই, তবে আমি উত্তম শহীদ হব, আর যদি ফিরে আসি, তবে আমি আবু হুরাইরাহ (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত।[৪]

ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ তার *আসসুনানুল কুবরা* গ্রন্থে এই শব্দেই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি অন্য আরেকটি রেওয়ায়াত তার

---

১. মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৬৯, হা/২২৪৪৯, মুসনাদে আবু হুরাইরা-৮৪৬৭

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গযওয়ায়ে হিন্দের আলোচনা সমূহ,৬/২২৩

৩. শারহু মুসনাদে আহমাদ (আহমাদ শাকের) ১৮/১৮ হাদিসঃ- ৮৮০৯, ১২/৯৭, হাদিস ৭১২৮

৪. আস সুনানুল মুযতাবা ৬/৪২ কিতাবুল জিহাদ, বাব- গাযওয়াতুল হিন্দ, হাদিস ৩১৭৩,৩১৭৪। আস সুনানুল কুবরা লিননাসায়ী ৩/২৮, বাব- গাযওয়াতুল হিন্দ হাদিস ৪৩৮২,৪৩৮৩

কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাতে ইবনে দাউদ -এর উদ্ধৃতি দিয়ে আবু ইসহাক ফিযারি (ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ, মুহাদ্দিসুস শাম ও মুজাহিদে আলম মৃ:১৮৮ হি.) -এর দিকে সম্পৃক্ত করে বলেন, তিনি (আবু ইসহাক ফিযারি) এ যুদ্ধের ব্যাপারে মনের তামান্না প্রকাশ করে বললেন,

وددت أني شهدت ماربد[৫] بكل غزوة غزوتها في بلاد الروم.

হায় ! রোমকদের সাথে আমার সারা জীবন যে সকল যুদ্ধ ও লড়াই হয়েছে তার বদলায় যদি মারিবাদা (ভারতের পূর্ব দিক থেকে আরব পর্যন্ত এলাকা) হিন্দুস্থানিদের মোকাবেলায় যুদ্ধে শামিল হতে পারতাম।

ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ *দালায়েলুন নাবুওয়াত* গ্রন্থে এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন।[৬]

এই হাদিস আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর সনদে ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৭]

আবু নুআইম আসফাহানি *হিলইয়াতুল আওলিয়া* গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন।[৮]

ইমাম হাকেম স্বলিখিত *আল মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইনে* গ্রন্থেও হাদিসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম সাঈদ ইবনে মানসুর রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাব *আস সুনান* গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন।[৯]

খাতিবে বাগদাদি তার *তারিখে বাগদাদ* গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেন। এবং তিনি হাদিসের শেষে আরো উল্লেখ করেন, (اتبعت فيها نفسي), অর্থাৎ, "আমি তাতে নিজেকে নিজে বিলিয়ে দেবো।"[১]

---

৫. عرب سے ہندوستان کی سمت مشرق میں کوئے علاق

৬. দালায়েলুন নাবুয়াত, ছাহেবে শারিআহ এর আলোচনা, বাব- আল্লাহ তা'আলার বাণী সুরা আল আনআম ৬/৭১২৮

৭. মুসনাদে আহমাদ ২/২২৯, মুসনাদে আবু হুরাইরা-৬৮৩১, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬/২২৩

৮. [হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/৩১৬-৩১৭]

৯. [আস সুনান লি সায়িদ বিন মানসুর ২/১৭৮,হাদিস ২৩৭৪]

ইমাম নুআইম ইবনে হাম্মাদ *'আল-ফিতান'* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[২]

ইমাম ইবনে আবি আসেম *আল জিহাদ* গ্রন্থে একটু ভিন্ন শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন,

وعدنا الله رسوله و كنت كافضل الشهداء.

আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ওয়াদা দিয়েছেন আর আমি হব সর্ব উত্তম শহিদগণের মত। এবং সনদটি হাসান।[৩]

ইমাম ইবনে আবি হাতেম তার *আল ঈলাল* গ্রন্থে ভিন্ন আরেক শব্দে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন,

فان أقتل اكون حيا مرزوقا و ان أرجع فانا المحرر

যদি আমি নিহত হই তাহলে তো আমি জান্নাতে রিযিক প্রাপ্ত (শহিদ হওয়ার দিক থেকে)। আর যদি আমি জীবিত থাকি এবং ফিরে আসি তো আমি আযাদ।[৪]

উক্ত আইম্মায়ে কেরাম ছাড়াও যারাহ্ ও তা'দিলের ইমাম, ইমাম বুখারি তার *আত তারিখুল কাবির* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৫]

ইমাম মাযিয় তার *তাহযিবুল কামাল* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৬]

ইমাম ইবনে হাজার আস কালানি তার *তাহযিবুত তাহযিব* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৭]

হাদিসের মান

এ বর্ণনাটির সনদ *হাসান*। কেননা, এর বর্ণনাকারীদের সবাই নির্ভরযোগ্য হলেও জাবর ইবনে আবিদা নামক একজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সামান্য

---

১. তারিখে বাগদাদ ১০/১৪৫
২. [আল-ফিতান বাব গাযওয়াতুল হিন্দ,১/৪০৯]
৩. আল জিহাদ, পরিচ্ছেদ- নৌ যুদ্ধের ফযিলত,২/৬৬৮, হাদিস ২৯১
৪. আল ঈলাল , ১/৩৩৪,তারজামাঃ৯৯৩
৫. [আত তারিখুল কাবির, ২/২৪৩, তাজকিরায়ে ইবনে উবাইদাঃ২৩৩৩]
৬. [তাহযিবুল কামাল, ৪/৪৯৪, তাজকিরায়ে ইবনে উবাইদাঃ৮৯৩]
৭. [তাহযিবুত তাহযিব, ২/৫২, তাজকিরায়ে ইবনে উবাইদাঃ৯০]

একটু বিতর্ক আছে। ইমাম ইবনে হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাফেজ যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ দুর্বল রাবি বললেও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ তার বিপরীতে তাকে মাকবুল বা গ্রহণীয় রাবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৮]

এছাড়াও এর সমর্থনে আরও ১৮ টি সনদ রয়েছে। যেমন 'মুসনাদ আহমাদ-এর ১৪/৪১৯ পৃষ্ঠার ৮৮২৩ নং হাদিস এবং ইমাম ইবনে আবি আসিম রাহিমাহুল্লাহ রচিত আল-জিহাদ গ্রন্থের ২৯১ নং হাদিস। তাছাড়াও তারিখে বাগদাদ, সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর, কিতাবুল ফিতান ও দালায়েলুন নাবুওয়াতসহ আরো অন্যান্য কিতাবে ভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে।

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আজাদকৃত গোলাম সাওবান রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদিস

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الْوُصَابِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

সাওবান রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাহর দুটি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন: একদল হল যারা হিন্দে যুদ্ধ করবে, অপরদল হল যারা ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সাল্লাম -এর সাথে থাকবে।[৯]

একই লফযে অনেক সাহাবি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ *মুসনাদে আহমাদ* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[১০]

---

৮. তাকরিবুত তাহজিব : ১/৩৩৭, জীবনী নং ৮৯২

৯. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস-২১৩৬২

১০. *[মুসনাদে আহমাদ ২/২৭৮, হাদিস-২১৩৬২]*

ইমাম ইবনে কাসির তার *আলবিদায়া ওয়াননিহায়া* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[১]

ইমাম নাসাঈ তার *আস সুনানুল মুযতাবা*।[২]

ও *আস সুনানুল কুবরা* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন ।[৩]

ইমাম বাইহাকি *আস সুনানুল কুবরা* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৪]

ইমাম সুয়ুতি তার *আলজা'মেউল সাগির* এবং *আল-জামেউল কাবির* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।

ইমাম ইবনে আবি আসেম *আল জিহাদ* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৫]

ইমাম বুখারি তার *আত তারিখুল কাবির* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৬]

করেন।[৬]

ইমাম মিযিয় তার *তাহযিবুল কামাল* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৭]

ইমাম তাবারানী তার *আল মুজামুল আওসাত* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৮]

ইমাম ইবনে আদি তার *আল কামিল* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।[৯]

ইমাম মুনাবি তার *আল জামে'* -এর শরাহ গ্রন্থ *ফায়যুল ক্বাদির* গ্রন্থে। [১০]

---

১. *[আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৬/২২৩]*

২. *[আস সুনানুল মুযতাবা ৬/৪৩ কিতাবুল জিহাদ, বাব- গাযওয়াতুল হিন্দ, হাদিস ৩১৭৫]*

৩. *[আস সুনানুল কুবরা ৩/২৭, বাব-গাযওয়ায়ে হিন্দঃ৪৩৮৪]*

৪. *[আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি ৯/১৭৬, কিতাবুস সিয়ার,বাবু মা যা'আ ফি কিতালিল হিন্দি, হাদিস ১৮৬০০]*

৫. *[আল জিহাদ, পরিচ্ছেদ- নৌ যুদ্ধের ফযিলত ২/৬৬৮, হাদিস ২৯১]*

৬. *[আত তারিখুল কাবির, ২/২৪৩]*

৭. *[তাহযিবুল কামাল, ৪/৪৯৪,৩৩/১৫১]*

৮. [আলমু জামুল আওসাত ৭/২৩-২৪, হাদিস ৬৭৪১]

৯. [আল কামলে লি ইবনে আদি ২/১৬১]

১০. [ফায়যুল ক্বাদির,৪/৩১৭]

ইমাম ইবনে আসাকের তার *তারিখে দিমাস্ক* গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন। [১১]

হাদিসের মানঃ

শুআইব আরনাউত্ব বলেন, হাদীছটি হাসান।[১২]

ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, হাদীছটি সহিহ্।[১৩]

ইয়াসির হাসান বলেন, হাদীছটি হাসান। [১৪]

হামযাহ আহমাদ যাঈন বলেন, -এর সনদ দুর্বল আবু বাকর ইবনুল ওয়ালীদ যুবাইদী -এর কারনে। [১৫]

হাফিয যুবাইর আলী যাঈ বলেন, হাদীছটি হাসান। [১৬]

এই হাদীছের রাবী আবু বাকর ইবনুল ওয়ালীদ যুবাইদী কে অনেকে মাজহূল বলেছেন। কিন্তু তার ব্যাপারে ইমাম সুফিয়ান ছাওরী বলেন, তিনি ছিক্বাহ।[১৭]

ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে *ছিক্বাহ* বলেছেন। [১৮]

ইমাম আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-হাযিমী ইমাম যুহরীর ছাত্রদেরকে ত্বাবাক্বাতুছ ছানিয়াহ তে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা মুসলিমের শর্তের উপর রয়েছেন।[১৯]

উক্ত রাবী ইমাম যুহরী -এর ছাত্র। [১]

---

১১. [তারিখে দিমাস্ক ৫২/২৪৮]

১২. [শু'আইব আরনাউত্ব, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৭৮, হা/২২৩৯৬]

১৩. [নাছিরুদ্দীন আলবানী, তাহক্বীক্ব নাসাঈ, হা/৩১৭৫]

১৪. [ইয়াসির হাসান, তাহক্বীক্ব নাসাঈ, হা/৩১৭৫]

১৫. [হামযাহ আহমাদ যাঈন, তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৭৮, হা/২২২৯৫]

১৬. [যুবাইর আলী যাঈ, তাহক্বীক্ব নাসাঈ, হা/৩১৭৭]

১৭. [ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান আল-ফারিসী, কিতাবুল মা'রিফাতি ওয়াত-তারীখ, ৩/১০০]

১৮. [ইবনে হিব্বান, আছ-ছিক্বাত, ৬/৪৭৮, রাবী নং ৮৬৭৮]

১৯. [মুহাম্মাদ ইবনে ত্বাহির আল-মাক্বদিসী ও আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-হাযিমী, শুরূত্বুল আইম্মাতিস সিত্তাহ ও শুরূত্বুল আইম্মাতিল খামসাহ, পৃঃ ৫৭]

সুতরাং আবু বাকর ইবনুল ওয়ালীদ যুবাইদী মাজহূল নন বরং হাসানুল হাদীছ।[১]

এছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনে সালিম তার *মুতাবাআত* করেছেন।[২]

আর আবদুল্লাহ ইবনে সালিম *ছিক্বাহ* ছিলেন।[৩]

তাছাড়া এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে বাকিয়্যা ইবনে অলিদ নামক একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে। তবে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি (عن) -এর পরিবর্তে (حدثنا) ব্যবহার করায় এখানে তাদলিস জনিত কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি।

৩. হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু এর দ্বিতীয় হাদিস:

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ بَعْضِ الْمَشْيَخَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْهِنْدَ، فَقَالَ: لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَأْتُوا بِمُلُوكِهِمْ مُغَلَّلِينَ بِالسَّلَاسِلِ، يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ، فَيَنْصَرِفُونَ حِينَ يَنْصَرِفُونَ فَيَجِدُونَ ابْنَ مَرْيَمَ بِالشَّامِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ تِلْكَ الْغَزْوَةَ بِعْتُ كُلَّ طَارِفٍ لِي وَتَالِدٍ وَغَزَوْتُهَا، فَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَانْصَرَفْنَا فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، يَقْدَمُ الشَّامَ فَيَجِدُ فِيهَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَلَأَحْرِصَنَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَأُخْبِرَهُ أَنِّي قَدْ صَحِبْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ.

আবু হুরাইরাহ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্থানের প্রসঙ্গে বলেন, অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাআলা সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন। তারা হিন্দুস্থানের রাজাদেরকে শিকল পড়িয়ে টেনে আনবে। আল্লাহ তাআলা (যারা যুদ্ধ করবে) তাদেরকে (এই মহৎ জিহাদের বরকতে) ক্ষমা করে

---

১. [মিযযী, তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৭২৬১)]

২. [মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৭৮, হা/২২৩৯৬]

৩. [মিযযী, তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৩২৮৫]

দিবেন এবং যারা ফিরে আসবে, তারা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) কে শামে (সিরিয়ায়) পেয়ে যাবে।

আবু হুরাইরাহ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি যদি সেই গাযওয়া পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রয় করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম। যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরাইরাহ রাযিআল্লাহু আনহু হতাম, যে কিনা সিরিয়ায় ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) কে পাওয়ার গর্ব নিয়ে ফিরতো।

আবু হুরাইরাহ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার অনেক ইচ্ছা হয় সেই সময়টা পেতে যখন আমি ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) -এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম ও আমি তাকে বলতে পারতাম যে, আমি রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন ছাহাবী। তখন রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং বললেন বহু দূর বহু দূর।[৪]

এই হাদিসটি নুআইম ইবনে হাম্মাদ, তার *আল-ফিতান* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৫]

ইমাম ইসহাক্ব ইবনে রাহুইয়াহ এই হাদিসটি তার *মুসনাদ গ্রন্থে* বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দ ও সিন্দ-এর আলোচনা করছিলেন, তখন তিনি বললেন, অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাআলা সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন। তারা হিন্দের জালেম শাসকদের পায়ে ডান্ডা বেড়ি পড়িয়ে টেনে আনবে। আল্লাহ তাআলা (যারা যুদ্ধ করবে) তাদেরকে (এই মহৎ জিহাদের বরকতে) ক্ষমা করে দিবেন এবং যারা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম কে শামে (সিরিয়ায়) পেয়ে যাবে।

---

৪. নুআইম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতান, হা/১২৩৬;

৫. নুআইম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতান, হা/১২৩৬;

আবু হুরাইরাহ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি যদি সেই গাযওয়া পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রয় করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম। যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরাইরাহ রাযিআল্লাহু আনহু হতাম, যে কিনা সিরিয়ায় ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম কে পাওয়ার গর্ব নিয়ে ফিরতো।

আবু হুরাইরাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার অনেক ইচ্ছা হয় সেই সময়টা পেতে, যখন আমি ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম -এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম ও আমি তাকে বলতে পারতাম যে, আমি রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একজন ছাহাবী। তখন রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন।[১]

হাদিসের মানঃ

এ সনদটি জইফ। -এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বাকিয়্যা ইবনে ওয়ালিদ নামক একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি (عن) ব্যবহার করেছেন। এখানে তাদলিসজনিত কোনো দুর্বলতা দূর হয়নি। এছাড়াও আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনাকারী এখানে অজ্ঞাত। তবে শাহেদ থাকায় হাদিসটির দুর্বলতা কমে আসবে।

৪. হযরত কাব রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসঃ

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: يَبْعَثُ مَلِكٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَيْشًا إِلَى الْهِنْدِ فَيَفْتَحُهَا، فَيَطَئُوا أَرْضَ الْهِنْدِ، وَيَأْخُذُوا كُنُوزَهَا، فَيُصَيِّرُهُ ذَلِكَ الْمَلِكُ حِلْيَةً لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيُقْدِمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْجَيْشُ بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مُغَلَّلِينَ، وَيُفْتَحُ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَيَكُونُ مَقَامُهُمْ فِي الْهِنْدِ إِلَى خُرُوجِ الدَّجَّالِ

কাব রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, বাইতুল মাকদিসের (জেরুসালেমের) একজন রাজা তার একটি সৈন্যবাহিনী হিন্দুস্থানের দিকে পাঠাবেন। সৈন্যরা হিন্দুস্থানের ভূমি ধ্বংস করে দিবে এবং হিন্দুস্থানের ধন-ভাণ্ডার দখল করে

১. মুসনাদে ইসহাক্ব ইবনে রাহওয়াইহ, হা/৫৩৭

নিবে। তারপর রাজা এসব ধন-সম্পদ দিয়ে বাইতুল মাকদিস (জেরুসালেম) সজ্জিত করবে। এই দলটি বাইতুল মাকদিসের (জেরুসালেমের) রাজার দরবারে হিন্দুস্থানের রাজাদেরকে উপস্থিত করবে। ঐ রাজার নির্দেশে তার সৈন্যবাহিনী পূর্ব থেকে পশিম পর্যন্ত সকল এলাকা বিজয় করবে এবং হিন্দে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করবে, যতক্ষণ না দাজ্জালের আগমন ঘটে।[২]

হাদিসের মান:

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর উস্তাদ নুআইম ইবনে হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ (তিনি) তার *আল-ফিতান* গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কাব রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনাকারি রাবির নাম (الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبٍ) উল্লেখ নেই বিধায় হাদিসটি *মুনকাতে*।

৫. হযরত ছাফওয়ান ইবনে আমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস:

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَغْزُو قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي الْهِنْدَ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَأْتُوا بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مَغْلُولِينَ فِي السَّلَاسِلِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، فَيَنْصَرِفُونَ إِلَى الشَّامِ، فَيَجِدُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالشَّامِ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মাতের কিছু লোক হিন্দে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সফলতা দান করবেন। এমনকি তারা হিন্দুস্থানের রাজাদেরকে শিকলবদ্ধ করবে। আল্লাহ তাআলা ঐ সকল লোকদেরকে (যারা যুদ্ধ করবে) ক্ষমা করে দিবেন। যখন তারা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, তখন তারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম কে সেখানে পাবে।[৩]

এই হাদিসটি নুআইম ইবনে হাম্মাদ তার আল ফিতান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৪]

---

২. নুআইম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতান, হাদিস/১২৩৫

৩. নুআইম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতান,বাব গাযওয়াতুল হিন্দ, ১/৪০৯, হাদিস/১২৩৫

৪. [নুআইম ইবনে হাম্মাদ, আল-ফিতান,১/৪১০, হাদিস/১২৩৯,১২০১]

হাদিসের মান:

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা কারির নাম (حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ।) উল্লেখ নেই। বিধায় হাদিসটি মুনকাতে।

৬. সুরাইম রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ صُرَيْمٍ السَّكُونِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُقَاتِلُنَّ الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى تُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَّالَ، عَلَى نَهْرٍ بِالأُرْدُنِّ، أَنْتُمْ شَرْقِيَّهُ وَهُمْ غَرْبِيَّهُ، وَمَا أَدْرِي، أَيْنَ الأُرْدُنُّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الأَرْضِ.

সুরাইম রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নি:সন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; এমনকি এ যুদ্ধে তোমাদের অবশিষ্ট মুজাহিদরা জর্ডান নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না সেদিন জর্ডান কোথায় অবস্থিত হবে।[১]

হাদিসের মান:

হাদিসটি সহিহ। অপর আরেক সনদে মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[২] -এর সনদ বিশুদ্ধ। হাফেজ হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, এটি ইমাম তাবারানি রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম বাযযার রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আর বাযযারে বর্ণিত হাদিসটির বর্ণনাকারী সবাই নির্ভরযোগ্য।

৭.হযরত আরতাত রাহিমাহুল্লাহ -এর বর্ণিত হাদিস:

---

১. কাশফুল আসতার আন জাওয়াইদিল বাযযার : ৪/১৩৮, হা. নং ৩৩৮৭, প্র. মুআসাসাসতুর রিসালা, বৈরুত

২. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ: ৭/৩৪৮-৩৪৯, হাদিস নং: ১২৫৪২, প্র. মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো।

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَرَّاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: عَلَى يَدَيْ ذَلِكَ الْخَلِيفَةِ الْيَمَانِيِّ الَّذِي تُفْتَحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ وَرُومِيَّةُ عَلَى يَدَيْهِ، يَخْرُجُ الدَّجَّالُ وَفِي زَمَانِهِ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَلَى يَدَيْهِ تَكُونُ غَزْوَةُ الْهِنْدِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، غَزْوَةُ الْهِنْدِ الَّتِي قَالَ فِيهَا أَبُو هُرَيْرَةَ .

হজরত আরতাত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, ইয়ামানি খলিফার নেতৃত্বে ইস্তামবুল ও রোম (ইউরোপ) বিজয় হবে, তাঁর সময়েই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে, তাঁর যুগেই ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তিনি হবেন হাশিমি বংশের লোক। গাজওয়াতুল *হিন্দ* বলতে ঐ যুদ্ধ উদ্দেশ্য, যে ব্যাপারে আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন।[৩]

হাদিসের মান:

এটার সনদ যইফ। কেননা এতে ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম নামক একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আছে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছে। আর এটা মাকতু তথা তাবিয়ি বর্ণিত একটি হাদিস।

[৩]. আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১/৪১০, হা. নং ১২৩৮, প্র. মাকতাবাতুত তাওহিদ, কায়রো

তৃতীয় অধ্যায়
গাযওয়াতুল হিন্দ-এর হাদিসসমূহ থেকে লব্ধ শিক্ষা ও ইশারাসমূহ

উক্ত সাতটি রেওয়ায়াতের মাঝে আমরা সহিহ্, হাসান, মারফুউ বর্ণনা পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা এই সাতটি হদিস থেকে লব্ধ বিভিন্ন ইশারা এবং ইঙ্গিত এবং কিছু সূক্ষ্ম তৃথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করবো। হাদিসগুলোর মাঝে অতিত এবং ভবিষ্যতের যে সকল রূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। প্রতিটি মুসলমানের জন্য করনীয় এবং বর্জণীয় যে সকল বিধান এই হাদিস সমূহে নিহিত আছে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। শেষ যামানায় আবশ্যক ঘটবে এমন বিষয়ের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী সুপ্ত রয়েছে তা আপনাদের সামনে মোটাদাগে আনার চেষ্টা করবো। হিন্দুস্থান যুদ্ধের ক্ষেত্রে যে সকল বাসারাত ও সুসংবাদ আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে তা একটি একটি করে আলোচনা করবো। কিন্তু আফসোস এ সকল সুসংবাদ এবং আনন্দঘেরা মুহূর্ত শুধু সেই আন্দাজ ও অনুমান করতে পারবে যাকে আল্লাহ সঠিক হেদায়েতের কর্ণ দান করেছেন। এসকল নববী ভবিষ্যদ্বাণী বুঝার জন্য আল্লাহ তাঁদেরকেই পূর্ণ তাওফিক দান করবেন যারা কোন না কোন ভাবে আল্লাহ একান্ত হতে পেরেছে। যারা আল্লাহর সাথে সদাসর্বদা উত্তম ক্রয় বিক্রয় করতে প্রস্তুত এই মোবারকময় হাদিস সমূহ তাদের সঠিক রাহনুমা। চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশের সঠিক দিশা। সরল পথের সহজ পাথেয়। আয় আল্লাহ! যাদেরকে এই মোবারকময় জামাআ'হ্ -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন আমাদেরকেও তাদের সাথে নিয়ে নিন। আমাদেরকেও তাদের দলভুক্ত করে নিন। "গাযওয়াতুল হিন্দ" মোবারকময়

যুদ্ধে শরিক হয়ে আমাদেরকে খইরুশ শুহাদা কিংবা চির আজাদ আবু হুরাইরা হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বিল আলামিন।

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের প্রথম শর্ত।

উক্ত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুম -এর ভালবাসার নমুনা পূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত। হাদিসে আবু হুরাইরা রা বলেন, (حَدَّثَنِي خَلِيلِي الصَّادِقُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা ঈমানের শুরুর শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এই হাদিসটি -এরই প্রতি ইঙ্গিতবহ। ঈমানের মৌলিক আলামত এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা। তবে শুধু মুখে দাবিকৃত নিছক মুহাব্বত বা ভালোবাসা উদ্দেশ্য নয় বরং নিজের সবটুকু বিলিন করে দেয়াই হচ্ছে নববি ভালোবাসার আলামত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কেউ কটুক্তি করলো তার পবিত্র সিরাতের উপর কালি লেপন করলো আর আপনি আমি চুপকরে ঘাপটিমেরে ছবরের নিয়তে বসে থাকলাম -এর নাম ঈমান নয়। এটি নববি ভালোবাসার আলামত নয়। বরং নববি ভালোবাসাতো সেটাই যা নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য উৎসর্গ করতে শেখায়। দুনিয়ার সব কিছু এমনকি নিজের একমাত্র জিবনের চেয়েও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসতে হবে।

আর এ কথাই বর্ণনা করছেন হযরত আনাস রাযিআল্লাহু আনহু।

عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

আনাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।[১]

---

[১]. মুসলিম ১/১৬ হাঃ ৪৪, আহমাদ ১২৮১৪), বুখারী, হাদিস নং ১৫

যাহরা ইবনে মা'বাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,আমি আমার দাদা আবদুল্লাহ ইব্‌নু হিশাম রাযিআল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি,

عن عبد الله بن هشام، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ". فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " الآن يا عمر ".

আবদুল্লাহ ইব্‌নু হিশাম রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমরা একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইব্‌নু খাত্তাব রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাত ধরেছিলেন।উমার রাযিআল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার জান ছাড়া আপনি আমার কাছে সব কিছু চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হওয়া পর্যন্ত। তখন উমার রাযিআল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ হে উমর! এখন (তুমি সত্যিকার ঈমানদার হলে)।[১]

২ নবী সা -এর সাথে সাহাবাকেরামের অকৃত্তিম ভালবাসা।

এই হাদিসটির মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম -এর ভালোবাসার এবং মুহাব্বাতের একটি পূর্ণ নমুনা ফুটে ওঠে। এখেকে বুঝে আসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাহাবাকেরামের ভালোবাসার পূর্ণ বন্ধনের একটি জলন্ত চিত্র। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ভালোবাসার নমুনা চিত্র মানুষের কাছে বর্ণনা করতেন। নিজেদের কথাবার্তা এমনকি হাদিস বর্ণনার সময়ও তাঁরা মুহাব্বাতের দিকটি উল্লেখ করতে ভুলতেন না। বরং তারা পরস্পর এই ভালোবাসার আলোচনা করতে গর্ভবোধ করতেন। আর তাদের এই ভালোবাসা শুধু মুখের নিছক দাবির নাম ছিল না। বরং তাদের সারা জিবনের প্রতিটি

[১]. বুখারী, হাদিস নং ৬৬৩২

কাজ এবং জিবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই ভালোবাসার পূর্ণ নমুনার বহিপ্রকাশ। হুদাইবিয়া সন্ধির সময় উরওয়া ইবনে মাসউদ সাক্বাফি তাঁদের মুহাব্বাতের এই বহিপ্রকাশ দেখতে পেলে, যখন সে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক সৌকার্য -এর ক্ষেত্রে আন্তরিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো তখন সে তৎক্ষণাৎ বলে ফেলল, আমি দুনিয়ার এমন কোন রাজা-বাদশাকে দেখিনি যে, তাকে তাঁর অনুসারী বা সঙ্গী-সাথীগণ তাঁর এতটুকু সম্মান করে, যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথি সাহাবি তাকে যত বেশি সম্মান ও মুহাব্বাত করে।[২]

৩. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার প্রতি সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম -এর অগাত বিশ্বাস।

এই হাদিসে এ বিষয়টিও দৃষ্টিগোচর হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি খবরের উপর সাহাবায়ে কেরামের ছিল পূর্ণ আস্থা ও পূর্ণ বিশ্বাস। চাই তা বাহ্যিকভাবে আকল মেনে নিক বা না নিক। চাই তা কোন অতিত সংবাদ হোক বা ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয়ের কোন সংবাদ। চাই তা অবতার মাধ্যম অকাট্য ওহি হোক কিংবা অন্য কোন মাধ্যম। আর এ কারণেই সাহাবা কেরাম সকল প্রকার সংবাদের ভবিষ্যদ্বাণী শুধু বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং সে সংবাদকে বাস্তব পক্ষেই সুনিশ্চিত জেনে নিজের অন্তরকে সে অঙ্গিকারের প্রতি সদা প্রস্তুত করতেন। এবং সে সকল ভবিষ্যত বাস্তব বিষয়াবলির অপেক্ষায় প্রহর গুনতেন। আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তাঁকে "গাযওয়াতুল হিন্দ" মোবারক বাহিনীতে শরিক করে নেন। এবং তাঁকে এই মহা সৌভাগ্য দান করেন।

৪. সিন্দু অঞ্চলের বিদ্যমানতা।

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস এ কথার প্রমাণ যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই এমন ভূখণ্ড পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল, যাকে সিন্দ (সম্ভবত বর্তমান পাকিস্তান) নামে জানতো।

---

[২]. আর-রাহিকুল মাখতুম,আনোয়ার লাইব্রেরী, পৃ.৫৯৭

(ইনশাআল্লাহ আমরা হাদিস সমূহের আলোচনা শেষে সিন্দু এবং *হিন্দ* -এর ভৌগলিক আলোচনা করবো।)

৫. হিন্দে বিদ্যমানতা।

এমনিভাবে এই হাদিস থেকে এটাও প্রমাণিত হয়, নববী যুগে পৃথিবীর বুকে এমন একটি দেশও বিদ্যমান ছিল, যাকে "হিন্দ" বলা হতো।

৬. আরবের নিকটবর্তী সিন্দু প্রদেশে এবং "গাযওয়াতুল হিন্দ" এর পূর্বে সিন্দু প্রদেশে বিজয়।

ঐ হাদিস যে হাদিসে গাজওয়ায়ে সিন্দ এবং গাজওয়াতুল হিন্দের আলোচনা এসেছে, তাতে এটাও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যে সিন্ধের অঞ্চল আরবের পাশে অবস্থিত এবং গাজওয়ায়ে সিন্দ গাজওয়াতুল হিন্দের পূর্বে সংঘটিত হবে।

৭. সিন্দ ও হিন্দ কাফেরদের কবজায় বিদ্যমান থাকা।

এটাও প্রমাণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের যুগে সিন্দ এবং হিন্দ এমন দু'টি ভূখণ্ডরূপে পরিচিত ছিল, যার উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব ও দখলদারিত্ব ছিল এবং নববী যুগের পরেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা অবশিষ্ট ছিল। যেখানে হিন্দুস্তানের উপর আরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের দখলদারিত্ব অবশিষ্ট থাকার সম্ভবনা রয়েছে।

৮. রাসুল (সা) সকল বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানের অধিকারি ছিলেন।

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে এটাও বুঝা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হকসমূহ সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং জানতেন। চাই সেটা আল্লাহ তা'আলার ওহীর মাধ্যমে হোক অথবা ব্যবসায়িক সম্পর্কের মাধ্যমে হোক কিংবা উভয়টির মাধ্যমেই হোক। এটাও হতে পারে, যে নিজস্ব গোয়েন্দা এবং গোপন ইন্টিলিজেন্টের মাধ্যমে তিনি এ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। কেননা গাজওয়াগুলোতে তিনি এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যদিও প্রথম দু'টি সম্ভবনাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। তবে তৃতীয়

সম্ভবনাটিও অসম্ভব নয়। কিন্তু' এর জন্য আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই।

৯. সিন্দ ও হিন্দ -এর ইতিহাস।

উপরোক্ত হাদিসসমূহে এই উভয় দেশ অর্থাৎ সিন্দ এবং হিন্দে ভবিষ্যতে সংঘটিত অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। সাথে সাথে এটার ইঙ্গিতও বিদ্যমান, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের পরবর্তী যুগে মুসলমানগণ এই দেশগুলোর অর্থাৎ সিন্দ এবং হিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

১০. অদৃশ্য সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী

সিন্দ ও হিন্দের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীর অভিযান এবং জিহাদ পরিচালনা করার বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত। এবং ভবিষ্যতে যে এক মুসলিম বাহিনী তা বিজয় করবে তার সুচারু এক চিত্র ফুটেছে হাদিসটির মাঝে। সুতরাং হাদিসটি নববি সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রেও ঈঙ্গিতবহ বটে।

১১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ।

যুগে যুগে মুসলিম বাহিনী হিন্দুস্থানের ভূমিতে জিহাদ পরিচালনা করে আসেছে। এবং ঈসা আলাইহিস সালাম -এর আগমণ পূর্ব পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকবে। সুতরাং আজ ইতিহাস অনুযায়ী হিন্দে যুগে যুগে মুসলমানদের যুদ্ধ করার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সত্যতা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

১২. বাইতুল মাকদিসে এবং মাসজিদে আকসার বিজয়ের সুসংবাদ।

গাযওয়াতুল হিন্দও বাইতুল মাকদিস বিজয় একই সাথে অলোচনা করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে বাইতুল মাকদিসের এক মুসলিম শাসক একটি

জামাআহ্ বা দল পাঠাবেন যাদের হাতে আল্লাহ হিন্দ বিজয়ের গৌরব দান করবেন। একই সাথে উক্ত হাদিসে বাইতুল মাকদিস -এর ইয়াহুদি কব্জা থেকে মুক্তি এবং মাসজিদুল আকসায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের মহা সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আরো গৌরবের বিষয় হল, উক্ত গাযওয়াতুল হিন্দ -এর বাহিনী এবং ফিলিস্তিনের মুজাহিদ বাহিনী দুভয়ের মাঝে এক আত্মিক ও যুদ্ধকেন্দ্রিক এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বিদ্যমান থাকবে। এবং জিহাদ-গাযওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর একে ওপরের সাহায্যকারী হবে। যার একটি প্রেক্ষাপট আজ তো আজ একেবারে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, হিন্দ -এর যুদ্ধভূমিতে মালাউন মুশরিক বাহিনী এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মেরাজের পবিত্র পূর্ণ্যময় ভূমিতে জায়নবাদী ইয়াহুদিদের পূর্ণ কব্জা বিদ্যমান। এতদুভয় পরস্পর মিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হিন্দ এং ফিলিস্তিনের মুসলিম যোদ্ধা বাহিনীর পরস্পর সহযোগিতা এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এদের নাপাক কব্জা থেকে হিন্দ ও আকসার পবিত্র ভূমি পূত-পবিত্র করবেন। আর ফিকাহ ও ফকিহের এ বিষয়টিও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সকল মুসলমানের উপর এ দুইভূমি পবিত্র করা সমগ্র মুসলিম উম্মার উপর আবশ্যক।

১৩. জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

এই হাদিস সমূহের মাঝে জিহদকে কোন নির্দিষ্ট যামানা বা সময়ের সাথে বিশিষ্ট করেননি। যা পরোক্ষভাবে একথারও দলিল যে, জিহাদ শেষ যামানা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এমনকি সায়্যেদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণের পর দাজ্জালকে কতল করবেন। আর এ কথা বিভিন্ন সহিহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, দাজ্জালের চেলা-চামুণ্ডা এবং সহচরদের বিশাল অংশ হবে জায়নবাদী ইয়াহুদিদের মধ্য থেকে।

১৪. জিহাদের দুই ধারাই বিদ্যমান থাকবে।

এই সাত হাদিস থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে, হিন্দ -এর যুদ্ধ শুধু দিফায়ী -এর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং তা আগে বেড়ে সম্মুখ জিহাদ হবে। এবং দারুল কুফুরে অনুপ্রবেশ করে মুশরিক কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা হবে। প্রথম হাদিসের বাআস এবং গাযওয়াত এ দুটি শব্দ

থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট বুঝে আসে। কেননা গাযওয়ার আভিধানিক অর্থ হ
ইক্বদামি বা অগ্রবেড়ে সম্মুখ জিহাদ।

১৫. দুশমন চিহ্নিতকরন।

উক্ত হাদিসসমূহে ইসলাম এবং মুসলমানের দুই চির দুশমন কে চিহ্নিত ক হয়েছ। এক হল মূর্তি পূজক হিন্দু আর দ্বিতীয়ত যায়নবাদী ইয়াহুদী। যা বিস্তারিত বর্ণনা হল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দ ও সিন্দ এর আলোচনা করেছেন। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে, এ গাযওয়া কাফেরদের মোকাবেলাতেই হবে। এ সত্য একেবারে স্পষ্ট যে, হিন্দ -এ পবিত্র ভূমি আজ হিন্দুদের দখলে। গেরুয়া সন্ত্রাস কুফ্‌ফারদের পূর্ণ দখলে অপর দিকে সাওবান রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদিস থেকে এ বিষয়ও ফুটে ওঠে যে, সায়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তার সাথীগণ দাজ্জাল এবং তার সহযোগী ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে লড়বে।

১৬. নবী সা. এবং সাহাবাকেরামের মজলিসে হিন্দুস্থান যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা।

এই হাদিস থেকে জানা যায় যে,নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের মজলিসে হিন্দ -এর আলোচনা হত। এবং বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় এ পুন্যময় যুদ্ধের আলোচনা বেশ হত।

১৭. গাযওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা এবং দিলের তামান্না।

নবী সাল্লাল্লাজু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তার সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুম অনেক সময় হিন্দ যুদ্ধের আলেচনা করতো। এ কারণেই এটা এবিষয়ের দলিল যে বিষয়ের দলিল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা রাখতেন। -এটাও ফুটে ওঠে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাকেরামকে হিন্দ যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতেন।

১৮. হিন্দুস্থান বিজয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা।

হাদিসে দু'টি শব্দ এসেছে। ১. আমার সাথে অঙ্গীকার করেছে। ২. আমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছে। অঙ্গীকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোন ভালো কাজের অঙ্গীকার। অঙ্গীকারের মধ্যে ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় অবশ্যই পাওয়া যায়। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে গাজওয়াতুল হিন্দের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় বিদ্যমান ছিলো এবং হিন্দুস্তানের উপর আক্রমণের ইচ্ছা ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই ইচ্ছা কখনো এক ব্যক্তির সামনে, কখনো ভরা মজলিসে অনেকের সামনে প্রকাশ করেছেন। যেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম; বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমান এ ব্যাপারে অবগত হয়ে যায়।

১৯. হিন্দুস্থান বিজয় মহান আল্লাহ তা'আলার অঙ্গিকারও।

আবু আসেমের বর্ণনায় এই শব্দও এসেছে। "আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল অঙ্গীকার করেছেন।" এই শব্দই প্রমাণ, এটা শুধুমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অঙ্গীকার নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারও বটে। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো তার অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না।

"আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।"

২০. যুদ্ধ ও জিহাদের উৎসাহ প্রদান।

উপরোক্ত হাদিসসমূহে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে যুদ্ধ-জিহাদের উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

"হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শজনকে পরাস্ত করবে, আর যদি

তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজারজনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন কওম যারা বুঝে না।"

যুদ্ধ-জিহাদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য।

২১. সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধ আধিপত্যের প্রতিকার।

এতে উম্মতের জন্য পথপ্রদর্শনও রয়েছে যে, পৃথিবীতে কাফির-মুশরিকদের বিজয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক শক্তি এবং স্বৈরাচারী কার্যক্রমের প্রতিরোধও যুদ্ধ-জিহাদের মাঝে নিহিত। এছাড়া এ সমস্যার অন্য কোন সমাধান নেই। আলোচনা, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা এবং কোন বন্ধু কিংবা নামে মাত্র সালিশের চেষ্টা কিংবা হস্তক্ষেপ সময়ক্ষেপণ ছাড়া আর কিছু নয়।

২২. গাযওয়ায়ে হিন্দে মাল খরচ করার ফযিলত।

উপরোক্ত হাদিসসমূহে গাজওয়াতুল হিন্দে সম্পদ ব্যয় করার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যদিও জিহাদের পথে সম্পদ খরচ করা অনেক উত্তম খরচ। কিন্তু গাজওয়াতুল হিন্দে ব্যয় করার ফজিলত সাধারণত আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার চেয়ে অনেক বেশি। এই ফজিলতের ব্যক্তিই আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বারবার এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, "আমি যদি সেই গাজওয়া পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জীবন এবং নতুন-পুরাতন সকল সম্পদ তাতে ব্যয় করবো।"

২৩. গাযওয়ায়ে হিন্দে শাহাদাতের ফযিলত।

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে এটাও জানা যায়, এই গাজওয়াতে অংশগ্রহণকারী শহীদদেরও অনেক ফজিলত। কেননা তাদের সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "আফদালুশ-শুহাদা" এবং "খাইরুশ-শুহাদা" শব্দ বর্ণনা করেছেন।

২৪. গাযওয়ায়ে হিন্দের মুজাহিদগণের জাহান্নাম থেকে মুক্তির ছাড়পত্র।

উপরোক্ত হাদিসসমূহে ঐ সকল মুজাহিদদের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ এসেছে, যারা এই গাজওয়ায় অংশগ্রহণ করবে এবং গাজী হয়ে ফিরে আসবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি দলের কথা উল্লেখ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন।" প্রথম দল সম্পর্কে এটাও সুস্পষ্ট করেছেন, "তারা হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।" হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর কথায়ও এটা প্রমাণিত হয়, "আমি যদি সেই গাজওয়া থেকে গাজী হয়ে ফিরে আসি, তাহলে আমি এক মুক্ত আবু হুরাইরা হবো। যাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন।"

২৫. গাযওয়ায়ে হিন্দের শেষে বিজয়ের সুসংবাদ।

উপরোক্ত হাদিসসমূহে এই সুসংবাদও বিদ্যমান, শেষ যুগে হজরত মাহদী আলাইহিস সালাম এবং সাইয়্যিদিনা হজরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামও পৃথিবীতে উপস্থি হবেন। আল্লাহ তা'আলা হিন্দুস্তানের মুজাহিদদেরকে মহা বিজয় দান করবেন এবং তারা কাফিরদের নেতা এবং শাসকদেরকে গ্রেপ্তার করে কয়েদী বানাবে।

২৬. গণিমতের মালের সুসংবাদ।

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রচুর পরিমানে গনীমতের সম্পদ দান করবেন।

২৭. সায়্যেদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম -এর সাথে সাক্ষাতের সুসংবাদ।

উপরোক্ত হাদিসসমূহে একট সুসংবাদ এটাও পাওয়া যায়, যে সকল মুজাহিদ এই পবিত্র গাজওয়ার শেষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তারা সাইয়্যিদিনা হজরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের বরকতময় সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবে।

২৮. হিন্দুস্থান ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে।

উপরোক্ত হাদিসসমূহে সর্বশেষ এবং সুসংবাদ হলো, এই গাজওয়ার পরিণামে হিন্দুস্থান টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাবে। যার উপর একজন শাসকের পরিবর্তে একই সময়ে কয়েকজন শাসকই রাজত্ব করবে।

এছাড়াও আহলে ইলমগন আরও অনেক সুসংবাদ উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে বের করেছেন। তবে আমরা উপরোক্ত হাদিসসমূহের তাখরিজ ও তার শিক্ষা এবং ইশারা-ঈঙ্গিত নববী দিকনির্দেশনা সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞ পাঠকের ক্ষেদমতে উপস্থাপন করে দিলাম।

২৯. গাযওয়া নামকরণের প্রেক্ষাপট।

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা বুঝতে পেরেছি যে, গাযওয়াহ্ বলা হয় ঐ যুদ্ধসমূহকে যে যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেছেন। এবং যুদ্ধে মুজাহিদিনে সাহাবাকেরামের দেখভাল এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাহলে গাযওয়ায়ে হিন্দকে কেন গাযওয়া বলা হয় অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এই যুদ্ধ-অভিযান পরিচালনা করবেন না ?

প্রশ্নের উত্তরে মুহাদ্দিসে কেরাম কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেন। প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়ায়ে মুতায় অংশগ্রহণ করেননি। তবুও তাকে গাযওয়া নামেই নামকরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হযরত মাহাদি রাযিআল্লাহু আনহু যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নায়েব পাশাপাশি তাঁর উম্মত হবেন, তার উদ্দেশ্য হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আনিত ধর্মকে বিশ্ব ব্যাগী বাস্তবায়ন করা এবং হযরত মাহাদি রাযিআল্লাহু আনহু যেহেতু তার বংশের হবেন, নবীজীর নামেই হবে তার নাম। হযরত মাহাদি রাযিআল্লাহু আনহু এই যুদ্ধ পরিচালনা করবেন তাই এ যুদ্ধকে গাযওয়া বলা হয়েছে। তৃতীয়ত কতক মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন,

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس غزوے کی تمام معلومات دیں اور عہد لیا کہ جو زندہ رہے وہ اس غزوے میں ضرور شریک ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت نے ان کو اس غزوے کا سربراہ بنادیا اور یہ جنگ غزوہ قرار پائی۔

যেহেতু প্রিয় নবী এই গযওয়া সম্পর্কে সমস্ত তথ্য দিয়েছিলেন এবং এই অঙ্গিকার নিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি ঐ সময় বেঁচে থাকবে অবশ্যই সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত এই যুদ্ধের জন্য লোকদের থেকে বাইআত নিয়ে ছিলেন।

তাই তিনিই এই গাযওয়ার প্রধান পরিচালক। ফলে একে গাযওয়াহ্ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৩০. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আগমন গাযওয়াতুল হিন্দ ব্যাতিরেকে সম্ভব নয়।

পাকিস্তানের এক আলেম বলেন,

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول غزوہ ہند کے دوران ممکن نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُس وقت ظاہر ہوں گے جب حضرت مہدی غزوہ ہند کی فتوحات مکمل کر کے شام کی طرف بڑھیں گے

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম -এর অবতরণ গাযওয়াতুল হিন্দ -এর সময় সম্ভব নয়, বরং হযরত মাহাদি রাযিআল্লাহু আনহু যখন গাযওয়া বিজয় সম্পন্ন করে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হবেন তখন ঈসা মসিহ আলাইহিস সালাম উপস্থিত হবেন।

দ্বিতীয় পাঠ

সমাজে আজ মুসলিম নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট। চারদিক থেকে মুসলমানের উপর ধেয়ে আসছে কালো ভয়াল থাবা। মুশরিক কাফেররা যখন চূড়ান্ত যুদ্ধের শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক তখনও উম্মাহের কতক শ্রেণীকে দেখা যায় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট বিষয়সমূহকে অস্বীকার করতে। কিন্তু যদি বিষয়টি অস্বিকার বা না মানা পর্যন্তই থকতো তাদের এই সংক্রামক ব্যাধি সমাজে প্রচার না করতো তাহলে -এর ক্ষতি এতেই সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু কিছু ভাই ক্ষত বিক্ষত উম্মাহর দেহে নুন ছিটা দিতে এক পা তৎপর। উম্মাহের স্বত:সিদ্ধ বিষয়াবলি অস্বীকার করে অকপটে তা ভুল, মিথ্যা, ভ্রান্ত বলে প্রচার করছে।

ঠিক এবইয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গ কাঙ্ক্ষিত "গাযওয়াতুল হিন্দ" এ হিন আপত্তি থেকে মুক্ত নয়। আলোচ্য বিষয় নানা মিথ্যা ও মিথের যাতাকলে পিষ্ট। নানা বিধি প্রপাগান্ডা সহকারে কিছু ভ্রান্ত দলিলাদির মাধ্যমে এক দল মানুষ সাধুর বেশে মানুষকে ভ্রষ্ট করে চলছে।

আমরা তাদের আপত্তির কতক দিক হাদীসের মান যাচাইয়ের আলোচনায় প্রাসাঙ্গিক ভাবে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তাদের প্রপাগান্ডার মূল যুক্তি হচ্ছে, গাযওয়াতুল হিন্দের সকল হাদিস যইফ, তাই ইসলামি শরীআহ অনুযায়ী গাযওয়াতুল হিন্দ একটি অপ্রমানিত অধ্যায়। তাদের ভ্রষ্ট মতাদের এই অসাধু ভ্রষ্টাচারের সামন্য পর্যালোচনা নিয়ে যইফ হাদিস বিষয়ক ছোট্ট বিশ্লেষণের অবতার।

(যাদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তারা এই পাঠটি এড়িয়ে যেতে পারেন।)

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানি বলেন, কোনো রাবী যেমন কারো নিকট সিকাহ্ এবং কারো নিকট যইফ হতে পারে, ঠিক তেমন কোনো হাদিস তা কারো নিকট যইফ ও হাসান হতে পারে। যা ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ -এর একটি কিতাব থেকে বুঝে আসে।[১]

যইফ হাদিস কি?

যে হাদিস হাসান হাদিসের পর্যায়ে উপনিত হয় নি।

যইফ হাদিস দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

যইফ হাদিস দ্বারা বাতিল বা মুনকার হাদিস উদ্দেশ্য নয় এবং মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট ব্যক্তিও উদ্দেশ্য নয়। যইফের অনেক স্তর আছে সুতরাং যদি কোন বাব বা অধ্যায়ে এমন কোন আসার না পাওয়া যায় এবং তা কোন সাহাবি বা এজমা -এর খেলাফ বিপরিতে না হয় তাহলে কিয়াস তথা নিজের মতের তুলনায় সে অনুযায়ী আমল করা অধিক অগ্রগণ্য।[২]

যইফ কখন সহিহ্ বা হাসান হয়?

কোন যইফ হাদিস সহিহ্ হওয়ার কোন আলামত নির্দেশক থাকলে তা ছহিহ বলে গণ্য হয়।[৩]

কোন হাসান হাদিস যদি অপর কোন সনদে বর্ণনা হয় তাহলে তা ছহিহ হবে। যদিও তা মাত্র একটি সনদ হয়। -এর মাধ্যমে হাসান হাদিসটি শক্তিশালী হবে এবং হাসান থেকে ছহিহ -এর স্তরে উপনিত হবে।[৪]

সব সহিহ্ হাদিস কি দলিল যোগ্য?

যইফ হাদিস -এর ছহিহ হওয়ার যদি কোন কারিনা বা আলামত প্রকাশ পায় তাহলে যইফ দ্বারা দলিল দেয়া যাবে। অনুরূপভাবে যদি কোন ছহিহ হাদিস

---

১. কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস।পৃ.৪৯

২. কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস।পৃ.৯৯

৩. ফাতহুল ক্বাদির। পৃ.১-৪৬১

৪. তদিরিবুর রাবী। পৃ.১০৩

অনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করা যায় যখন তার বিপরিতে কোন আলামত প্রকাশ পায়।[৫]

আল্লামা মুহাদ্দিস আসসারানী বলেন, অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ যইফ হাদিস এর মাধ্যমে দলিল দিয়ে থাকেন। যখন তার তুরুক বা বর্ণনা মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর কখনো তা হাসান হয় আবার কখনো তা ছহিহ হয়।[৬]

ছহিহ ও যইফ কিসের ভিত্তিতে?

ছহিহ বা যইফ হওয়ার হুকুম দেয়া হয় সনদের বাহ্যিক দিক লক্ষ করে, অন্যথা যে হাদিসটি যইফ বলে প্রচারিত তা ছহিহ ও হতে পারে।[৭]

যদি কোন বিষয়ে সহিহ হাদিস অন্য কোন নস (দলীল) না থাকে তাহলে?

কোন বিষয়ে যঈফ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন নস (দলীল) পাওয়া না গেলে তা-ই একমাত্র অবলম্বন:

মুহাম্মাদ ইবনে সাদ আল বাওয়ারদী

আল্লামা সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাদ আল বাওয়ারদী থেকে বর্ণনা করেন-

كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجتمع على تركه قال ابن منده وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال وهذا أيضاً رأي الإمام أحمد فإنه قال إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال

অর্থ : ইমাম নাসাঈর মাযহাব ছিল তিনি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির হাদীস আনতেন যাকে তরক করার ব্যপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম একমত হননি। ইবনে মানদাহ বলেন, অনুরূপভাবে ইমাম আবূ দাউদ ও তার পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি দুর্বল সনদের হাদীস (তার সুনানে) নিয়ে আসেন যখন

[৫]. কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস।পৃ.৫৬

[৬]. আল মিযান লি সুয়ূতি। পৃ.১-৬৮

[৭]. ফাতহুল ক্বাদির। পৃ.১-৭৫

তিনি কোন অধ্যায় যঈফ সনদ ব্যতীত অন্য কোন হাদীস না পান। কেননা তার নিকট যঈফ সনদ মানুষের কিয়াস থেকে উত্তম। আর এটা ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ -এরও মত। তিনি বলেছেন যঈফ হাদীস আমার নিকট মানুষের কিয়াসের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।[১]

হাফেয আল্লামা সাখাবী রাহিমাহুল্লাহ (৯০২ হি.)

হাফেয সাখাবী রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল মুগীছে বলেন-

احتج رحمه الله بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره، وتبعه أبو داود وقدماه على الرأي، والقياس ويقال عن أبي حنيفة أيضاً ذلك، وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره

অর্থ : ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ (....) যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যখন তিনি কোন অধ্যায়ে উক্ত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস না পান। ইমাম আবু দাউদও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তারা উভয়েই হাদীসকে যুক্তি ও কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আবু হানীফার রাহিমাহুল্লাহ (১৫০ হি.) ব্যাপারেও অনুরূপ বলা হবে। আর ইমাম শাফী রাহিমাহুল্লাহ (২০৪ হি.) মুরসাল রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন যখন তিনি তা ছাড়া অন্য কোন রেওয়ায়াত না পান।[২]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ (৭৫১ হি.)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قولَ صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس

وليس أحَدٌ من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافِقُه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و قد قَدَّم الحديثَ الضعيف على القياس...

..وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسَل، والمنقطع، والبَلاغات، وقولَ الصحابي على القياس

---

১. আল্লামা সুয়ূতী, তাদবীবুর রাবী, পৃষ্ঠা ৯৭

২. হাফেয সাখবী, ফাতহুল মুগীছ, পৃষ্ঠা ১২০

فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ ولا قول الصحابة أو أحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عَدَل إلى الأصل الخامس وهو القياس

অর্থ : ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ (.....) যখন কোন অধ্যায়ে কোন আছার পান না, কোন সাহাবীর বক্তব্য পান না বরং এমন যঈফ হাদীস পান যার বিপরীতে উম্মতের ইজমা বর্ণিত হয়নি তখন তার নিকট উক্ত যঈফ হাদীসের উপর আমল করাই উত্তম কিয়াসের চেয়ে।

ইমামদের মধ্য হতে এমন কেউ নেই যে যিনি এই মূলনীতিতে একমত নন। তাদের মধ্য হতে একজনও এমন নেই যে যিনি যঈফ হাদীসকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেন না।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ (১৭৯ হি.) মুরসাল, মুনকতে (যার সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে), বালাগাত এবং সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেন কিয়াসের উপর।

আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ (২৪১ হি.) যখন কোন বিষয়ে দলীল খুজে পান না এবং সাহাবায়ে কেরামের বা তাদের কারো বক্তব্য পান না এবং কোন যঈফ বা মুরসাল রেওয়ায়াতও পান না তখন পঞ্চম মূলনীতি কিয়াসের প্রতি ধাবিত হন।[৩]

আল্লামা ইমাম ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ (৪৫৬ হি.)

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

وأصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس إذا لم يجد في الباب غيره

অর্থ : সমস্ত হানাফী উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, আবূ হানীফাহ রাহিমাহুল্লাহ (১৫০ হি.) -এর মাযহাব হল, কিয়াস করার চেয়ে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা তার নিকট উত্তম যখন তিনি উক্ত হাদীস ছাড়া অন্য কিছু পান না।[৪]

---

৩. ইবনুল কাইউম হাম্বলী, ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন ১/৩১ (انتهي بتقديم و تاخير)

৪. আন নুকাত আলা ইবনুস সালাহ ২/৩১৯ (শামেলা)

ইবনে হাযম অন্যত্র বলেন-

আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ (১৫০ হি.) বলেছেন আল্লাহ তায়ালার রাসুল থেকে বর্ণিত যঈফ হাদীস আমার নিকট কিয়াসের চেয়ে উত্তম। তা থাকা অবস্থায় কিয়াস করা জায়েয নেই।[১]

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আয়িম্মায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসীনদের মুলনীতি হল কোন বিষয়ে তারা যঈফ হাদীস পেলে যুক্তির পিছনে পড়েন না। বরং উক্ত বিষয়ে অন্য কোন দলীল পাওয়া না গেলে তা-ই একমাত্র অবলম্বন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের যঈফ হাদীস ও মানুষের যুক্তি ও বিবেকের অনেক উর্ধ্বে তাই আল্লাহ তাআলার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যঈফ সনদে বর্ণিত কোন হাদীস বা বুখারী মুসলিমের বাইরে কোন হাদীসের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ববতী সমস্ত মুহাদ্দিসীনের তরীকা পরিপন্থী। যার সামান্যতম বিবেক আছে তার জন্য এটা শোভনীয় নয়। বিশেষভাবে যখন উক্ত বিষয়ে অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায় না।

সকল দুর্বল রাবীর বর্ণনা কি গ্রহণীয়?

হ্যাঁ, ইমামদের উল্লিখিত বক্তব্য সকল দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং দুর্বলতা গ্রহণের একটি সহনীয় মাত্রা রয়েছে। এ ব্যাপারে শায়েখ আওয়ামা বলেন এক্ষেত্রে যঈফ হাদীসকে চার ভাগে ভাগ করা প্রয়োজন।

১. ঐ যঈফ হাদীস যার দুর্বলতা মুতাবাআত বা শাহেদ দ্বারা দূর হয়ে গিয়েছে। আর এগুলো হলো ঐ পর্যায়ের হাদীস যেগুলোর কোন এক রাবীর ব্যাপারে বলা হয় তিনি হাদীসে শিথিল বা তার মধ্যে শিথিলতা রয়েছে।

২. মধ্যম পর্যায়ের দুর্বল। যার রাবীর ব্যাপারে বলা হয় তিনি হাদীসে দুর্বল বা তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত বা মুনকারুল হাদীস।

৩. মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল। আর তা হল এমন হাদীস যাতে মিথ্যার অপবাদে জড়িত ব্যক্তি থাকে।

---

১. আল ইহকাম ফি উছুলিল আহকাম ৭/৫৪

৪. মওজূ বা জাল বর্ণনা।

ইমাম আহমাদ সহ অন্যান্য ইমামদের বক্তব্য উপরোক্ত প্রথম দুই প্রকারের জন্য প্রযোজ্য।[২]

যদি যইফ হাদিস এমন হয় তা লোক মুখে প্রচারিত এবং সকলের মুখে মুখে তার কথা আলোচনা হয় যদি আয়িম্মায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীন হাদিসটিকে কবূলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে?

কোন যঈফ হাদীসকে উম্মত যখন কবূলের দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণ করে তখন তার উপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

কখনও কখনও কোন হাদীসের প্রতি সহীহ্ হওয়ার হুকুম লাগানো হয় যখন তা উম্মত (-এর আয়িম্মায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীন) কবূলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে। যদিও তার কোন সহীহ্ সনদ না থেকে থাকে।

হাফেয সাখাবী রাহিমাহুল্লাহ (৯০২ হি.) ফাতহুল মুগীছে বলেন–

إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث لا وصية لوارث إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له

অর্থ: উম্মত যখন কোন যঈফ হাদীসকে কবূলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তখন তার উপর আমল করা হবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী। এমনকি তা মুতাওয়াতের -এর পর্যায়ে পৌছে যায়। ফলে তা অটাক্যভাবে প্রমাণীত কোন বিষয়কেও রহিত করে দেয়। এজন্যই ইমাম শাফী রাহিমাহুল্লাহ (২০৪ হি) "ওয়ারিসের জন্য কোন ওসিয়ত নেই" এই হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন মুহাদ্দিসীনে কেরাম উক্ত হাদীসটি সহীহ্ সনদে মেনে নেননি। তবে উম্মত তা গ্রহণ করেছে এবং তার উপর আমল করেছে। এমনকি কুরআনের ওসিয়তের আয়াতকে পর্যন্ত তা রহিত করে দিয়েছে।[৩]

---

[২]. আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী, কাওয়ায়িদু ফি উলূমিল হাদীস, পৃষ্ঠা ১০০,১০১

[৩]. হাফেয সাখাবী, ফাতহুল মুগীছ, পৃষ্ঠা ১২০

আল্লামা সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

قال ابن عبد البر في الاستذكار : لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر : « هو الطهور ماؤه » ، وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده . لكن الحديث عندي صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول

অর্থ: ইবনু আব্দিল বার তার ইস্তেযকার নামক কিতাবে যখন তিরমিজী রাহিমাহুল্লাহ (২৭৯ হি.) -এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী সমুদ্রের হাদীসকে সহীহ বলেছেন "তার পানি পবিত্র" অথচ মুহাদ্দিসীন এ ধরনের সনদকে সহীহ বলেন না তখন বলেন তবে হাদীসটি আমার নিকট সহীহ কেননা উলামায়ে কেরাম তা কবূলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন।[১]

আল্লামা সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন "হাদীসটি তিরমিজী রাহিমাহুল্লাহ (২৭৯ হি.) এনেছেন এবং বলেছেন ইমাম আহমাদ সহ অন্যরা হুসাইনকে যঈফ বলেছেন। আহলে ইলমদের নিকট উক্ত হাদীসের উপর আমল জারী রয়েছে। একথা দ্বারা তিরমিজী রাহিমাহুল্লাহ (২৭৯ হি.) এদিকে ইশারা করেছেন যে, হাদীসটি উলামাদের সমর্থনে শক্তিশালী হয়েছে। আর অনেকেই স্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ করেছেন আহলে ইলমদের কোন হাদীসের সপক্ষে বক্তব্যই হাদীস সহীহ হওয়ার দলীল। যদিও তার নির্ভরযোগ্য কোন সনদ না থেকে থাকে।[২]

অন্যত্র আল্লামা সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح

অর্থ: যখন মানুষ কোন হাদীসকে কবূলের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করে তখন উক্ত হাদীসকে সহীহ হওয়ার ফয়সালা দেওয়া হয়। যদিও তার কোন সহীহ সনদ না থেকে থাকে।[৩]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন-(৮৫২ হি.)

কোন হাদীস কবূল হওয়ার গুনাবলীর মধ্য হতে একটি হল হাদীসের বিষয়বস্তুর উপর উলামায়ে কেরাম আমলের ব্যপারে একমত হবেন। এমন

---

১. আল্লামা সুয়ূতী, তাদরীবুল রাবী, পৃষ্ঠা ২৫

২. আত-তাআক্কুবাত, পৃষ্ঠা ১২

৩. তাদরীবুর বারী, পৃষ্ঠা ২৪

হাদীসকে কবূল করা হবে এমনকি তার উপর আমল করা ওয়াজিব। আয়িম্মায়ে উছূলের একটি জামাআত এমনটি বলেছেন।[৪]

মুহক্কিক ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ

মুহক্কিক ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল ক্বদীরে বলেন-

وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيثَ أَيْضًا عَمَلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَفْقِهِ وَقَالَ مَالِكٌ شُهْرَةُ الْحَدِيثِ بِالْمَدِينَةِ تُغْنِي عَنْ صِحَّةِ سَنَدِهِ

অর্থ: কোন হাদীসের স্বপক্ষে উলামায়ে কেরামের আমল হাদীসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করার একটি কারণ। আর ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন কোন হাদীস মদীনাতে প্রসিদ্ধ হওয়া তার সনদ সহীহ হওয়াকে বেনিয়াজ করে দেয়।[৫]

উপরে আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, যখন কোন হাদীসকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন যঈফ সাব্যস্ত করেন আর কিছু মুহাদ্দিসীন সহীহ সাব্যস্ত করেন তখন হাদীসটি সহীহ সাব্যস্তকরণে যারা যঈফ বলেছেন তাদের বক্তব্য কোন প্রভাব ফেলবে না। কেননা যারা হাদীসটিকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন তারা এই দিকটি বিবেচনা করেছেন যে হাদীসটির সনদ সমূহের মধ্য থেকে কোন সনদই আপত্তি থেকে খালি নয়। আর যারা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন তারা উম্মতের হাদীসটিকে কবূলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করা এবং হাদীসটির সনদগুলোর সমষ্টিগত বিচারে তা বলেছেন।

বরং আমাদের নিকট কোন হাদীসকে উম্মত কবূলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করলে তা মুতাওয়াতের -এর পর্যায়ে পৌছে যায়।

আল্লামা জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ আহকামুল কুরআনে বলেন-

وقد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة، وإن كان وروده من طريق الآحاد، فصار في حيز التواتر؛ لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواضع،

---

৪. আল ইফসা আলা নুকাতি ইবনুস সালাহ

৫. ফাতহুল ক্বাদীর ৩/১৪৩

অর্থ: এই দুটি হাদীসকে উম্মত আমলে নিয়েছেন যদিও তা খবরে ওয়াহেদের (একক সূত্রের) ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। এটা মুতাওয়াতের -এর মত হয়ে গিয়েছে। কেননা কোন খবরে ওয়াহেদকে যখন উম্মত কবূলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তখন তা মুতাওয়াতের পর্যায়ে পৌছে যায়। -এর ব্যক্তি আমার একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছি।[১]

আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রাহিমাহুল্লাহ

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন-

وهذا الحديثُ ضعيفٌ باتفاق مع ثبوت حُكْمه بالإجماع وذهب بعضُهم إلى أن الحديثَ إذا تأيَّد بالعملِ ارتقى من حال الضَّعْف إلى مرتبة القبول قلت: وهو الأَوْجَهُ عندي وإن كَبُر على المشغوفِين بالإسناد واعتبارُ الواقع عندي أولى مِن المَشْي على القواعد (انتهي بتقديم وتاخير يسير)

অর্থ: ওয়ারিশের জন্য কোন ওসিয়ত নেই" হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ তবে তার হুকুম প্রমাণীত হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। তিনি আরো বলেন উলামাদের একটি দল বলেছেন কোন হাদীস যখন (উম্মতের) আমল দ্বারা শক্তিশালী হয় তখন তা দুর্বল অবস্থা থেকে কবূলের স্তরে পৌছে যায়। আর এটাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যদিও তা যারা সনদ নিয়ে গবেষণা করেন তাদের জন্য ভারি হয়ে উঠে। বাস্তবতার বিবেচনা আমার নিকট নীতির উপর চলার চেয়ে উত্তম।[২]

সারকথা কোন হাদীস সনদের বিচারে যঈফ হলেই তা আমলযোগ্য নয় এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। বরং কোন হাদীস যঈফ হলেও যদি উম্মত তা কবূলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে উক্ত হাদীসের উপর উলামায়ে কেরামের আমল চালু থাকে তবে এটাই উক্ত হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করবে। যেমনটি উপরে উল্লিখিত পাহাড় সমতুল্য এক ঝাঁক পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

---

১. আহকামুল কুরআন, জাসসাস ১/৩৮৬

২. ফয়জুল বারী ৩/৪০৯

গাযওয়াতুল হিন্দ একটি জিহাদ সম্পর্কিত বিষয়। মরলে শহীদ তো বাঁচলে গাজী। **এমন ফাযায়েল পূর্ণ বিষয়ে কি যঈফ হাদীস গ্রহণ করা যাবে?**

ফাযায়েলে আমালে যঈফ হাদীস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে - এর জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। আর ক্ষেত্র বিশেষে আহকামেও যঈফ হাদীসের উপর আমল করা হয়। যেমনটি পূর্বের দুই শিরোনাম দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

জেনে রাখা উচিত যে, সনদের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে আহকাম এবং গায়রে আহকাম (যা আহকামের সাথে সম্পৃক্ত নয়) উভয়টি বরাবর। যার কোন সনদ নেই তা ধর্তব্য নয়। তবে উভয়ের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল হালাল হারাম সংক্রান্ত আহকামের হাদীসে কড়াকড়ি করা হয়। এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যঈফ সনদকে কবুল করা হয় কিছু শর্ত সাপেক্ষে যেগুলো উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।[৩]

ইমাম আহমাদ সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন-

إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا

অর্থ: যখন আমরা হালাল-হারামে রেওয়ায়াত করি তখন সনদে খুব কড়াকড়ি করি। আর যখন ফযীলাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে রেওয়ায়াত করি তখন শিথিলতা করি।[৪]

মোল্লা আলী কারী রাহিমাহুল্লাহ (১০১৪ হি.) বলেন, যঈফ হাদীস ফাযায়েলে আমালে গ্রহণযোগ্য সমস্ত বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের নিকট।

তিনি অন্যত্র বলেন, ফাযায়েলে আমালে যঈফ হাদীসের উপর সর্বসম্মতিক্রমে আমল করা হবে। এজন্যই আমাদের আয়িম্মায়ে কেরাম বলেছে, মাথা মাসেহ করা সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব।[৫]

---

৩. আল-আজউবাতুল ফাযেলা, পৃষ্ঠা ৩৬

৪. হাফেয সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী ১/২৯৮

৫. আলমাউজূআত, মোল্যা কারী, পৃঃ ৭৩

আল্লামা সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ফাতোয়া দিয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতাকে তার জন্য জীবিত করা হয়েছিল এই মর্মে বর্ণিত হাদীসটি জাল নয়। যেমনটি হাফেযে হাদীসের একটি দল দাবী করেছেন। বরং তা ঐ পর্যায়ের যঈফ হাদীস যাতে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে বর্ণনা করতে শিথিলতা করা হয়।[১]

উক্ত হাদীসটির ব্যাপারে তিনি অন্যত্র বলেন, উলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে তার সনদের দুর্বলতাকে ক্ষমাযোগ্য মনে করেন এবং ফাযায়েল ও মর্যাদার অধ্যায়ে যা সহীহ নয় এমন হাদীসের আনয়ন গ্রহণযোগ্য মনে করেন।[২]

হাফেয ইরাকী রাহিমাহুল্লাহ (৮০৬ হি.) বলেন, যা জাল নয় তার সনদে শিথিলতা করা উলামায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন এবং আহকাম ও আকায়েদ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা উল্লেখ করা ছাড়াই বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন। বরং ফাযায়েলে আমাল, ঘটনা, ওয়াজ ইত্যাদি বিষয়ের তারগীব ও তারহীবে অনুমতি দিয়েছেন। আর যদি তা হালাল-হারাম সম্বলিত আহকামে শরইয়্যাহ -এর মধ্যে হয় অথবা আকায়েদে হয় যেমন আল্লাহ তাআলার ছিফাত এবং তার জন্য যা সম্ভব ও অসম্ভব ইত্যাদি তবে তারা তাতে শিথিলতা করেন না। ইমামদের মধ্য থেকে যারা এমনটি বলেছেন তাদের অন্যতম হলেন আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক রাহিমাহুমুল্লাহ সহ অন্যান্যরা।[৩]

আল্লামা নববী রাহিমাহুল্লাহ (৬৭৬ হিজরি) বলেন-

ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام

অর্থ: হাদীস বিশারদকারীদের নিকট যঈফ সনদ সমূহে শিথিলতা করা এবং জাল ছাড়া দুর্বল হাদীসের দুর্বলতা উল্লেখ করা ব্যতীত বর্ণনা করা জায়েয।

---

১. আত তাযীম ওয়াল মিন্নাহ, সুয়ূতী, পৃষ্ঠা ২

২. আল-মাকামাতুস সুনদুসিয়্যাহ, সুয়ূতী, পৃষ্ঠা ৫

৩. শরহু আল ফিয়াতিল হাদীস, হাফেয ইরাকী, ২/২৯১

আর তার উপর আমল করা বৈধ। যখন তা আহকাম এবং আল্লাহ তায়ালার ছিফাতের ব্যাপারে না হয়।[৪]

তবে এ কথাও স্বতসিদ্ধ যে ফাযায়েলে আমালে সকল প্রকার দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। বরং -এর একটি সহনীয় মাত্রা রয়েছে। উলামায়ে কেরাম যঈফ হাদীস ফাযায়েলে আমালে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

হাফেয সাখাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

سمعت شيخنا ابن حجر مرارا يقول شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة

الأول متفق عليه وهوأن يكون الضعف غير شديد كحديث من انفرد من الكذابين والمتهمين ممن فحش غلطه

والثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا

والثالث أن لا يعتقد عند العمل ثبوته لئلا ينسب إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} ما لم يقله

অর্থ: আমি আমার শায়েখ ইবনে হাজার আসক্বালানীকে বহুবার বলতে শুনেছি যঈফ হাদীসের উপর আমলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

এক. সর্বস্বীকৃত আর তা হল দুর্বলতা মারাত্মক পর্যায়ের হতে পারবে না। -এর দ্বারা ঐ সকল (দুর্বল) রেওয়ায়াত বের হয়ে গেল যা একক ভাবে কোন মিথ্যুক, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি এবং যার ভুল বেশী হয় এমন ব্যক্তি রেওয়ায়াত করে।

দুই. সাধারণ কোন মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে ঐ সকল উদ্ভাবন বের হয়ে গেল যার শরীআতে কোন ভিত্তি নেই।

তিন. তার উপর আমল করার সময় (অকাট্যভাবে) তা প্রমানীত হওয়ার বিশ্বাস না রাখা। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন কিছু সম্বন্ধ যুক্ত না করা হয় যা তিনি বলেননি।[১]

---

৪. তাক্বরীবে নববী, পৃষ্ঠা ১৯৬

উপরের আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে আহকাম ও আকায়েদ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। বিশেষভাবে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে।

বরং আহকামেও যঈফ হাদীসের উপর আমল করা হয় যখন তার মধ্যে সতর্কতা থাকে। আর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে কোন যঈফ হাদীসকে যখন কবুলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তখন তা সহীহ -এর কাতারে চলে যায় এবং তার উপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

কিন্তু আফসোসের বিষয় আমাদের মধ্যে এক শ্রেণির তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ যারা স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিগতভাবে লেখাপড়া করেই দ্বীন পেতে চায় এবং দ্বীনের কর্ণধার হতে চায় তারা যখন কোন হাদীসের ব্যপারে যঈফ শব্দটি শুনতে পায়, তাদের চেহারা পাল্টে যায়। তারা মনে করে যঈফ হাদীসকে সর্বদা ছেড়ে দেওয়াই অটল একটি সিদ্ধান্ত। অথচ এটা পূর্ববতি এবং পরবর্তি সকল উলামা এবং মুহাদ্দিসীনের মূলনীতি পরিপন্থি। এক্ষেত্রে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহিমাহুল্লাহ -এর একটি উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখার মত যা তার অন্যতম যোগ্য শাগরেদ আল্লামা ইউসূফ বানূরী রাহিমাহুল্লাহ নকল করেছেন। তিনি বলতেন "সনদের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য যে যাতে দ্বীনের মধ্যে এমন জিনিস প্রবেশ করতে না পারে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্য না যে, যারা সনদ নিয়ে গবেষণা করেন তাদের কর্মে প্রমানীত বিষয় দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়"।

অর্থাৎ সনদ নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণা আমাদের পূর্ববর্তিগণ এজন্য করেছেন যাতে বানোয়াট জিনিস দ্বীনে প্রবেশ না করতে পারে। তাদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে দ্বীনী বিষয়কে দ্বীন থেকে বের করে দেওয়া।

যঈফ হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হলে কি হয়?

কোন যঈফ হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা তা হাসান লি-গাইরিহী -এর পর্যায়ে পৌছে যায়।

---

১. আল কওলুল বদী, হাফেয সাখাবী পৃষ্ঠা ১৯৫

আল্লামা যফর আহমাদ ওসমানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন কোন যঈফ হাদীস যখন একাধিক সনদে বর্ণিত হয় যদিও তার ভিন্ন একটি মাত্র সনদ থাকে তবে সমষ্টিগত বিচারে হাদীসটি হাসানের মর্যাদায় পৌছে যায় এবং তা দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্য হয়।[২]

আল্লামা সূয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

ولا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقان لو أنفرد كل منهما لم يكن حجة كما في المرسل إذا ورد من وجه آخر مسند

অর্থ: যে হাদীসের দুটি সনদ রয়েছে তা দ্বারা দলীল পেশ করতে দোষণীয় কিছু নেই যদিও পৃথকভাবে প্রত্যেকটি সনদ দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্য না হয়। যেমন মুরসালের ক্ষেত্রে যখন তা ভিন্ন একটি মুসনাদ সনদে বর্ণিত হয় (তখন তা গ্রহণযোগ্য)।[৩]

তিনি অন্যত্র বলেন-

وكذا إذا كان ضعفها لإرسال أو تدليس أو جهالة رجال زال بمجيئه من وجه آخر وكان دون الحسن لذاته

অর্থ: যদি কোন হাদীসের দুর্বলতা -এরসালের ব্যক্তি বা তাদলীসের ব্যক্তি বা রাবীর অবস্থা অজ্ঞতার ব্যক্তি হয় তবে ভিন্ন সনদে আসার দ্বারা উক্ত দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে। তখন হাদীসটি (হাসান লি গাইরিহী হবে) হাসান লি জাতিহী হবে না।[৪]

হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله لا دونه وكذا المختلط الذي لم يتميز و المستور و الاسناد المرسل و كذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف من إسناده صار حديثهم حسناً لا لذاته

অর্থ: যার স্মরণশক্তিতে দুর্বলতা রয়েছে এমন কোন রাবীর সমর্থনে যখন গ্রহণযোগ্য কোন রাবী পাওয়া যায় আর তা তার সমকক্ষ বা উপরে হয় তার

---

২. যফর আহমাদ ওসমানী, কাওয়ায়িদ ফি উলূমিল হাদীস, পৃষ্ঠা ৭৮

৩. তাদবীবুর রাবী, সুয়ূতী, পৃষ্ঠা ৯১

৪.তাদবীবুর রাবী, সুয়ূতী পৃষ্ঠা ১০৪

নিচে না হয় অথবা উক্ত সমর্থন এমন রাবীর পাওয়া যায় যে গোলতাল পাকিয়ে ফেলে, একটি থেকে অন্যটি আলাদা করতে পারে না অথবা উক্ত সমর্থন কোন অজানা রাবীর বা মুরসাল সনদের বা কোন মুদাল্লাস সনদের পাওয়া যায় তখন তাদের হাদীস (যঈফের সীমা অতিক্রম করে) হাসান হয়ে যাবে। তবে হাসান লিযাতিহী নয় বরং হাসান লি-গাইরিহী।[১]

আল্লামা শারানী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, প্রায় সকল মুহাদ্দিসীন যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যখন তার একাধিক সনদ পাওয়া যায়। তারা কখনও উক্ত হাদীসকে সহীহের সাথে সম্পৃক্ত করেন কখনও হাসানের সাথে।[২]

আল্লামা তাক্বী উদ্দীন সুবকী রাহিমাহুল্লাহ্ ইবনুস সালাহ্ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এক প্রকার যঈফ হাদীস যার দুর্বলতা বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তির দুর্বলতার ব্যক্তি হয়। অথচ বর্ণনাকারী সত্যবাদি এবং আমানতদার। আমরা যখন দেখব উল্লিখিত রাবী যা বর্ণনা করেছে তা ভিন্ন সনদে বর্ণিত রয়েছে তখন আমরা বুঝব তিনি সঠিক বর্ণনা করেছেন এবং উক্ত হাদীস আয়ত্ত করতে তার কোন ত্রুটি হয়নি। -এরপর সুবকী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, কাজেই এই ধরনের কয়েকটি যঈফ হাদীস একত্রিত হয়ে যাওয়া শক্তিতে বৃদ্ধি করে। আর -এর দ্বারা হাদীসটি হাসান বা সহীহ -এর পর্যায়ে উন্নিত হয়।[৩]

হাফেয ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ ইখতিসারু উলূমিল হাদীস নামক কিতাবের হাসান হাদীসের আলোচনায় বলেন-

قَالَ ٱلشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو لَا يَلْزَمُ مِنْ وُرُودِ ٱلْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا لِأَنَّ ٱلضَّعْفَ يَتَفَاوَتُ فَمِنْهُ مَا لَا يَزُولُ وَمِنْهُ ضَعْفٌ يَزُولُ بِالْمُتَابَعَةِ كَمَا إِذَا كَانَ رَاوِيهِ سَيِّئَ ٱلْحِفْظِ أَوْ رَوَى ٱلْحَدِيثَ مُرْسَلًا فَإِنَّ ٱلْمُتَابَعَةَ تَنْفَعُ حِينَئِذٍ وَيُرْفَعُ ٱلْحَدِيثُ عَنْ حَضِيضِ ٱلضَّعْفِ إِلَى أَوْجِ ٱلْحُسْنِ أَوْ ٱلصِّحَّةِ

অর্থ: শায়েখ আবূ আমর উবনুস সলাহ্ বলেছেন কোন হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা তা হাসান হওয়া জরুরী নয়। কেননা দুর্বলতার

[১].ইবনে হাজার, শরহে নুখবাহ, পৃষ্ঠা ৭৪,৭৫

[২].আল্লামা শারানী, আল-মীযান ১/৬৮

[৩].শিফাউস সাকাম, পৃষ্ঠা ১১

একাধিক স্তর রয়েছে। -এর মধ্যে কিছু দুর্বলতা একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা দূর হয় না। আর কতক দুর্বলতা একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা দূর হয়ে যায়। যেমন কোন দুর্বল হাদীসের বর্ণনাকারী যদি দুর্বল স্মৃতিশক্তির হয় অথবা হাদীসটি মুরসাল সনদে বর্ণিত হয় তখন ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীসটিকে পাওয়া উল্লিখিত দুর্বল হাদীসকে উপকৃত করবে এবং হাদীসটি দুর্বলতার তলদেশ থেকে হাসান অথবা সহীহের শিখরে উঠে আসবে।[৪]

সারকথা কোন হাদীসকে কোন একটি দুর্বল সনদে দেখেই তার বিষয়বস্তুকে দুর্বল বলে দেওয়া যাবে না। বরং উক্ত হাদীসটি একাধিক সনদে পাওয়া গেলে তা দুর্বলতা থেকে কেটে উঠে হাসান অথবা সহীহের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কেননা সেক্ষেত্রে একটি সনদ অপরটিকে মজবূত করে। হাসানের স্তরে উন্নিত হয়।

---

[৪].ইখতিসারু উলূমিল হাদীস, পৃষ্ঠা ৪৩

তৃতীয় পাঠ

প্রথম পাঠ আলোচনার মাধ্যমে গাযওয়াতুল হিন্দ -এর সত্যতা ও বাস্তবতা আমাদের কাছে ফুটে উঠেছে। তো এবার আমাদের জানা প্রয়োজন আসলে হাদিসে বর্ণিত হিন্দ ও সিন্দ কোনটি। যদি আমরা হিন্দ ও সিন্দ -এর ভৌগলিক আলোচনা করার মাধ্যমে তার সীমানা নির্ধারণ করতে পারি তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পট পর্যালোচনা করতে আমাদের তেমন বেগ পেতে হবে না।

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আমরা হিন্দ-এর সীমানা নির্ধারণ করবো। এ ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা প্রাচীন ভূগোলবিদগণের গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার চেষ্টা করেছি।

ভৌগলিক বিশ্লেষণ:

আমারা হাদিসের ব্যাখ্যা ও আলোচনায় দেখলাম যে, সিন্দ এবং হিন্দ দুটি এক নয়। উভয়টিরই ভৌগলিক সীমানা ভিন্ন। এবং সিন্দ আরব ভূখণ্ডের নিকটে। এবার আমরা নিচের আলোচনায় সে স্থান দুটি নিয়ে ভৌগলিক বিশ্লেষণ করবো।

মুজামুল বুলদান

শুরু থেকে আলোচনা করা যাক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্ম ৫৭০ খ্রিঃ। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন ৪০ বছর বয়সে। অর্থাৎ নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় খ্রিষ্ট সন চলছে ৬১০ খ্রী সুতরাং আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৪১০ খ্রী বছর পূর্বে। চলুন আমরা ঘুরে দেখে আসি কেমন ছিল ১৪১০ খ্রী বছর আগের পৃথিবি ও তার ভৌগলিক অবস্থা।

প্রথমে একটু প্রাচীন কিতাব সমূহের আলোচনা থেকে শুরু করি। হিজরী ৫৭৯ সন। জন্ম গ্রহণ করেন ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হামাবি আল-রুমি বাগদাদী। যার ডাক নাম ছিল শিহাবুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ।

তিনি রচনা করেন শহর পরিচিতি নিয়ে কালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মুজামুল বুলদান (معجم البلدان) ।

এই কিতাবটিতে তিনি প্রাচীন শহর এবং তার ভৌগলিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ভূপৃষ্ঠ কে ৭ ভাগে আল ইকলিম আস-সাবআ' হিসেবে আলোচনা করেন। তার এই সাত ভাগে ভাগ করার কারণ হল মানুষজন পূর্ব থেকে এভাবেই অঞ্চলসমূহকে ভাগ করতো।

ইকলিমের পরিচয় ইমাম মুহাম্মাদ আলি থানভি (محمد علي التهانوي) আল-কাশ্শাফ গ্রন্থে এভাবে দেন,

قسم أهل الهيئة الأرض أربعة أقسام متساوية —بأن فرضوا على الأرض دائرتين إحداهما المسماة خط الاستواء والأخرى التي تمر بقطبيه-- وسموا واحدا من تلك الأقسام بالربع المعمور والربع المسكون؛ ثم قسموا المعمور سبعة قطاع موازية لخط الاستواء، فيتشابه أحوال البقاع الواقعة في ذلك القسم، وسموا تلك الأقسام بالأقاليم[1] .

ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ সাত ভাগে ভাগ করার প্রধান ও প্রথম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন,

الأول: اصطلاح العامة وجمهور الأمة وهو الجاري على ألسنة الناس دائما وهو أن يسموا كل ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى إقليما نحو الصين وخراسان والعراق والشام ومصر وإفريقية ونحو ذلك فالأقاليم على هذا كثيرة لا تحصى.

-এরপর তিনি প্রথম ভূখণ্ড হিসেবে বলেন,

فهو من المشرق يبتدىء من أقصى بلاد الصين ويمر على ما يلي الجنوب، من الصين وفيه جزيرة سرنديب وعلى سواحل البحر في جنوب بلاد السند، ثم يقطع البحر إلى جزيرة العرب وأرض اليمن[2] .

ইনশাআল্লাহ আমরা একটু পরেই চিত্রের মাধ্যমে এই স্থানটুকু নির্ণয় করার চেষ্টা করবো। তাই এখানে অনুবাদ তুলে ধরলাম না।

---

[1] كشاف اصطلاحات الفنون

[2] معجم البلدان — في ذكر الأقاليم السبعة

অপরদিকে মুজামুল বুলদান গ্রন্থের তুলনায় অতি সুনির্দিষ্ট করে বর্ণনা দেন ইমাম আবু বকর অহমাদ ইবনে আলি ইবনে সাবেত খতিবে বাগদাদি, তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে। তিনি প্রথম ইকলিম হিসেবে বলেন,

الإقليم الأول منها إقليم بلاد الهند[1].

এযাবত আলোচনার মোদ্দাকথা থেকে "আল-হিন্দ" -এর সীমানা নির্ণয় হল।

অতএব এটা নিশ্চিত যে, প্রথম ইকলিম হল, ইকলিমে বিলাদে হিন্দ । তথা হিন্দ উপমহাদেশ। নিচে তা চিত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেখানো হলো।

প্রথম চিত্রঃ

---
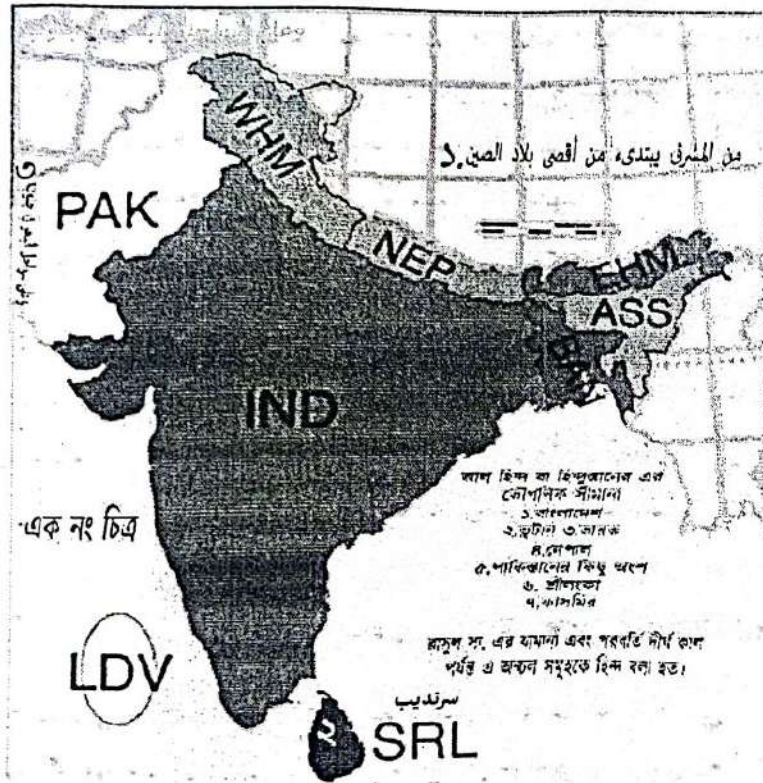
[1] تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.

দ্বিতীয় চিত্র:

১. من المشرق يبتدىء من أقصى بلاد الصين, চিনের প্রান্ত থেকে শুরু।

২. وفيه جزيرة سرنديب,স্বর্ণ দ্বীপ বা শ্রীলংকা -এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. وعلى سواحل البحر في جنوب بلاد السند, এবং দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে সিন্দু দেশ।

৪. ثم يقطع البحر إلى جزيرة العرب وأرض اليمن,অত:পর সমুদ্র শেষ হয়েছে আরব উপদ্বীপ -এর ইয়েমেন অঞ্চলে।

গ্রন্থাকার শুরু অর্থাৎ চিনের ভূমির কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ويمر على ما يلي الجنوب من الصين, অর্থাৎ চিনের দক্ষিণে বরাবর নিচে যে অংশটুকু আছে তা। অর্থাৎ বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, আরাকান, মায়ানমারের কিছু অংশ ও বটে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এবার আসা যাক "আস-সিন্দ" -এর আলোচনায়। ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হামাবি আল-রুমি বাগদাদী আল মুজামুল বুলদান গ্রন্থে বলেন,

আল মুজামুল বুলদান, ৩য় খন্ড, ২৬৭ নং পৃঃ

السِّنْدُ : بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وآخره دال
مهملة : بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان ،
قالوا : السند والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن
يقطن بن حام بن نوح ، يقال للواحد من أهلها سِنديّ
والجمع سند مثل زنجيّ وزنج ، وبعض يجعل
مُكْران منها ويقول : هي خمس كوَر ، فأوّلها من
قبل كرمان مكران ثمّ طوران ثمّ السند ثمّ الهند ثمّ
المُلتان .

অর্থাৎ সিন্দুর বর্তমান ভৌগলিক সীমানা হল, হিন্দ কিরমান ও সিজিস্তোনের মধ্যবর্তী অঞ্চল। উত্তরে ও পশ্চিমে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশ, উত্তরে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ, দক্ষিণ-পূর্বে ও পূর্বে ভারতের গুজরাট ও রাজস্থান অঙ্গরাজ্যদ্বয়, এবং দক্ষিণে আরব সাগর। নিচে চিত্র দ্রষ্টব্য।

(SINDH) দেশ অংশটুকু ৭০০ খ্রি: এর সিন্ধ প্রদেশ।

রসুল স. এর নবুওয়তের ৯০ বছর পরের চিত্র এটি।

৭১১ খ্রি: মুহাম্মাদ বিন কাশিম এর নেতৃত্বাধীন ৬০০০ সৈন্যের এক বাহিনী পারস্যের সবচেয়ে পূর্বের 'মাকরান' (বর্তমান সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানের দক্ষিণ) অঞ্চলে এসে পৌঁছায়।

এটির উত্তরে ও পশ্চিমে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশ, উত্তরে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ, দক্ষিণ-পূর্বে ও পূর্বে ভারতের গুজরাট ও রাজস্থান অঙ্গরাজ্যদ্বয়, এবং দক্ষিণে আরব সাগর।

আমাদের এ যাবত আলোচনা থেকে প্রাচীন হিন্দ ও সিন্দ-এর সীমানা বুঝে আসলো। এবং এ কথা বুঝে আসলো যে, হিন্দ বলতে বাংলাদেশ,ভারত,পাকিস্তানের কিছু অংশ, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা এবং আরাকান ও মায়ানমারের কিছু আংশ বুঝায় । আর এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভৌগলিক চিত্র ও সীমানা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ।

তৃতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ে পুনরায় আমরা হিন্দ ও সিন্দ -এর সীমানা নির্ধারণের চেষ্টা করবো। তবে মৌলিক ভাবে এ প্রমাণের ভিত্তি হবে অধুনিক ভূগোলবিদগণের তথ্য উপাত্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিন্দ ও সিন্দ-এর ভৌগলিক আলোচনা ছিল ইসলামিক গবেষকগণের। যাদের এ ব্যাপারে বিশ্বাসের কমতি আছে তাদের জন্য নিচে অমুসলিম ভূগোল গবেষকগণের গ্রন্থ ও গবেষণা থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

আধুনিক ভূগোল গবেষকগণ

আধুনিক ভূগোল গবেষকগণ ইসলাম পূর্ব ভারতের ইতিহাসকে ১৬ টি ভাগে ভাগ করেন। [১]

১. প্রস্তর যুগ- ৭০,০০০-৩৩০০খ্রীষ্টপূর্ব
২. মেহেরগড়া- ৭০০০খ্রীষ্টপূর্ব
৩. হরপ্পা ও মহেঞ্জদর সভ্যতা-৩৩০০-১৭০০খ্রীষ্টপূর্ব
৪. হরপ্পা সংস্কৃতি-১৭০০-১৩০০খ্রীষ্টপূর্ব
৫. বৈদিক যুগ-১৫০০-৫০০খ্রীষ্টপূর্ব
৬. লৌহ যুগ-১২০০-৩০০খ্রীষ্টপূর্ব
৭. ষোড়াশ মহাজনপদ-৭০০-৩০০খ্রীষ্টপূর্ব
৮. মগধ সাম্রাজ্য-৫৪৫খ্রীষ্টপূর্ব
৯. মৌর্য সাম্রাজ্য-৩২১-১৮৪খ্রীষ্টপূর্ব

---

[1] [https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_India]

১০. মধ্যকালীন রাজ্যসমূহ-২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব
১১. চোল সাম্রাজ্য-২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব
১২. সাতবাহন সাম্রাজ্য-২৩০ খ্রীষ্টপূর্ব
১৩. কুষাণ সাম্রাজ্য-৬০-২৪০ খ্রীষ্টাব্দ
১৪. গুপ্ত সাম্রাজ্য-২৮০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ
১৫. পাল সাম্রাজ্য ৭৫০-১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দ
১৬. রাষ্ট্রকুট ৭৫৩-৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ -এরপর (ইসলামি আমল শুরু)

এবার আমরা যদি ১৪ নং গুপ্ত সাম্রাজ্য -এর ভৌগলিক স্থান চিহ্নিত করতে পারি তাহলে আমাদের ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ -এর ভারতের ভৌগলিক অবস্থান বুঝে আসবে। নিচে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ -এর ভৌগলিক ম্যাপ দেয়া হল। [২]

গুপ্ত সাম্রাজ্য-২৮০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ:
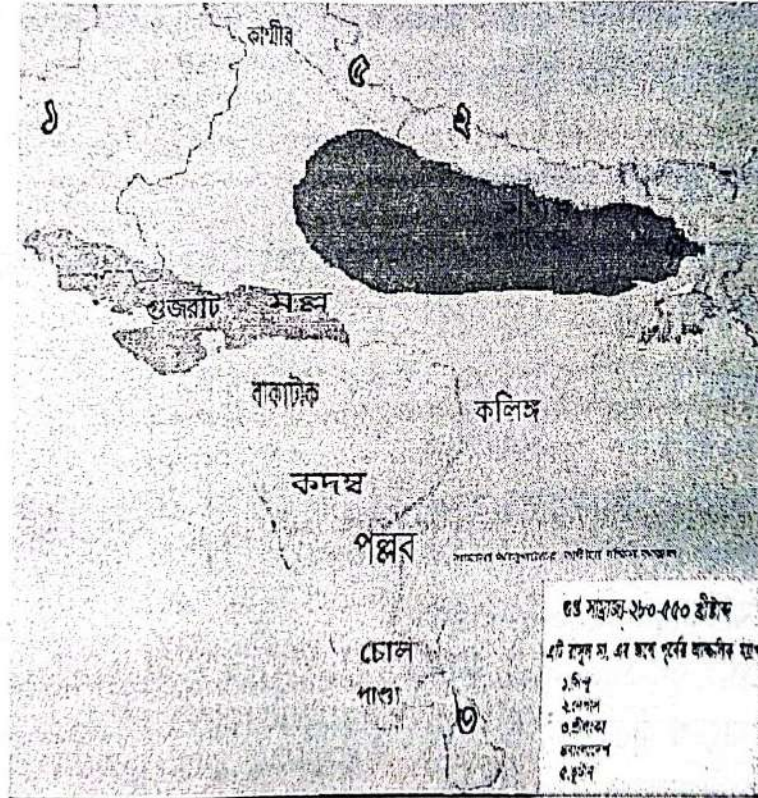
নিচের আরেকটি চিত্রের মাধ্যমে ৭৫০-৯০০খ্রি: -এর ম্যাপ দেয়া হল। [৩]

[2] [https://bit.ly/2vTZ4nh]
[3] [https://bit.ly/2E4E7dC]

পাল সাম্রাজ্য ৭৫০-১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দ:

এই চিত্রে স্পষ্ট দেখা যায় যে, হিন্দের মত সিন্দের আলাদা একটি ভূঅংশ বলে পরিচিত।

থমাস লেসম্যান

এবার সিন্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক। থমাস লেসম্যান (Thomas Lessman)। একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ। ২০ বছরেরও বেশি সময় যাবত বিশ্বের ইতিহাসের গবেষণা কাজে নিয়োজিত। তিনি www.worldhistorymaps.info ওয়েব সাইটে সিন্দুর একটি ম্যাপ প্রকাশ করেন। তার তথ্য মতে তিনি এটি ৭০০ খ্রি:(Sindh (Chachas) in 700 AD)-এর ভৌগলিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন।[১]

আমাদের পূর্ব উল্লিখিত ভৌগলিক সীমানাই তিনি সিন্দ -এর জন্য নির্ধারণ করেছেন। প্রয়োজন হলে ঘুরে অসতে পারি তার ব্যক্তিগত ওয়েব সাইট থেকে।

---

[1] [http://www.worldhistorymaps.info/images/Sindh_700ad.jpg]

আমাদের এ আলোচনা থেকে মোদ্দাকথা এটাই প্রতীয়মান হল যে, বর্তমান সীমারেখা অনুযায়ী বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের কিছু অংশ, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা এবং আরাকান ও মায়ানমারের কিছু অংশ হাদিসে বর্ণিত হিন্দের অন্তর্ভুক্ত। অতএব হাদিসে বর্ণিত কাঙ্ক্ষিত এবং প্রতিশ্রুত গাযওয়ায়ে হিন্দ এই অঞ্চলসমূহেই অনুষ্ঠিত হবে। আর আলোচ্য দলিলাদির মাধ্যমে তা প্রমাণ করার পর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

চতুর্থ পাঠ

তৃতীয় পাঠে আমরা হিন্দ ও সিন্দ -এর সীমানা নির্ধারনের চেষ্টা করেছি। আমাদের আলোচনা ও তথ্য উপাত্ত থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান সীমারেখা অনুযায়ী বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের কিছু অংশ, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা এবং আরাকান ও মায়ানমারের কিছু অংশ হাদিসে বর্ণিত হিন্দের অন্তর্ভুক্ত।

তো এবার আমরা একটু প্রাচীন ইতিহাসে ডুব দিতে যাচ্ছি। আমরা দেখবো ইতিহাসে কখনো এই কাঙ্ক্ষিত গাযওয়া সংগঠিত হয়েছি কি না। কিংবা ইসলাম আগমনের পর থেকে এ অঞ্চলে যে যুদ্ধ সমূহ পরিচালিত হয়েছে তার থেকে কোনোটি কি সেই কাঙ্ক্ষিত গাযওয়াতুল হিন্দ কি না! তো চলুন পাঠক আমরা একটু ফিরে তাকাই আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বের ইতিহাসে।

যুগে যুগে মুসলিমদের হিন্দ এলাকায় অভিযান ও প্রতিশ্রুত গাযওয়াতুল হিন্দঃ

আমরা শুরুতে যুগে যুগে মুসলমানদের হিন্দ অভিযানকে পয়েন্টভিত্তিক আলোচনা করবো। এবং সহজে অনুমানের জন্য আমরা ইতিহাসকে মোট এগারো ভাগে ভাগ করেব। এবং প্রতিটি আলোচনায় আমরা প্রধানত তিনটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

এক. ইসলামের অবস্থা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি।

দুই. মুসলমানদের পরিচালিত অভিযানসমূহ।

তিনঃ “গাযওয়াতুল হিন্দ” প্রেক্ষাপট ও হাদিসে বর্ণিত চিত্রের সাথে তুলনা।

বিশেষ নোট:

প্রথমত:

আমরা শুরুতে হাদিসসমূহ নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছি। আমাদের হাদিসসমূহের তাখরিজ এবং সনদের আলোচনায় এ বিষয়টিও ফুটে উঠেছে যে, উল্লিখিত হাদিস সমূহের কিছু ছহিহ, কিছু হাসান,কিছু ছিকাহ্ রাবীগণদের থেকে মারফু বর্ণনা সনদে বর্ণিত। সুতরাং গাযওয়ায়ে হিন্দ যে সংগঠিত হবে কিংবা ইতিহাসে কোন না কোন সময়ে তা হয়েছে তা সুনিশ্চিত।

কেননা, এই মোবারকময় যুদ্ধের সুসংবাদ দিয়েছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

আর তিনি মনগড়া কথা বলে না। যা বলেন,তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।[১]

আর সকল ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা আবশ্যক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা মূলত আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٞ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩) [النساء : ٥٩

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অত:পর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করাও যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর"।[২]

---

[১]. সুরা আন নাজম ৫৩-২-৩

[২]. সূরা নিসা: (৫৯)

দ্বিতীয়ত:

আমরা গাযওয়াতুল হিন্দ পরিচ্ছেদে যে সকল হাদিসসমূহ বর্ণিত হয়েছে তার একটি সামগ্রিক চিত্র তৈরি করত যুগে যুগে মুসলিম পরিচালিত অভিযানসমূহ পর্যালোচনা করবো। আর কোনো পরিচ্ছেদের সকল হাদিস একত্র করে যে একটি সামগ্রিক চিত্র ও রূপরেখা দাড় করিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করা যায় তা আল্লামা মোল্লা জিওন (রাহিমাহুল্লাহ) নুরুল আনওয়ার গ্রন্থ-এর একাটি ভাষ্য দ্বারা সুস্পষ্ট।

বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে গাযওয়াতুল হিন্দের সামগ্রিক চিত্রটি দাড়ায়,

১. বিজয়ের উদ্দেশ্যে এ উম্মাহর একটি দল সিন্দ ও হিন্দের দিকে যাবে। (হাদিস নং: ১, ৪)

২. যুদ্ধ করবে। (হাদিস নং: ১, ২, ৪)

৩. গোটা হিন্দ বিজয় করবে। (হাদিস নং: ৩, ৪, ৫)

৪. হিন্দুস্থানের রাজাদেরকে শিকল পড়িয়ে টেনে সিরিয়ায় আনবে। (হাদিস নং: ৩, ৪, ৫)

৫. যারা ফিরে আসবে, তারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম কে শামে পেয়ে যাবে। (হাদিস নং: ৩, ৫, ৭)

৬. সেই দলটি হিন্দে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করবে, যতক্ষণ না দাজ্জালের আগমন ঘটে। (হাদিস নং: ৪, ৭)

এবার আমরা মূল আলোচনার দিকে অগ্রসর হই।

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে সিন্দ ও হিন্দ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলিম ধর্ম প্রচারকেরা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারে ছড়িয়ে পড়েন। ওই একই সময় তারা ভারত, শ্রীলংকা, আফগানিস্তানেও ইসলামের বাণী নিয়ে আসেন।

৬২৯ সালে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৬৩২ খ্রি.) -এর জীবদ্দশাতেই ভারতে প্রথম মসজিদ স্থাপিত হয়। চেরামন পেরুমল নামে জনৈক নব মুসলিম সমাজের সাধারণ মুসলমানের জন্য কেরলের ত্রিসূর জেলায় মালিক ইবনে দিনার মসজিদটি নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য, পেরুমলকেই প্রথম ভারতীয় মুসলমান মনে করা হয়।

মালাবারের মাপ্পিলা সম্প্রদায়ই সম্ভবত প্রথম ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়; কারণ এই সম্প্রদায়ই আরব বণিকদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করত। এই সময় সমগ্র উপকূল জুড়ে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো হয় এবং বেশ কিছু স্থানীয় অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সকল নব্য ধর্মান্তরিতেরা মাপ্পিলা সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলেন। আরব বণিকদের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল।

২. আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু -এর শাসনামলে সিন্দ ও হিন্দ।

আমাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তারিখের কিতাবসমূহে হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু -এর যামানায় হিন্দ প্রদেশে মুসলমানদের কোনো অভিযানের বা যুদ্ধ পরিচালনার কোনো তথ্য নেই।

৩. উমর রাযিআল্লাহু আনহু -এর শাসনামলে সিন্দ ও হিন্দ।

এক. ইসলামের অবস্থা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি।

খলিফা আবু বকর রাযি.এর মত হযরত উমর রাযি. কে ইসলামের একতা ধরে রাখার মত কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়নি। খলিফা আবু বকর রাযি. এর খেলাফত কালে সাসানি নিয়ন্ত্রিত মেসোপটমিয়াতে মুসলিমদের ছোটখাটো অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। উমর রাযি. এগুলো অব্যাহত রাখেন। মুসলমানদের এই সামরিক অভিযান ছিল নতুন ধরনের একটি যুদ্ধ।

সিরিয়া ও মেসোপটমিয়াতে ৬৩৩ খ্রি. এক সাথে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়। ৬৩৫ খ্রি. দামেস্ক বিজয় হয়। ৬৩৮ খ্রি. সিরিয়া মুসলমানদের নিয়ন্ত্রনে এসে যায়।

দুই. মুসলমানদের পরিচালিত অভিযানসমূহ।

হযরত ওমর রাযিআল্লাহু আনহু কর্তৃক নিযুক্ত বাহরাইন ও ওমানের শাসনকর্তা প্রখ্যাত সাহাবী উসমান ইবনে আবুল আস সাক্বাফী রাযিআল্লাহু আনহু ৬৪৩ সনে স্বীয় ভাই আল হাকাম কে সিন্দ -এর বরুচ অঞ্চলে এবং অপর ভাই মুগীরা ইবনে আবুল আসকে দেবল অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি নিজেও নৌবহর নিয়ে মুম্বাইয়ের নিকটে থান-এ হামলা চালান। তারা তথাস্থ ক্ষমতাসীনদের পরাস্থ করে প্রথম সিন্দ অঞ্চলে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেন। ফুতুহুল বুলদানের তথ্যমতে তিনটি অভিযানই সফল হয়,[১] তবে অন্য সূত্রমতে মুগীরা দেবলে পরাজিত ও নিহত হন।[২]

এ সময় সিন্দ অঞ্চলে আগত সাহাবীগণের নাম।

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওতবান রাযি.।
২. আশইয়াম ইবনে আমর তামিমী রাযি.।
৩. সোহার ইবনে আল আবদি রাযি.।
৪. সুহাইল ইবনে আদী রাযি.।

অন্যন্য অনেক সাহাবিই সে সময় সিন্দ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

তিন: গাযওয়াতুল হিন্দের প্রেক্ষাপট ও হাদিসে বর্ণিত চিত্রের সাথে তুলনা।

১. প্রসিদ্ধ লেখক আবুল আব্বাস আহমাদ তার *কিতাব ফুতুহুল বুলদান* গ্রন্থে বলেন, উসমান ইবনে আবুল আস সাক্বাফী রাযিআল্লাহু আনহু আল হাকাম -এর সিন্দের বরুচ অঞ্চলে এবং মুগীরা ইবনে আবুল আস -এর দেবল অভিযানের কথা উমর রাযিআল্লাহু আনহু কে জানানো হয়নি বলে তিনি উসমান ইবনে আবুল আসকে তিরস্কার করেন।[৩]

---

১. আল বালাযুরি, আবুল আব্বাস আহমাদ, "কিতাব ফুতুহুল বুলদান, ২য় খণ্ড",পৃ.২২৭

২. [Fredunbeg, Mirza Kalichbeg, "the Chachnama: An Ancient History of Sind", pp57]

৩. আল বালাযুরি, আবুল আব্বাস আহমাদ , "কিতাব ফুতুহুল বুলদান, ২য় খণ্ড-পৃ.২১২০

২. হিন্দুস্তানের ইতিহাস নিয়ে কিছু কিছু বই পুস্তক অধ্যয়ন করলে একটি বিষয় ফুটে ওঠে যে, মূলত অভিযানগুলো হয়েছিলো জলদস্যুদের বিরুদ্ধে, যারা আরব সাগরে তাদের নিরাপত্তার জন্য কাল ছিলো। তাই তারা বাণিজ্যপথ নিরাপদ রাখার জন্যে, এই অভিযান প্রেরণ করেন ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে নয়। এজন্য দেখা যেতে পারে হিন্দু লেখক সেন শৈলেন্দ্র নাথ -এর "Ancient Indian History and Civilization 2nd Edition"বই -এর ৩৪৬ পৃষ্ঠা। এবং খুশালানি গোবিন্দ, -এর "Chachnama Retold An Account of the Arab Conquests of Sindh" বই -এর ২২১ পৃষ্ঠা।তাছাড়া "Spread of Islam throughout the World " বই -এর ৫৯৪ পৃষ্ঠাতেও -এর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

৩.আমরা ইতিপূর্বে গাযওয়াতুল হিন্দের সকল হাদিসসমূহ থেকে পয়েন্টভিত্তিক যে চিত্রটি পেয়েছি তার দ্বিতীয় পয়েন্ট এবং প্রথম পয়েন্টের সম্ভাব্য চিত্র পরিলক্ষিত হলেও বাকি অন্যান্য পয়েন্টগুলো এখানে বিদ্যমান নেই। সুতরাং বলা যায় এটা কাঙ্ক্ষিত ও প্রতিশ্রুত গাযওয়াতুল হিন্দ নয়।

৪. উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে সিন্দ ও হিন্দ।

এক. ইসলামের অবস্থা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি।

হযরত উসমান রাযি. এর যামানায় সাসানিরা বহুবার ছোটখাটো যুদ্ধে ও অভিযানে পরাজয় বরণ করে। ৬৫০ খ্রি. ইরানের একটি বড় শহর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে।

দুই. মুসলমানদের পরিচালিত অভিযানসমূহ।

উসমান রাযিআল্লাহু আনহু -এর শাসনামলে তৎকর্তৃক নিযুক্ত মারাকানের শাসনকর্তা উবাইদুল্লাহ ইবনে মামার তামিমী সিন্দ নদ পর্যন্ত ভূ-ভাগ স্বীয় শাসনাধীন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সিন্দ-এর আবহাওয়া সৈন্য বহিনীর অনুকূলে হচ্ছেনা জানতে পেরে খলীফা সৈন্যদের সম্মুখ অগ্রসর হতে নিষেধ করেন। সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ৩১ হি. সনে

সিজিস্তানের শাসকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং সিন্দ অঞ্চলের বহু এলাকা নিজের অধিকারে আনতে সক্ষম হন।

তিন: গাযওয়াতুল হিন্দের প্রেক্ষাপট ও হাদিসে বর্ণিত চিত্রের সাথে তুলনা।

এসময় মুসলমানদের যুদ্ধসমূহের দিকে লক্ষ করলে এ চিত্র দিবালোকের ন্যায় ফুটে ওঠে যে, গাযওয়াতুল হিন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র এখানে বিদ্যমান। সুতরাং বলা যায় এ অভিযানের মাধ্যমে সিন্দে বিজয় সূচনা হয়েছে। তা সত্তেও এ বিজয় হিন্দ বিজয়ের পূর্বাভাগ হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা এখানে এটা লক্ষ রাখা আবশ্যক যে হাদিসের মাঝে সিন্দ ও হিন্দ অংশে আরবি হরফ "ওয়াও হারফুল আতফ" যোগে আনা হয়েছে। যা কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত একত্রকরণের জন্য আনা হয়ে থাকে। সুতরাং এ ধারণাও সন্দেহযুক্ত যে, সিন্দ ও হিন্দ দুটো এক সাথেই বিজয় হবে। তাছাড়া হাদিসের চিত্রের তিন থেকে ছয় নং পয়েন্টগুলো এখানে অবিদ্যমান। আবার ভিন্ন সম্ভাবনাও এখানে বিদ্যমান। আর তা হল, বর্তমানে সিন্দ তথা পাকিস্থনের ইসলাম নামধারী গণতন্ত্র-তাগুত পূজারী সেকুলার মুরতাদ শাসকদের সাথেও তাওহিদের ঝান্ডাধারী একত্ববাদে বিশ্বাসী দল জিহাদ পরিচালনা করবেন। তখন সেই প্রতিশ্রুত বাহিনী সিন্দ তথা বর্তমান পাকিস্তান বিজয় করবে। তথাকার শাসন ব্যবস্থা ইসলামের আদলে ঢেলে সাজাবে।

৫.আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর যামানায় হিন্দ।

এক. ইসলামের অবস্থা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি।

বিদ্রোহীরা উসমান রাযি. কে হত্যা করার পর পরিস্থিতি এতটাই নিচে চলে গিয়েছিল কারও জন্যই আসলে মুসলিম বিশ্বকে আবার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারাটা সহজ ছিল না। ৬৫৮ খ্রি. খারিজীদের তিনি ধ্বংস করতে সক্ষম হন।

দুই. মুসলমানদের পরিচালিত অভিযানসমূহ।

হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর খিলাফত কালে ৩৯ হিজীর প্রথম দিকে তাঁর অনুমতি ক্রমে হারিস ইবনে মুররাহ আবদী নামে একজন বীর

মুজাহিদস একদল স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য নিয়ে সিন্ধের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ৪২ হিজরীতে তিনি সিন্দের কিকান নামক স্থানে প্রতিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সদলবলে নিহত হন।

তিন. গাযওয়াতুল হিন্দের প্রেক্ষাপট ও হাদিসে বর্ণিত চিত্রের সাথে তুলনা।

হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর খিলাফত কালে সিন্ধের অভিযান থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়, আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর অনুমতি ক্রমে পরিচালিত যুদ্ধটি গাযওয়াতুল হিন্দ ছিল না। তাছাড়া যদিও এখানে কেন্দ্রীয় খিলাফার পক্ষ থেকে সিন্দের উদ্দেশ্যে আক্রমণ অর্থাৎ এক ও দুই নং চিত্র -এর বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্য পয়েন্টসমূহ এখানে অনুপস্থিত।

৬.উমাইয়া খেলাফত কালে হিন্দ।

এক. ইসলামের অবস্থা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি।

৬৬১ খ্রি. থেকে ৬৮০ খ্রি. সাল পর্যন্ত হযরত মুআবিয়া রাযি. শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য এবং সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে। তিনি অনেক অঞ্চল জয় করেন।

দুই. মুসলমানদের পরিচালিত অভিযানসমূহ।

হযরত মুআবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু-এর যুগে প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে সাওয়ার আবদী অত:পর সিনান ইবনে সালামাহ হুযাইলী হিন্দ সীমানায় আক্রমণ করেন। পরে ৪৪ হিজরীতে প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে আবু সুফরাহ ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে পাঞ্জাবের লাহোর ও বান্না এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর হন।

কিন্তু উমাইয়া বংশের আল-ওয়ালীদ সিংহাসনে আরোহনের পর ইসলামের ইতিহাসে নতুন আরেকটি অধ্যায় সূচনা হয়। মুসা ইবনে নুসাইর সমগ্র উত্তর আফ্রিকা , তারিক স্পেন, কুতাইবা প্রাচ্যের দেশসমূহে ইসলামের বিজয় কেতান উড্ডীন করেন। তৎকালীন সময়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। হাজ্জাজের শাসনাধীন এলাকার কতিপয় বিদ্রুহী আরব সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সিন্দ অঞ্চলে প্রবেশ করলে তথাকার শাসনকর্তা রাজা দহির তাদের আশ্রয় দেয়।

ফলে হাজ্জাজ দহিরের ধৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য উবাইদুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে পরপর দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কুলিয়ে উঠতে না পারার কারণে তৃতীয় বারের মত জামাতা সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন।

তিন. *"গাযওয়াতুল হিন্দ"* প্রেক্ষাপট ও হাদিসে বর্ণিত চিত্রের সাথে তুলনা।

যদিও এ অভিযানের প্রথম উদ্দেশ্য ছিলো রাজা দাহিরের ধৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা দেওয়া কিন্তু বিজয়ের পরবর্তিতে যুদ্ধের মোর পাল্টে যায়। তিনি একের পর এক হিন্দ অঞ্চল কেন্দ্রীয় খিলাফার অন্তর্ভুক্ত করেন। তো এ ক্ষেত্রেও এক ও দুই নং পয়েন্ট পাওয়া গেলেও পরবর্তি পয়েন্ট সমূহ এখানে অনুপস্থিত।

কতক ইতিহাস গবেষক উমাইয়্যা খেলাফত কালে পরিচালিত মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম ও অন্যান্য যোদ্ধা কর্তৃক অভিযানকে গাযওয়াতুল হিন্দ বলে অবহিত করেন। তাদের দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে একটু পর্যালোচনা করা যাক।

১. হাফেজ ইবনে কাসির কর্তৃক বর্ণিত প্রথম দলিল:

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

"وقد غزا المسلمون الهند في أيام معاوية سنة أربع وأربعين.[১]

আর ৪৪ হিজরি সনে মুয়াবিয়াহ রাযিআল্লাহু আনহু -এর আমলে মুসলমানগণ হিন্দ অভিযান পরিচালনা করেন।[২]

২. সিদ্দিক হাসান খান (মৃ.১৩০৭) -এর উদৃতি থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় দলীল:

قال الشيخ صدّيق حسن خان-رحمه الله-توفي عام ١٣٠٧ هـ :

وأما الهند : ففتح في عهد " الوليد بن عبد الملك " على يد " محمد بن قاسم الثقفي " سنة اثنتين وتسعين الهجرية ، وبلغت راياته المظلة على الفوج من حدود " السند " إلى أقصى " قنوج " سنة خمس وتسعين.

১. [النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير

২. আল ফিতান ওয়াল মালাহিম, প্রথম খন্ড। আর রিহাব পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত।

আর হিন্দ ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেক -এর যামানায় ৯২ হি. সনে মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের হতে বিজয় হয়েছে। তার বিজয় পতাকা ৯৫ হি. পর্যন্ত সিন্দ থেকে কৌনজ অবধি বিস্তৃত করে নিয়েছিল।

৩. ইমাম ইবনে কাসির কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় দলীল:

وقال ابن كثير-رحمه الله - في حوادث سنة أربع وتسعين :

وفيها : افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند ، وغنم أموالاً لا تعد ولا توصف .[২]

মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম আস সাক্বাফী হিন্দ -এর ভূমি বিজয় করে নিয়েছিল। এবং অগনিত মাল তিনি গণিমত লাভ করে ছিলেন।

৪. আব্দুল ওয়াহহাব কর্তৃক বর্ণিত দলীল:

قال الأستاذ محمد عبد الوهاب بحيري-رحمه الله:

فائدة : الحديث المذكور-أي : حديث ثوبان-من أعلام النبوة فقد غزا المسلمون الهند والسند في عهد بني أمية-ثم شرع في ذِكر أحداث غزو الهند وفتحه .[٤]

বনি উমাইয়্য এর সময়কালে মুসলমানগণ হিন্দ ও সিন্দ বিজয় করেছেন। অত:পর তিনি গাযওয়াতুল হিন্দ এর হাদিস ও বিজয় ইতিহাস বর্ণনা করেন।

এক পশলা পর্যালোচনা:

মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম হিন্দ অভিযান করেন নি। বরং তিনি সিন্দ -এর কিছু অঞ্চল বিজয় করেছিলেন মাত্র। তিনি সিন্দ বিজয়ের পর মুলতান বিজয় করেন। অত:পর যখন তিনি কৌনজ অভিমুখে রওনা হবেন তখন তাকে দামেস্কে তলব করা হয়।[৫]

---

[٢] النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير

[٤] بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ٢٢٨/ ٤١١

[৫]. তাহরিকে দেওবন্দ। চেপে রাখা ইতিহাস।

চিত্র এক:

নিচে উমাইয়া খেলাফত -এর রাজ্য সীমানা দেখানো হল।

উইকিপিডিয়ায় এ ম্যাপটি প্রকাশ করে বলা হয়েছে, the Umayyad Caliphate on the eve of the invasions of Spain and Sindh in 710.

অর্থাৎ, ৭১০ সালে স্পেন ও সিন্দু আক্রমণ প্রাক্কালে উমাইয়া খিলাফত -এর বিস্তৃত অঞ্চলসমূহ। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম সিন্দ থেকে মুলতান অবধি গিয়েছিলেন।

চিত্র দুই:

Wikipedia তথ্যকোষে the campaign of Muhammad bin Qasim আলোচনায় একটি চিত্র যুক্ত করা আছে। যার শিরোনাম, Extent and expansion of Umayyad rule under Muhammad bin Qasim (modern international boundaries shown in red). অর্থাৎ, মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের অধীনে উমাইয়া শাসনের প্রসার ও সম্প্রসারণ। নিচে চিত্রটি দেয়া হল।
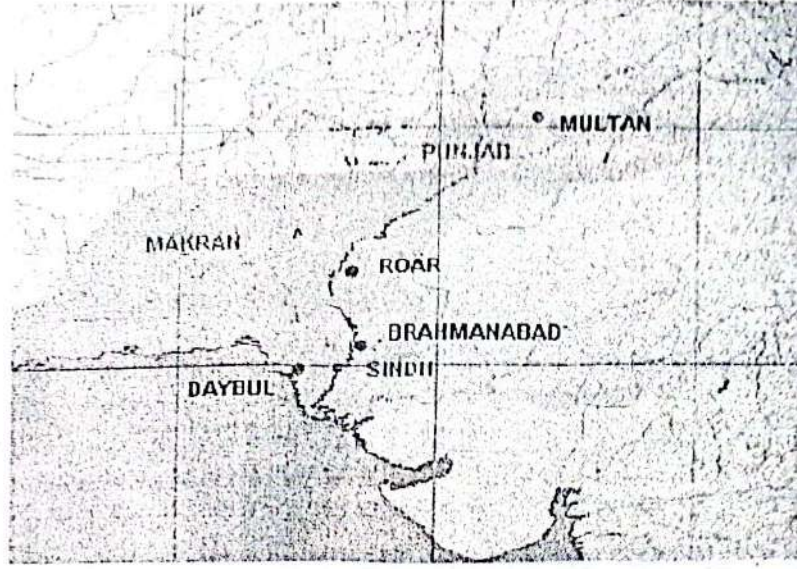
চিত্র তিন:

সিন্দ থেকে মুলতান। মোটামুটি দূরত্ব ৬৯৭ কি.মি।

চিত্র চারঃ
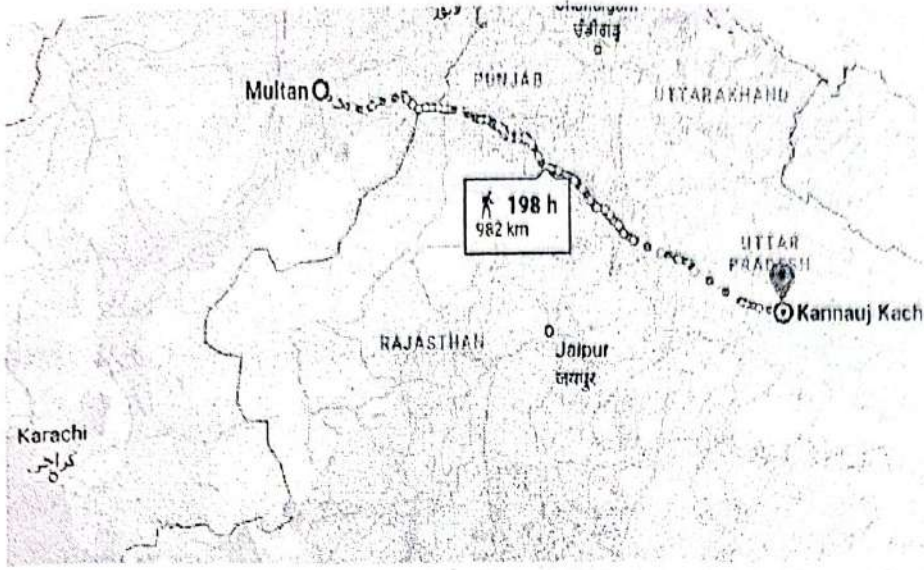
মুলতান থেকে কৌনজ। হাটা পথে 'দূরত : ৯৮২ কি.মি।

সুতরাং এটা নিশ্চত যে তখন হিন্দ বিজয় হয়নি। বড়জোর বলা যেতে পারে সিন্দ মুসলিম দখলে এসছে। যা আজ আফগান ও পাকিস্তানের কিছু অংশ।

৭. আব্বাসীয় খেলাফত কালে হিন্দ।

এক. ইসলামের অবস্থা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি।

৭৫০ খ্রী. উমাইয়্যা খেলাফত পতন ঘটলে আব্বাসীরা খেলাফত লাভ করেন।৭৫৪ খ্রী. থেকে ৮৭১ খ্রী. পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। ৮৭১ সালে নানান কারণে মুসলমানগণ দ্বিধায় পড়লে তারা খেলাফত থেকে ছিন্ন হয়ে মুলতান ও মানসুরাবাদে পৃথক পৃথক দুটি রাষ্ট্র গঠন করে। এতে করে হিন্দুরা শাসনকার্যে অনুপ্রবেশ করে। অনেক এলাকা হিন্দুদের দখলে চলে যায়। খণ্ড খণ্ড বাগী রাষ্ট্র গঠন হয়।

দুই. মুসলমানদের পরিচালিত অভিযানসমূহ।

কোন অভিযান প্রেরণ করা হয়নি।

তিন : "গাযওয়াতুল হিন্দ" প্রেক্ষাপট ও হাদিসে বর্ণিত চিত্রের সাথে তুলনা।

তুলনা করার তেমন কিছু নেই।

৯. কেন্দ্রীয় খিলাফা বহির্ভূত গজনী বংশের হিন্দ শাসন। [দশম শতাব্দীর]

এক. ইসলামের অবস্থা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি।

ইসলামি খেলাফত তখন একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তুর্কিদের খেলার পুতুল ছিল তখনকার খলিফাহগণ। সবদিক বিবেচনায় তখন ছিল পৃথিবী থেকে ইসলামি খেলাফত বিদাই কালের পরম কাল।

দুই. মুসলমানদের পরিচালিত অভিযানসমূহ।

মাহমুদ গাজনবী জীবদ্দশায় সর্বাধিক অভিযান পরিচালনা করেন ভারতের বিরুদ্ধে। শুধু ভারতেই তিনি ১৭ বার অভিযান প্রেরণ করেন এবং জয় লাভ করেন।

তিন: "গাযওয়াতুল হিন্দ" প্রেক্ষাপট ও হাদিসে বর্ণিত চিত্রের সাথে তুলনা।

প্রথম ভাগে গজনির মাহমুদ পাঞ্জাব গজনাভিদ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বর্তমান ভারত ভূখণ্ডের অন্যান্য স্থানেও অভিযান চালিয়েছিলেন।

ইমাম ইবনে কাসির রাহ. আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম গ্রন্থের إشارة نبوية إلى أن الجيش المسلم سيصل إلى الهند والسند ('রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করে গেছেন মুসলমানদের একটি বাহিনী অতি শীঘ্রই হিন্দ এবং সিন্ধে পৌঁছবে।) -এর অধিনে আলোচনা করেন। -এরপর তিনি আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত দুটি হাদিস উল্লেখ করার পর বলেন,

وقد غزا المسلمون الهند في سنة أربع وأربعين في إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجرت هناك أمور فذكرناها مبسوطة، وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود بن شنكنكير صاحب بلاد غزنة وما والاها في حدود أربعمائة ففعل هنالك أفعالاً مشهورة وأموراً مشكورة وكسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات وأخذ قلائده وسيوفه ورجع إلى بلاده سالماً غانماً،

'মুসলমানরা হিন্দে মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু-এর যুগে ৪৪ হিজরিতে যুদ্ধ করেছে। সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমি পূর্বে করে এসেছি। এছাড়া সুলতান মাহমুদ গাজনবী রাহ. হিন্দের গজনবী তে অভিযান পরিচালনা করেন। সুলতান মাহমুদের অভিযান ছিল ৪০০ হিজরিতে। সেখানে তিনি অনেক প্রসিদ্ধ কাজ এবং ঘটনা জন্ম দিয়েছেন। সেখানের সবচে বড় মন্দির সোমনাথ মন্দির ভেঙেছিলেন। সেখানের সম্পদ এবং তরবারি দখল করেন। -এরপর তিনি অনেক গনিমতের সম্পদ অর্জিত করে সহিহ সালামতে নিজের দেশে ফিরে আসেন।'[১]

তিনি গাজওয়ায়ে হিন্দ সংক্রান্ত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু-এর দুটি হাদিস উল্লেখ করার পর এ মত পেশ করেছেন। -এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ইবনে কাসির রাহ.-এর মতে গাজওয়ায়ে হিন্দের হাদিসগুলো কিয়ামতের আগের যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু-এর যুগে হিন্দে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটাই উদ্দেশ্য।

-এরপর সোমনাথ মন্দিরে সুলতান মাহমুদ গজ নবী রাহ.-এর অভিযানও গাজওয়ায়ে হিন্দের হাদিসের মাঝে শামিল। অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দের যুদ্ধের বাহিনীর যে সুসংবাদ দিয়েছেন, সে সুসংবাদের মধ্যে হিন্দুস্তানে মুসলমানরা যতগুলো অভিযান পরিচালনা করেছে, সবগুলোই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুসংবাদের মাঝে শামিল। -এর থেকে বোঝা যায় যে, হিন্দুস্তানে যুগে যুগে মুসলমানরা বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করবে।

সবগুলো অভিযান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের সুসংবাদের মাঝে শামিল। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আল্লামা ইবনে কাসির রাহ. কিয়ামতের আগের সংঘটিত গাজওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে আলোকপাত করেননি। বাকী কিয়ামতের আগের সংঘটিত হাদিসগুলো সম্পর্কে তিনি কোনো কথা বলেননি। এ জন্য আল্লামা ইবনে কাসির রাহ.-এর মতে কিয়ামতের আগে গাজওয়ায়ে হিন্দ বলতে কোনো যুদ্ধ হবে না এ কথা বলার অবকাশ নেই। হ্যাঁ, এতটুকু বোঝা যায় যে, ইমাম ইবনে কাসির

---

[১]. আল ফিতান ওয়াল মালাহিম: ১২-১৩, প্রথম খন্ড, আর রিহাব পাবলিকেসন্স থেকে প্রকাশিত।

রাহ.-এর মতে, হিন্দুস্তানের ইতিহাসে সংঘটিত সবগুলোই যুদ্ধই গাজওয়ায়ে হিন্দের সুসংবাদের মাঝে শামিল।

তবে এখানে একটি পর্যালোচনা দাবি রাখে আর তা হল সত্তিই কি সোমনাথ বা অন্যান্য আক্রমণ কাঙ্ক্ষিত গাযওয়াতুল হিন্দ হতে পারে।

নিচে অভিযানের কিছু কারণ ও ভাববার মত সংক্ষিপ্ত কয়েকটি পয়েন্ট বর্ণনা করা হল।

এক. দিলে আঘাত

তৎকালীন হিন্দু পুরোহিতরা সোমনাথ মন্দিরে ওদের দেবতা মূর্তির সামনে প্রায়ই নারীদের বলিদান করত। একবার একজন মুসলিম মেয়েকে বলি দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে ধর্ষণ করে। -এরপর দেবতার নামে তাকে হত্যা করে। সেই সময় বিশ্বের প্রভাবশালী মুসলিম সুলতান হিসেবে মাহমুদ গজনবীর দিলে আঘাত করে এ ঘটনাটা। একজন অবলা মেয়ের উপর এমন নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুব্ধ হবার অধিকার অবশ্যই আছে মাহমুদ গজনবীর। তাই তিনি দফায় দফায় সোমনাথ হামলা করে তা পদানত করার চেষ্টা করেন।

দুই. চরম ধোঁকাবাজি।

তৎকালীন সোমনাথ মন্দির নিয়ে অনেক কথা প্রচলিত ছিল। এর একটি হল, সোমনাথের মূর্তি-দেবতাটি স্বীয় অলৌকিক শক্তিতে শূন্যে ভাসমান, এটা তার দেবতা হবার বিশেষ নমুনা। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সোমনাথ বিজয়ের পরে সুলতান মাহমুদ গজনবী স্বীয় প্রকৌশলীদের দ্বারা মূর্তি ও তার আশপাশের পরীক্ষা করে দেখেন যে, শুধু লেবেলটাই আসল। বাকি সব মিথ্যে। কেননা প্রকৌশলীদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, সোমনাথের মূর্তি ভাসমান বা ঝুলন্ত কিছুই নয়। বরং মূর্তি নিয়ে একটা চরম ধোঁকাবাজি। এই মূর্তি ঝুলে থাকার কারণ, চারদিকের দেয়ালে লাগানো চুম্বকের চতুর্মুখী আকর্ষণ। যেই আকর্ষণে মূর্তিটি মাঝখানে ঝুলে থাকত। আর এটাকেই সাধারণ হিন্দুরা অলোকিক শক্তি মনে করে দেবতার শ্রদ্ধায় নত হত। হিন্দুদের এই অন্ধবিশ্বাস নস্যাৎ করার জন্যও সুলতান মাহমুদ গজনবী বারবার সোমনাথ আক্রমণ করেন।

তিন. রাজনৈতিক কূটকৌশল।

সোমনাথ এমন একটি মন্দির ছিল, যেখানে বসে হিন্দু রাজারা উপাসনার পরিবর্তে রাজ নৈতিক কূটকৌশলের শলা-পরামর্শ করত। নিজ দেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশের উপরে জুলুম-নিপীড়নের নীলনকশা তৈরি করত। বিশেষ করে ইসলামবিদ্বেষী যত ষড়যন্ত্র সব এখান থেকেই পরিচালিত হত। এ জন্য সুলতান মাহমুদ গজনবী বারবার তাদের এসব গোপন দূর্গে আঘাত করতেন।

চার. আকাশচুম্বী কনফিডেন্স।

সোমনাথ মন্দিরকে ঘিরে হিন্দুদের কনফিডেন্স ছিল আকাশচুম্বী। তারা মনে করত পৃথিবীর কোন শক্তিই সোমনাথ অভিযানে সফল হবে না। তাদের পাথুরে দেবতা হামলাকারীদের পরাজিত করবে। এসব মূক ও অচল দেবতাদের উপরে কেউই সোমনাথে বিজয়ী হতে পারবে না। এই ভিত্তিহীন আত্মবিশ্বাস থেকেই তারা প্রতিনিয়ত সুলতানকে চ্যালেঞ্জ করত। তাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অমূলক আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেয়ার জন্যই সুলতান বারবার সোমনাথ অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছেন।

পাঁচ. হিন্দু সেনা দ্বারা পরিচারিত সেনাবাহিনী।

সুলতান মাহমুদের সেনাবাহিনীর মাঝে ১২ জন ছিল হিন্দু সেনাধ্যক্ষ। -এর মধ্যে দুইজন সেনাধ্যক্ষ ছিল ব্রাক্ষণ। আর বাকিরা ছিল ক্ষত্রিয়। সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির অভিযানে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের অর্ধেকেই ছিল হিন্দু। এটা কি সম্ভব যে, হিন্দু বাহিনি দ্বারা মুসলমানদের গাযওয়াতুল হিন্দ হবে সেটা আবার খোদ হিন্দুদের সাথেই। এদ্বারা তো হিন্দুদের কে চির অযাদ আবু হুরাইরা বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। যদি আমরা এটাকে গাযওয়াতুল হিন্দ ধরি তাহলে হিন্দুদেরও জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা পাওয়া যায়। আর এটা শরিয়তের অন্যান্য নিতির বিপরীত।

ঐতিহাসিক হেইগ বলেন, তার ধর্মীয় নীতি সহিষ্ণুতার উপর গড়ে উঠেছিল এবং ইসলাম সম্বন্ধে উৎসাহী হলেও তিনি একটা বিরাট হিন্দু সৈন্যদল পোষণ করতেন।

ড. নাজিম বলেন, তিনি গজনীতে হিন্দু সংস্কৃতি-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি কলেজ ও একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ড. ঈশ্বরী টোপ্পা বলেন, মাহমুদ ভারতের মন্দিরগুলো আক্রমণ করেছিলেন এজন্য যে, তাতে বিপুল ধনরত্ন ছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল। ভারত থেকে ধনরত্ন নিয়ে গিয়ে গজনীতে তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রাচ্যের অন্যতম নগরীতে পরিণত করেন। মাহমুদ সতের বার ভারত আক্রমণ করলেও এদেশে স্থায়ী আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করেননি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, তার বিজয়ের ফলে একমাত্র পাঞ্জাবই চিরস্থায়ীভাবে গজনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ছয়. খিলাফাহ থেকে বাহিরে

আব্বসীয় খেলাফত দুর্বল হয়ে পড়লে খোরাসান ও তার পার্শবর্তী এলাকার সাসানিদগণ বিদ্রহ ঘোষণা করে কেন্দীয় খিলাফাহ থেকে বাগীতে পরিণত হন। এবং তার পিতা আলপতগীন খোরাসানের শাসনকর্তা নিযক্ত হয়ে ৯৬২ খ্রী. আবু বকর লাইককে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজত্ব গ্রহণ করেন। -এর পর আলপতগীনের কৃতদাস সবুক্তাগীনকে ক্ষমতায় বসানো হয়। সবুক্তগিন ৯৯৭ সালে তার পিতার মৃত্যু হলে সুলতান মাহমুদ তার অপর ভাই ইসমাইলের সাথে গজনবী সাম্রাজ্যের শাসনভার দখলের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এতে মাহমুদ তার ভাইকে পরাজিত করে গজনির শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন। কিন্তু বরাবরের মত তিনিও ছিল কেন্দ্রীয় খেলাফত কর্তৃক বাগী। যদিও ১০০০ খ্রীস্টাব্দের শুরুর দিকে সাসানিদদের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সরাসরি আব্বাসী খলিফার আস্থা অর্জন করে নিজেকে আব্বাসী খিলাফতের অধীনস্থ শাসক হিসেবে ঘোষণা করে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তার এ বশ্যতা ছিল নাম মাত্র সুলতান উপাধি গ্রহণ করার কৌশল মাত্র।

শেষ কথা, এবার একটু পর্যালোচনা করে দেখতে পারি কেন সেটা কাঙ্ক্ষিত গাযওয়াতুল হিন্দ হতে যাবে। এবার আপনি আমাদের বর্ণিত চিত্রের ছয়টি পয়েন্ট মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করুন। আশা করি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

পাকিস্তানের মাওলানা উমায়ের মাহমুদ সিদ্দিকি সাহেব গাজওয়ায়ে হিন্দ নামে উর্দু ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ লিখেছেন। ইমাম ইবনে কাসির রাহি.-এর বক্তব্য উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, আল্লামা ইবনে কাছির রাহিমাহুল্লাহ গাজওয়ায়ে হিন্দের হাদিসগুলো উল্লেখ করার পর সাথে সাথে তার ঐতিহাসিক এবং ফিতনা সম্পর্কিত লিখিত বইয়ে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন হামলা উল্লেখ করার দ্বারা এ কথা বোঝা যায় যে, তাঁর নিকট হিন্দুস্তানের সবগুলো যুদ্ধই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুসংবাদের শামিল। স্মরণ রাখতে হবে, উলামায়ে কেরাম গাজওয়ায়ে হিন্দকে কিয়ামতের আগের একটি নিদর্শন হিসাবে গণ্য করেছেন। সুতরাং তাদের মতে এ সুসংবাদের পূর্ণতা এখনো হয়নি।[১]

নির্দিষ্ট নয়

আল্লামা ইবনে কাসিরের মতে,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দের যুদ্ধ এবং সে বাহিনীর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে যে সুসংবাদ দিয়েছেন, সেটা শুধু একটি অভিযানের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং হিন্দুস্তানে মুসলমানরা যতগুলো অভিযান পরিচালনা করেছে, সবগুলো অভিযানের সৈন্যরাই সে ক্ষমাপ্রাপ্ত সুসংবাদের মাঝে শামিল।

এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, গাজওয়ায়ে হিন্দের সবগুলো হাদিস সামনে রাখলে বোঝা যায় , কিয়ামতের আগে মুসলমান আর কাফেরদের মাঝে আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধ হবে হিন্দুস্তানে। যে যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। মুসলমানরা হিন্দুস্তানের বাদশাহকে বন্দি করে নিয়ে আসবে গলায় শিকল লাগিয়ে। তারা যখন সিরিয়ায় ফিরে আসবে, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম -এর সাথে তাদের দেখা হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১০. মুহাম্মাদ ঘুরি

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরও সফলভাবে ভারতে অভিযান চালান মুহাম্মদ ঘুরি। তাঁর অভিযানের ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত দিল্লি সুলতানির পত্তন হয়।

---

[১]. গাজওয়ায়ে হিন্দ : ৪৮, ইসলামি রুহানি মিশন থেকে প্রকাশিত।

কিন্তু প্রতিটি অভিযান ছিল কেন্দ্রীয় খিলাফার বহির্ভূত। এবং তা ছিল নিছক দেশীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষার্থে।

১১. তখন থেকে আজ

কখনো খিলাফা আলা মিনহাজিন নাবুয়্যাত প্রতিষ্ঠা হয়নি এই হিন্দের মাটিতে। কখনো কোন মুসলিম কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভিযাণ প্রেরণ হয়নি এই হিন্দের যোদ্ধা মাটিতে।

সবশেষে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করছি, তা হল আমরা হাদিস গুলোর পূর্ণ তাহকিক এবং ছহিহ ও হাসান হওয়ার হুকুম বর্ণনা করেছি। এরপরও যদি অনেকের দাবিমতে শুধু একটি হাদিস তথা সাওবান রাযিআল্লাহু আনহু এর হাদিসটি ছহিহ ধরা হয় তবুও নিশ্চিত করে বলা যায় না যে অবশ্যই গাযওয়ায়ে হিন্দ হয়ে গেছে। তাছাড়া গাযওয়াতুল হিন্দ পরিচ্ছেদে আলোচিত ৬ টি হাদিস থেকে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয় যে গাযওয়াতুল হিন্দ এখনো সংঘটিত হয়নি। বরং বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি তো এটাই বলে প্রতিশ্রুত গাযওয়ায়ে হিন্দ অতি নিকটে। সময়ের প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে।

শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ বলেন,

الذي يبدو من ظاهر حديث ثوبان وحديث أبي هريرة . إن صح . أن غزوة الهند المقصودة ستكون في آخر الزمان ، في زمن قرب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام ، وليس في الزمن القريب الذي وقع في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه .[২]

সাওবান (রা) ও আবু হুরাইরা রা এর হাদিস যদি সহিহ হয় তাহলে হাদিসের ভাষ্য এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, কাঙ্ক্ষিত গাযওয়ায়ে হিন্দ এখনো সংগঠিত হয়নি। বরং শেষ যামানায় ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম -এর অবতরণের নিকটবর্তী সময়ে সংগঠিত হবে। এবং অবশ্যই তা মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু এর যামানায় ঘটে যাওয়া যুদ্ধ সমূহ নয়।

---

[2] [https://bit.ly/2WOnpqB
https://islamqa.info/ar/answers/145636/]

শায়েখ হামুদ আত-তুওয়াইজরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

" وما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه نعيم بن حماد من غزو الهند ؛ فهو لم يقع إلى الآن ، وسيقع عند نزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ، إن صح الحديث بذلك . والله أعلم " انتهى.

অর্থ : নুআইম ইবনে হাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদিসে যে গাজওয়াতুল হিন্দের কথা এসেছে তা এখনও সংঘটিত হয়নি। এ হাদিসটি সহিহ হলে সত্বরই তা ইসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণের সময়কালে সংঘটিত হবে।[১]

আল্লাহ আমাদের সঠিক অনুধাবনের তাওফিক দান করুন। আমিন । ইয়া রাব্বাল আলামিন।

---

১. ইতহাফুল জামাআহ : ১/৩৬৬, গাজওয়াতুল হিন্দসংক্রান্ত অধ্যায়, প্র. দারু সামিয়ি, রিয়াদ।

পঞ্চম পাঠ

আমরা প্রথম চারটি পাঠে হাদীস সমূহের বিশুদ্ধতা, ভৌগলিক বিশ্লেষণ, যুগে যুগে হিন্দ ও সিন্দ ও তথাস্থানে পরিচালিত অভিযান নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। এবার আমরা বর্তমানে বিষয়টি অনুধাবনের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য সূত্রের মাধ্যমে আসা কিছু সংবাদ ও প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করবো।

হাদিসে বর্ণিত হিন্দ এর মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

নেপালে বর্তমান মুসলিম চিত্র:

নেপালে মুসলমানদের অবস্থা হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণী দলিতদের চেয়েও নিচে। সরকারি চাকরি, শিক্ষা, ব্যবসা ও নাগরিক সুবিধা থেকে হচ্ছে বঞ্চিত।

ধর্মের দিক দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলমানদের অবস্থান হচ্ছে তৃতীয়। মুসলমানদের সাড়ে চার শতাংশ বলা হলেও বেসরকারি কয়েকটি গবেষণা ও এনজিও সংস্থার মতে এই হার আরো বেশি। তাদের মতে মুসলিম জনসংখ্যা কমপক্ষে সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত শতাংশ হবে। ৭৫টি জেলার মধ্যে গুঞ্জ, ভীরগুঞ্জ, জানাকপুরধাম, বিরাটনগর, রাজবিরাজ, সুনসুরি এবং কৃষ্ণা নগর জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা অন্যান্য জেলার চেয়ে উল্লেখ করার মতো বেশি।

নেপালের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিন্দু ধর্মের মূল চেতনাকে ঘিরে করা হয়েছে। তাই অন্যান্য ধর্মের স্বাধীনতা বা আইনি সুরক্ষা ও পালনে নেই কোনো বিশেষ ঘোষণা। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রেও নেপালের আইনকে সামনে রেখে পালন করতে হয়।

নেপালের মুসলমানরা ইসলাম ধর্মের প্রকৃত পরিচয় থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম ধর্মের কোনো পাঠ্য বই পড়ানো হয় না। আরবী বা ধর্মীয় শিক্ষার অনুমোদন নেই স্কুল গুলোতে।

নেপালী ভাষায় ইসলাম ধর্মের কোনো বই, কুরআনের অনুবাদ কিংবা তাফসির ও হাদীস নেই। ফলে ইসলাম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে নেপালের মুসলিমরা।

কাঠমান্ডুতে ১৩৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাঙ্কবার দাহাম স্কুল। এটিই মূলত মুসলমানদের শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে যতটুকু পারছে আলো ছড়াচ্ছে। কিছু মুসলমানদের উদ্যোগে হাতে গোনা কয়েকটি স্কুলে আরবি সিলেবাস পড়ানো হলেও তা নেপাল শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত নয়। স্কুলে অতিরিক্ত সিলেবাস হিসেবে তা পড়ানো হয়। কিন্তু আমেরিকায় টুইন টাওয়ার হামলার পরে সেখানেও হস্তক্ষেপ করেছে নেপাল সরকার। সীমিত করা হয় পাঠ্য পুস্তক। সংযোজন করা হয় ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বই। যে সব এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি সেসব এলাকায় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেনি।

কোনো মাদরাসার অনুমোদন দেওয়া হয় না নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশে আলিয়া মাদরাসার ধরনে নেই কোনো মাদরাসা। ফলে এখানকার মুসলিমরা শিক্ষায় যেমন পিছিয়ে পড়ছে, ঠিক তেমনি ইসলামের প্রকৃত আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মুসলমানদের পারিবারিক আইন পালনে বাধা রয়েছে। ছেলে মেয়েদের সম্পদ বণ্টনে রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে হয়। হিন্দুদের দেবতা হওয়ায় এখানে গরু জবাই করা আইনত নিষিদ্ধ। মুসলমানদের জন্য বা সমর্থিত কোনো আইনি সুরক্ষা নেই। নেই সাংবিধানিক কোনো নিরাপত্তা। সাধারণ আইনেই ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় চলতে হয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের।

মুসলমানদের জন্য আলাদা কোনো আইন নেই। বাংলাদেশে যেমন হিন্দু বিবাহ আইন আছে। কিন্তু নেপালে মুসলিম ম্যারেজ ল বা এ জাতীয় কোনো আইন নেই। বিবাহ কিংবা তালাক হয় মৌখিকভাবে।

ভূটানে বর্তমান মুসলমানদের চিত্র:

চিত্রটি তুলে ধরেছি নয়াদিগন্ত পত্রিকা থেকে। রিপোর্টারের নাম রফিকুল হায়দার। ভূটান থেকে ফিরে এসে ২০ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি: তারিখে তিনি লিখেন, সে দেশে কোন মসজিদ নেই গোপনে নামাজ পড়েন মুসলমানেরা![1]

তিনি এক মুসলিমের সাক্ষাৎকার এভাবে লিখেন,

'জানেন এই থিম্পুতে ৯টি গির্জা আছে। অথচ কোনো মসজিদ নেই। আমরা মুসলমানেরা তো কম নই। আপনি মিডিয়ার লোক। যদি পারেন ভুটানে মসজিদ নেই এ বিষয়ে কিছু একটা করেন। ক্ষোভের সাথে কথাগুলো বলছিলেন হাজী আবদুল কাদের।...

... থিম্পুস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন বলেন, 'এখানে প্রকাশ্যে নামাজ পড়া নিষেধ। বাংলাদেশ দূতাবাসে আমরা জুমার নামাজের ব্যবস্থা করলেও পরে ভুটান সরকারের নির্দেশে তা বন্ধ করতে হয়।

...ভুটানে প্রাণী জবাই করা নিষেধ। ফলে কোরবানি দেয়ার জন্য ভারতীয় মুসলমানেরা চলে যান তাদের দেশে।

...মূলত বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে স্থানীয় মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। তারা ভয়ে মুসলমান হিসেবে পরিচয়ও দিতে চান না। জানান ভারতীয় মুসলমান মুহাম্মদ হোসেন।

...বিশ্বের প্রায় সব দেশের রাজধানীতেই মসজিদ আছে। অথচ ব্যতিক্রম ভুটান। পুরো দেশের কোথাও নামাজের জায়গা নেই। কেন মসিজদ নির্মাণ করতে দেয়া হচ্ছে না। স্থানীয় ভুটানিদের মতে, মসজিদ নির্মাণ হলে তা হবে ইসলামের একটি সেন্টার। এতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভুটানিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে। এ আতঙ্কেই মসজিদ নির্মাণে বাধা দেয়া।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন নয়াদিগন্ত ২০ অথবা ২১ অক্টোবর ২০১৮খ্রি: পত্রিকার আন্তর্জাতিক পাতার এশিয়া অংশ।

---

[1] [http://www.dailynayadiganta.com/asia/358459]

মায়ানমারে মুসলিম নিধনের ইতিহাস :

মায়ানমার বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশ। মায়ানমারের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশ রোহিংগা এবং বাংলাদেশ, ভারত, চীন (ইয়ুন্নান প্রদেশ) এবং আরব ও পারস্য থেকে আগত মুসলিম অধিবাসী।

অতীত:

রাজা বায়িন্নাউং (১৫৫০-১৫৮৯) এর আমলে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধরা মুসলিমদের হত্যা করে। ১৫৫৯ সালে ব্যাগো দখলের পর বৌদ্ধ রাজা হালাল মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করে। ধর্মের নামে প্রাণীহত্যাকে বর্বোরচিত ঘোষণা করে তিনি ঈদ উল আযহা পালন নিষিদ্ধ করেন। তার প্রজাদেরকে তিনি জোরপূর্বক বৌদ্ধ ধর্মের বাণী শুনতে বাধ্য করতেন এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করতেন। ১৮ শতকে রাজা আলাউঙ্গাপায়া মুসলমানদের জন্য হালাল খাবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

বর্তমান:

১৯৬২ সালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে সেনাপতি নে উইন ক্ষমতায় গেলে মায়ানমারে মুসলমানদের অবস্থা করুণ হয়ে পড়ে। মুসলমানদেরকে সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়িত করা হয়।[১]

এবং সামাজিকভাবে বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। রোহিঙ্গারা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে পালিয়ে যেতে শুরু করে। ১৯৭৮ সালে আরাকানে কিং ড্রাগন অপারেশনের[২] সময় ২,০০,০০ এবং ১৯৯১ সালে ২,৫০,০০০[৩] রোহিংগা মুসলিম বাংলাদেশে শরনার্থী হিসেবে স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসে।

---

[১] [ঐধৎৎ চৎরবংঃষবু/জধহমড়ড়হ (জানুয়ারি ২০০৬)। "ঃযব ঙঁঃংরফবৎং"। রৎৎধধিফফু.ড়ৎম। ঃযব ওৎৎধধিফফু]

[২] ["ইঁৎসধং গঁংষরস জড়যরহমুধং-ঃযব ঘবা ইড়ধঃ চবড়ঢ়ষব. গধৎধিবহ গধপধহ-গধৎশধৎ ওচঝ." । ওড়ংহবাং.হবঃ]

[৩] [চবঃবৎ ঋড়ৎফ। "ডযু ফবধফষু ৎধপব ৎরড়ঃং পড়ঁষফ ৎধঃঃষব গুধহসধৎ'ং ভষবফমষরহম ৎবভড়ৎসং"। ঈংসড়হরঃড়ৎ.পড়স]

আর রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর হামলার চিত্র আপনার সামনেই রয়েছে। তাই আর আলোচনা করলাম না।শুধু সর্বশেষ নিধনের এক ঝলক হল," আগস্ট মাসে শুরু হওয়া অভিযানে ২৪ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করা হয়। ১ লাখ ১৪ হাজার মুসলমানকে নির্যাতন করা হয় এবং ১৫ হাজার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়।" [৪]

শ্রীলংকায় বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা :

আনন্দবাজার পত্রিকার আন্তর্জাতিক জার্ণালে প্রকাশিত একটি খবর। জঙ্গি হামলার জেরে, শ্রীলঙ্কায় নিষিদ্ধ বোরখা ও মুখঢাকা পোশাক। [৫]

গির্জা হামলার জের ধরে শ্রীলঙ্কায় মসজিদ ও মুসলমানদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর একের পর এক হামলা করা হয়। বিবিসির তথ্য মতে, "চারটি মসজিদ, ৩৭টি বাড়িঘর, ৪৬টি দোকান এবং ৩৫টি গাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়েছে।"

স্থানীয় একজন বলেন, "সবকিছু ভেঙে ফেলা হয়েছে, মুসলিমরা এখন সেখানে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছে,"। [৬]

শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধপ্রধানের কথা: মুসলিমদের যেখানে পাও পাথর মেরে হত্যা কর!

শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ধর্মগুরু এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মুসলিমদের পাথর মেরে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ডেইলি পাকিস্তানের বরাতে জানা যায়, শ্রীলঙ্কাতে ইস্টার সানডের হামলার পর থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ঘৃণাভিত্তিক বিবৃতি প্রকাশ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে চলছে।

---

[4] [https://www.jugantor.com/na:ional/83512]

[5] [https://www.anandabazar.com/international/sri-lanka-bombings-burqa-and-face-covering-garments-are-banned-dg:l-]

[6] [https://www.bbc.com/bengali/43299355]

শ্রীলঙ্কার বৃহত্তম বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রধান ধর্ম গুরু সম্প্রতি তার অনুসারীদের মুসলমানদের পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে।

শ্রীলঙ্কার জাতীয় টিভিতে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বৌদ্ধ ধর্ম গুরু সিরি ঘানা দারানানা থিও অভিযোগ করে বলেছে, কর্ণগালা জেলার একজন মুসলিম ডাক্তার চার হাজার বৌদ্ধ নারীকে নিজের বস করে ব্যবহার করেছে।

তারা খুব খারাপ, তাদেরকে যেখানে পাও পাথর মারো। আরো বলেছে, শ্রীলঙ্কার কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে মুসলিমদের চাকরি দেয়া উচিত না।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সিরি ঘানা শ্রীলংকার প্রাচীনতম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান। তার ভাষণের সময় সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপন করে। একটি মুসলিম রেস্তোরা সম্পর্কে বলেছে, যারা এ হোটেল থেকে খায়, তাদের বাচ্চারা কোনো দিন মানুষ হবে না।

তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিপক্ষে নানান কটূক্তি করেছে। এদিকে দেশটির কয়েকটি মানবাধীকার সংস্থা বৌদ্ধ চরমপন্থী দ্বারা মুসলমানদের সম্পত্তি জোড়দখল ও ক্ষতিগ্রস্ত করা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা ২ মিলিয়নেরও বেশি। যার মধ্যে ৭০ শতাংশ বৌদ্ধ। আর মাত্র ১০ শতাংশ মুসলমান। বৌদ্ধরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা করছে। তাদের নৃশংস হামলায় এ পর্যন্ত অনেক মুসলিম নিহত হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীলঙ্কায় আত্মঘাতী হামলার পরেও পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে শুরু করেছে, কিন্তু শ্রীলংকান সরকার কারফিউ প্রয়োগ করে পরিস্থিতিটি জোরদার করেও কোনো ভালো ফলাফল পাচ্ছে না বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।

সূত্রঃ বাসিরাত অনলাইন

বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের চিত্র ও আমাদের অধঃপতন

এ চিত্র অংকনের দায়িত্ব আপনার। ৫ মিনিট গভীর চিন্তা করুন। আশা করি আপনার বাংলাদেশের মুসলমানদের করুণ চিত্র আপনার চোখের সামনে

ফুটে উঠবে। যদি এতেও কোন চিত্র আপনার চোখের কোনে ভেসে না উঠে তাহলে গত পাঁচ দিনের কোন নির্ভরযোগ্য পত্রিকা দেখুন। তাও যদি সম্ভব না হয় হেফাযতে ইসলামের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির ঘটনা খেয়াল করার চেষ্টা করুন।

আর বাংলাদেশের মুসলিম চরিত্র অবনতি বুঝার জন্য নিচে ছোট্ট একটি চার্ট।

মালাউন কতৃক ফেলানী হত্যাঃ

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কুড়িগ্রামের অনন্তপুর-দিনহাটা সীমান্তের খিতাবেরকুঠি এলাকায় ০৭ জানুয়ারি ২০১১ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর সদস্যরা ফেলানী খাতুন (জন্ম:১৯৯৬ সাল) নামের এক কিশোরীকে গুলি করে হত্যা করে। বিএসএফ ১৮১ ব্যাটালিয়নের চৌধুরীহাট ক্যাম্পের জওয়ানদের এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়। ফেলানীর লাশ পাঁচ ঘণ্টা কাঁটাতারে ঝুলে ছিল। বিএসএফ নিজস্ব আদালতে এ ঘটনার জন্য দায়ী সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বাবার সঙ্গে ফেলানী নয়াদিল্লিতে গৃহকর্মীর কাজ করত। বিয়ের উদ্দেশে সে দেশে ফিরছিল।[১]

অখন্ড রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষে বাংলাদেশ বর্ডার হামলা ও হত্যা জরিপঃ

মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের রেকর্ড অনুযায়ী ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে গত ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১০৬৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যা করেছে বিএসএফ। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৬ বছরে বিএসএফ গুলি ও শারীরিক নির্যাতনে হত্যা করেছে ৪২ জন বাংলাদেশিকে। অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সীমান্তে ৩শ ১২ বার হামলা চালানো হয়। এতে ১২৪ জন বাংলাদেশী নিহত হয়। এর মধ্যে

---

[১] https://bn.wikipedia.org/wiki/ফেলানী হত্যা

১৯৯৬ সালে ১৩০টি হামলায় ১৩ জন নিহত, ১৯৯৭ সালে ৩৯টি ঘটনায় ১১ জন, ১৯৯৮ সালে ৫৬টি ঘটনায় ২৩ জন, ১৯৯৯ সালে ৪৩টি ঘটনায় ৩৩ জন, ২০০০ সালে ৪২টি ঘটনায় ৩৯ জন নিহত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনের হিসাব অনুসারে ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিএসএফ হত্যা করেছে ৩৫ জনকে। এ সময় বিএসএফ ২২ বাংলাদেশীকে গুলি ও নির্যাতন করে আহত করেছে আর অপহরণ করেছে ৫৮ জনকে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৭ দিনের ব্যাবধানে ভারতীয়রা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ৩ বাংলাদেশীকে জোর-জবরদস্তি অপহরণ করে নিয়ে গেছে।[১], [২], [৩]

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৩ সালে মোট ২৭ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ সদস্যরা। ২০১৪ সালে হত্যা করা হয়েছে ৩৩ জন বাংলাদেশীকে। আহত হয়েছেন ৬৮ জন। এছাড়া বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে ৫৯ জনকে। তিন বছরে সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যায় ২০১৫ সাল শীর্ষে অবস্থান করছে। ২০১৫ সালে বিএসএফ হত্যা করেছে ৪৫জন বাংলাদেশিকে।[৪]

১৯৯৬ - বর্তমান

১৯৯৬ সালে ১৩০টি হামলায় ১৩ জন নিহত।

[সাপ্তাহিক ২০০০: প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ১৩ জানুয়ারি ২০১১]

১৯৯৭ সালে ৩৯টি ঘটনায় ১১ জন।

১৯৯৮ সালে ৫৬টি ঘটনায় ২৩ জন।

---

১. ["India: New Killings, torture at Bangladeshi Border"| হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ। নিউ ইয়র্ক: হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ।

২. "India's shoo:-to-kill policy on the Bangladesh border"| the Guardian| London|

৩. ডয়েচে ভেলে, বিবিসি, দৈনিক ইনকিলাব

৪. ["বিজিবির প্রতিবেদন সীমান্তে হত্যা বাড়ছে- দৈনিক সমকাল"।]

১৯৯৯ সালে ৪৩টি ঘটনায় ৩৩ জন।

২০০০ সালে ৪২টি ঘটনায় ৩৯ জন নিহত হয়।

২০০১ সালে ৯৪ জন নিহত হন।

২০০২ সালে ১০৫ জন নিহত হন।

২০০৩ সালে ৪৩ জন নিহত হন।

২০০৫ সালে ১০৪ জন নিহত হন।

২০০৬ সালে ১৪৬ জন নিহত হন।

২০০৭ সালে ১২০ জন নিহত হন।

২০০৮ সালে ৬২ জন নিহত হন।

২০০৯ সালে ৯৬ জন নিহত হন।

২০১০ সালে বিএসএফ ৭৪ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করে।

[সীমান্ত হত্যা এবং বন্ধুরাষ্ট্রের সংজ্ঞা- দৈনিক ইনকিলাব]

২০১১ সালে হত্যার শিকার হন ৩১ জন।

২০১২ সালে হত্যার শিকার হন ৩৮ জন।

২০১৩ সালে হত্যার শিকার হন ২৯ জন।

২০১৪ সালে হত্যা করা হয়েছে ৩৩ জনকে।

২০১৫ সালে বিএসএফ হত্যা করেছে ৪৫ জনকে।[৫]

সিলেটের আবদুর রহমান

সিলেটে কাজলশাহ এলাকায় ইসকনের গান বাজনার ব্যক্তি সৃষ্টি সহিংসতা বিরুদ্ধে তিনি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। স্ট্যাটাস দেয়ার মাত্র ৫ দিনের মাথায় তাকে খুন হতে হলো। স্ট্যাটাসে আব্দুর রহমান যা লিখেছিলেন তা পাঠকের জ্ঞাতার্থে হুবুহু তুলে ধরা হলো:- হজরত শাহ জালাল রহ: -এর উত্তসূরীদের রক্তে কি জমাট বেধে গেছে?

---

৫. ["বিজিবির প্রতিবেদন সীমান্তে হত্যা বাড়ছে- দৈনিক সমকাল"।]

Abdur Rahman

Like Comment Share

গতকাল জুময়া'র নামাজের সময় সিলেটে নগরীর মধুশহীদ জামে মসজিদের অদূরে ইসকন মন্দিরে গান-বাজনা চলছিল। কয়েকজন মুসল্লি সরাসরি ইসকনদের কাছে গিয়ে অন্তত নামাজের সময় মাইক বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। উগ্র হিন্দুরা তাতে কর্ণপাত না করে গানবাজনা চালিয়ে যায় এবং মুসল্লিদের সাথে বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন একপর্যায়ে তারা মসজিদের দিকে ঢিল ছুড়ে। এতে মুসল্লিরা ক্ষুব্ধ হয়ে নামাজের পর প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। সংঘর্ষ এড়াতে পুলিশ তাৎক্ষনিকভাবে ঘটনাস্তলে ছুটে আসে। পুলিশের গুলিতে সাবেক মহিলা কমিশনার ও পথচারীসহ আহত হন ৫ জন। পুলিশের একমুখী ভূমিকায় ২০ জন মুসলমান আহত হন। গ্রেফতার হন আরোও ১৫ জন। অপরদিকে আহত হন শুধু একজন হিন্দু।'[১]

প্রিয়া সাহাঃ

অনুযায়ী গত ১৭ই জুলাই হোয়াইট হাউসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ২৭ জন ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হওয়া ব্যক্তির সাথে কথা বলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্প।

---

[১] [যঃঃঢ়ং://ািি.হবড়ফবংযনধৎঃধ.পড়স/২০১৬/০৯/ঘ১০১৮.যঃসষ]

এরা সবাই ওয়াশিংটন গত ১৬ থেকে ১৮ই জুলাই পর্যন্ত মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে আয়োজনে অনুষ্ঠিত একটি ইভেন্টে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন যার নাম ছিল 'সেকেন্ড মিনিস্টারিয়াল টু এ্যাডভান্স রিলিজিয়াস ফ্রিডম'।

সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এতে পাঁচ জন বাংলাদেশী এবং দু'জন রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীর একটি প্রতিনিধিদল পাঠায় যার একজন ছিলেন প্রিয়া সাহা।

তিনি অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে থেকে তার ভাষায় ৩৭মিলিয়ন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নিখোঁজ হয়েছে, তার নিজের বাড়িঘরও আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু এর কোন বিচার হয়নি। মি. ট্রাম্পকে অনুরোধ করেন তিনি যেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সাহায্য করেন যাতে তারা দেশে থাকতে পারে।[২]

ইসকনের চিঠি, বাংলাদেশ ও 'র'

বিজেপির হুমকি দুই কোটি মুসলমানকে বিতাড়িত করবো। এবং বাংলাদেশকে অঙ্গরাজ্যে বানাবো।[3]

বাংলাদেশ বিরোধী কাজ করছে অনেক হিন্দু সংগঠন। তারমধ্য বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি। প্রণব মঠ ও সেবাশ্রম। ভারত সেবাশ্রম সংঘ। বাংলাদেশ চৈতন্য সাংস্কৃতিক সংঘ। হিন্দু -বৌদ্ধ -খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির একটি পত্রিকা রয়েছে যার নাম "সমাজ দর্পন" এই পত্রিকার কাজ করা হয় কলকাতায়। কারণ "সমাজ দর্পনে " যে সব দেবদেবীর ছবি দেয়া হয় বাংলাদেশে তা পাওয়া দুস্পাপ্য। প্রত্যেকটি সংঘ ধর্মের আড়ালে কাজ করছে অসাম্প্রদায়িক দেশ করার জন্য। যাদের লেজ ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর হাতে।

---

[2] [h::ps://www.bbc.com/bengali/news-49057023]

[৩] সূত্রঃ বাংলাদেশে 'র' পৃষ্ঠা:১৮৪

ভারত সেবাশ্রম সংঘ এর প্রধান শ্রী বিজয়া নন্দজী বনগাঁয় বঙ্গভুমিওয়ালাদের এক সমাবেশে স্পষ্ট বর্ণনা করেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারত সরকার বারবার আওয়ামীলীগকে তাগিদ দিচ্ছে। এবং আওয়ামীলীগকে সর্ব সহায়তার আশ্বাস ও দিচ্ছে। এ নির্দেশ প্রধান করেন ইন্দিরা গান্ধী নিজেই।[1]

"বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধান আবু রুশদ লিখেনঃ

"'ইসকন নামে একটি সংগঠন বাংলাদেশে কাজ করছে। এর সদর দফতর নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। মূলতঃ এটা ইহুদীদের একটি সংগঠন বলে জানা গেছে। এই সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানিমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি।"[2]

ইসকন হিন্দুদের সংঘ হলেও তার সৃষ্টি ভারতে হয়নি। ইসকন জন্ম নেয় ১৯৬৬ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে। প্রতিষ্ঠাতা 'অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ'।

এই ব্যক্তিটি ভারতের হিন্দুপাড়ার কোন বিদ্যালয়ে লিখা পড়া করেনি। পড়েছেন বিলেতে। লেখাপড়া করেছে খ্রিস্টানদের চার্চে। পেশায় সে ছিলো ফার্মাসিউটিকাল।

কেন হঠাৎ তার মাথায় হিন্দু ধর্মের নতুন সংস্করণের ভূত চাপলো, কিংবা কোন শিক্ষাবলে চাপলো তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। যখন ইসকন সনাতন হিন্দুদের থেকে প্রত্যাখ্যাত হলো। প্রভুপাদের পাশে দাঁড়ায়, জে. স্টিলসন জুডা, হারভে কক্স, ল্যারি শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মত চিহ্নিত ইহুদী-খ্রিস্টান এজেন্টরা।

---

১. সুত্র : বাংলাদেশে 'র' পৃষ্ঠা:১৭০

২ সুত্রঃ বাংলাদেশে 'র' পৃষ্ঠা:১৭১

ইসকনের মূল চেতনা। মৌলিক শ্লোগান।

"নির্যবন করো আজি সকল ভুবন"। যার অর্থ, সারা পৃথিবীকে (যবন) মানে মুসলমান মুক্ত করো।

স্বাভাবিকভাবে ইসকনের কর্মকাণ্ড শুধু নাচ মনে হলেও আদৌ তা নয়। ইসকনের কয়েকটি কাজ নিম্নরূপ-

বাংলাদেশে সনাতন মন্দিরগুলো দখল করা।

বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে সাম্প্রদায়িক হামলা করা। কিছুদিন আগে ঢাকাস্থ স্বামীবাগে মসজিদের তারাবীর নামাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো ইসকন। সিলেট নগরীর কাজল শাহ এলাকার মধু শহীদ জামে মসজিদ এর পাশেই ইসকন মন্দির। জুম্মার দিনে অযাচিত হামলা চালায় মসজিদে।

গত কয়েকদিন আগে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় মসজিদে আগুন দেয় ইসকন সন্ত্রাসীরা।

উগ্রহিন্দুত্ববাদের বিস্তৃতি

যেমন- জাতীয় হিন্দু মহাজোট, জাগো হিন্দু, বেদান্ত, ইত্যাদি।

বাংলাদেশে সম্প্রতিক সময়ে চাকুরীতে প্রচুর হিন্দু প্রবেশের অন্যতম কারণ-ইসকন হিন্দুদের প্রবেশ করানোর জন্য প্রচুর ইনভেস্ট করে।

(গোপন চিঠিতে প্রাপ্ত তথ্যও তাই বলছে)

সিলেটে রাগীব রাবেয়া মেডিকলে কলেজের ইস্যুর পেছনে রয়েছে ইসকন। ইসকন আড়াল থেকে পুরো ঘটনা পরিচালনা করে এবং পঙ্কজগুপ্তকে ফের লেলিয়ে দেয়। এখন পঙ্কজগুপ্ত জমি পাওয়ার পর সেই জমি নিজেদের দখলে নিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিচারবিভাগে ইসকনের প্রভাব মারাত্মক বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ খোদ সাবেক প্রধানবিচারপতিও একজন ইসকন সদস্য।

একুশে টেলিভিশনের সাবেক সাংবাদিক ইলিয়াস হুসেন **ইসকনের একটি গোপন চিঠির সন্ধান পান।**

চিঠিতে অনেকটা এরকম লেখা ছিলো, *"মায়ের কৃপা নিয়ে তুমি জীবন যাপন করো। তোমাকে উন্নত চাকরির আসনে সমাসীন করা হবে। বিনিময়ে কাজ করতে হবে মায়ের জন্য। সনাতন হিন্দুরা আমাদের ভাই। আমাদের দেহ, আত্মা ভিন্ন, কিন্তু টার্গেট এক। এই চিঠির চুক্তিপত্র কোন মুসলমানকে জানানো যাবেনা। মুসলিমরাই আমাদের চিরশত্রু। তাদের জন্য আমাদের ধর্ম আজ বিলুপ্ত। আমরা ভগবানের কথা বলে মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করবো। বিপরীতে কেহ থাকলে আমরা কঠোর হবো। তাকে নির্যাতন করে সরিয়ে দিবো।"*

বাংলাদেশে ইসকনের কর্মকাণ্ডে সহায়তা করছে ভারত। বাংলাদেশে ইসকনের কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে ভারত সরকার সহায়তা করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা।

হাইকমিশনের ভাষ্যমতে ভারত সরকার বাংলাদেশে দু'টি ইসকন সেন্টারে উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। একটি ইসকন সাভার। অপরটি একটি বৃদ্ধাশ্রম ও অনাথাশ্রম নির্মাণে ৫ দশমিক ৫৪ কোটি টাকা অর্থায়ন করছে। সিলেটে একটি পাঁচ তলাবিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণে দিচ্ছে ৭ দশমিক ৪ কোটি টাকা।[1]

ভারতের সীমানার পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভাগগুলোর মধ্যে রয়েছে ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহি, রংপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রাম।

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র' তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলগুলোতে শক্তি অর্জন করছে ইসকন।

---

১. সুত্রঃ আমাদের সময় ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

সিলেটে তাদের আস্তানা নিম্নোক্তঃ

১। শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির
যুগলটিলা, কাজলশাহ্, সিলেট।

২। কালাচাঁদ গোপাল-জিউ ইসকন মন্দির
কাজীর পয়েন্ট, সুনামগঞ্জ।

৩। শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির
পাথারিয়া, সুনামগঞ্জ।

৪। শ্রীশ্রী রাধা মদন গোপালজিউ মন্দির
পণতীর্থ, গড়কাঠি, তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ।

৫। রঙ্গীরকুল বিদ্যাশ্রম (ইসকন)
ডাক: রঙ্গীরকুল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

৬। শ্রী নৃসিংহ মন্দির
বগলা বাজার, হবিগঞ্জ।

৭। শ্রী গৌর নিতাই জিউ মন্দির
সৈয়ারপুর, মৌলভীবাজার।

চট্রগ্রাম বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আরেকটি সীমান্ত। সেখানেও শক্তিশালী অবস্থান করছে ইসকন।চট্রগ্রামে রয়েছে ধর্মীয় প্রভাব। রয়েছে কওমি মাদ্রাসার এক বিশাল অংশ। সেই প্রভাবের প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়াচ্ছে ইসকন।

চট্রগ্রামে ইসকনের আস্তানা নিম্নোক্তঃ

১। শ্রীশ্রী পুণ্ডরীক ধাম
গ্রাম: মেখল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দির
ডাক: মেডিকেল, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

২। শ্রীশ্রী

নন্দনকানন ১নং গলি, চট্টগ্রাম।

৩। শ্রীশ্রী রাধা-গোবিন্দ মন্দির

সেন্ট্রাল মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

গোলাপ সিং লেইন, নন্দনকানন ২নং গলি, চট্টগ্রাম।

৪। শ্রীশ্রী রাধা গিরিধারী মন্দির

নতুন ব্রিজ সংলগ্ন, কালাঘাটা, বান্দরবান পার্বত্য

৫। শ্রীশ্রী রাধা দামোদর মন্দির

কৃষ্ণানন্দ ধাম রোড, ঘোনারপাড়া, কক্সবাজার।

৬। শ্রীশ্রী রাধা রাসবিহারী মন্দির

বনরূপা, হ্যাপির মোড়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

৭। শ্রীশ্রী রাধা বঙ্কুবিহারী মন্দির

আদালত সড়ক, খাগড়াছড়ি বাজার, খাগড়াছড়ি।

৮। শ্রীশ্রী রাধা বংশীধারী মন্দির

দ. সহদেবপুর, ফেনী।

৯। শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ গৌর-নিতাই মন্দির

গ্রাম: নরোত্তমপুর, ডাক: পণ্ডিতবাজার, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

১০। শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির

এনাম নাহার মোড়, সন্দীপ।

১১। শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ জিউ মন্দির

উচ্চাঙ্গ, বাকিলা, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

১২। শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির

জগন্নাথপুর, কুমিল্লা।

১৩। শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির (নামহট্ট)

মধ্যপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সীমান্ত রয়েছে বেনাপোল।

ইন্ডিয়া এই সীমান্তকে বানিজ্যিক বর্ডার হিসাবে আখ্যায়িত করে। সেই খুলনা বিভাগেও তৈরি করছে শক্তিশালী আস্তানা।

১। শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির

জেলখানার চর, ময়মনসিংহ।

২। শ্রীশ্রী নৃসিংহ জিউ মন্দির (ইসকন)

গৃদ্দা নারায়ণ, শেরপুর সদর-২১০০

৩। শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির

গাড়া সাতপাই নেত্রকোনা।

৪। শ্রীশ্রী রূপ সনাতন স্মৃতি তীর্থ (ইসকন)

ডাক: মাগুরাহাট, থানা: অভয়নগর

গ্রাম: রামসরা, যশোর।

৫। শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির

গল্লামারি, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।

৬। শ্রীশ্রী গৌর-নিতাই মন্দির

কাটাখালি বাজার, পাকিজা, যশোর।

৭। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির

ফকরাবাদ, বড়দল, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

৮। শ্রীশ্রী রাধা শ্যাম সুন্দর মন্দির

আরোয়াপাড়া, কুষ্টিয়া।

৯। শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির

মাঝিয়ারা, তালা, সাতক্ষীরা।

রংপুর সীমান্ত জুড়ে ও তৈরি হচ্ছে তাদের দুর্গ।

১। শ্রীশ্রী রাধামদনমোহন মন্দির

ডাক+থানা: তারাগঞ্জ, রংপুর।

২। শ্রীশ্রী জগন্নাথ নামহট্ট মন্দির

পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া, কুড়িগ্রাম।

৩। শ্রীশ্রী রাধা গোপীনাথ মন্দির

গোপালপুর আশ্রম, ডাক: গড়েয়া, ঠাকুরগাঁও।

৪। শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির ও ভক্তিবেদান্ত সংস্কৃত কলেজ

গড়েয়া, গোপালপুর, ডাক: গড়েয়া, ঠাকুরগাঁও।

৫। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির

কাহারুল, দিনাজপুর।

৬। শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির (ইসকন)

দহসী, জয়ানন্দহাট, দিনাজপুর।

৭। শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির

সেতাবগঞ্জ, নামহট্ট সংঘ (আশ্রম), বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।

৮। শ্রীশ্রী রাধা-গিরিধারী জিউ মন্দির

বানিয়ার দিঘী, লালমনির হাট।

রাজশাহী সীমান্ত ও বরিশালে ছেয়ে গেছে ইসকন। (বিস্তারিত দিচ্ছি যাতে স্থান ট্রাকিং করে লোন উল্ফ এটাক চালানো যায়।)

১। আনন্দ আশ্রম

সেউজগাড়ী, পালপাড়া, বগুড়া।

২। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির

বগুড়া।

৩। শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির

রেশমপট্টি ঘোড়ামারা রাজশাহী।

৪। শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ জিউ মন্দির

উত্তর সাহা পাড়া সেরপুর, বগুড়া।

৫। শ্রীশ্রী রাধা শ্যামসুন্দর মন্দির

শংকর মঠ, বি.এম. কলেজ রোড, বরিশাল।

৬। ইসকন মন্দির

রায়েরকাঠি, পিরোজপুর- ৮৫০০

৭। পটুয়াখালী ইসকন বৈদিক মন্দির

জুবিলী স্কুল রোড, পটুয়াখালী।

৮। শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির

কিশোরগঞ্জ

৯। শ্রীশ্রী রাধা -শ্যামসুন্দর মন্দির

কর্মকার পাড়া পুরাতন সাতক্ষীরা

১০। শ্রী গৌর নিতাই নামহট্র মন্দির

দেওয়ানপুর জোরারগঞ্জ চট্রগ্রাম।

১১। শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির কুমাই গাড়ী।

শিবপুর।

এছাড়াও ঢাকা বিভাগেও বহুমুখী গ্রাস নিয়ে এগোচ্ছে ভারতের সন্ত্রাসী সংগঠন ইসকন।

১। ইসকন স্বামীবাগ আশ্রম

৭৯, ৭৯/১ স্বামীবাগ রোড, স্বামীবাগ, ঢাকা-১১০০

২। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির

৫ নং চন্দ্র বসাক স্ট্রিট, ওয়ারী (বনগ্রাম), ঢাকা-১২০৩

৩। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির

সাবালিয়া, মধ্যপাড়া, টাঙ্গাইল।

৪। শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির

বৌয়াপুর (নদীর পাড়), নরসিংদী।

৫। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির

শোভারামপুর, ফরিদপুর।

৬। শ্রীশ্রী রাধাকান্ত মন্দির

২২২ লাল মোহন সাহা স্ট্রীট, দক্ষিণ মৈশন্ডী, ঢাকা।

৭। শ্রীশ্রী কানাইলাল জিউ মন্দির

কাতালপুর, সাভার, ঢাকা।

৮। শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির (নামহট্ট)

ইসকন মন্দির রোড, পাচুরিয়া, গোপালগঞ্জ।

৯।ইসকন হরেকৃষ্ণ নামহট্ট কেন্দ্রীয় কার্যালয়

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দির, ৩৫, তনু গছুলেইন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১৮০

১০। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির

দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।

১১। শ্রীশ্রী রাধা গোপীনাথ মন্দির

বিবেকানন্দ পল্লী, লৌকর রোড, বিনোদপুর, রাজবাড়ী।

১২। শ্রীশ্রী রাধা গিরিধারী মন্দির

ধনবান স্কুল সংলগ্ন, মাদারীপুর সদর।

এছাড়াও আরো শত শত সনাতন মন্দির তাদের দখলে আছে।

বাংলাদেশের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছে, সন্ত্রাসী সংগঠন ইসকন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে ভারত থেকে আসবে সৈন্য। একটি দাঙ্গা হবে। যে দাঙ্গায় মৃত্যু বরণ করবে শত মুসলিম, হিন্দুদের পক্ষে দাঁড়াবে ভারতের সৈন্য। সাথে থাকবে ভারতের র'। বাংলাদেশের সৈন্যদল থাকবে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে কেহ কেহ মুসলমানদের পক্ষে থাকবে।

ইসকনের একজন বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে আবার ত্রাস সৃষ্টি হবে বাংলাদেশে। তখন তারা নামে থাকবে স্বাধীন। কিন্তু কর্মে থাকবে আমাদের সেবাদাস হয়ে।

ইসকন কি?

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা মৃত সংঘ তথা ইসকন ১১ জুলাই থেকে নগরীর প্রায় ৩০টি স্কুলের শিক্ষার্থীর মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।ফুড ফর লাইফ কর্মসূচির আওতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের রথযাত্রা উপলক্ষে চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের মাঝে হিন্দুত্ববাদের শ্লোগান দিয়ে কৃষ্ণ প্রসাদ বিতরণ করে। ইসকন কর্মীদের শেখানো মতে, কোমলমতি শিক্ষার্থীরা হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন্ত্র পাঠ করে এ প্রসাদ গ্রহণ করে। শ্লোক-মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে মুসলিমসহ বিভিন্ন ধর্মের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রসাদ গ্রহণে উৎসাহিত করায় অনেক শিক্ষার্থী তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

আল্লামা বাবুনগরী বলেন, আজ তারা আমাদের শিশুদেরকে প্রসাদের লোভে ফেলে হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলিয়েছে, কাল ভারতের মতো জোরপূর্বকজয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করবে না, এর কি নিশ্চয়তা আছে? [১]

এটাকি কোন ধ্বংসের সংবাদ নয়। এটাকি কোন নির্যাতন শুরু হওয়ার পূর্ভাবাস নয়।

---

[1] [https://bit.ly/2M32xJx, htps://www.jugantor.com/country-news/200399/]

আবরার ফাহাদ

আবরার হত্যার মূলচক্রী অমিত সাহা উগ্রবাদী ইসকনের সদস্য
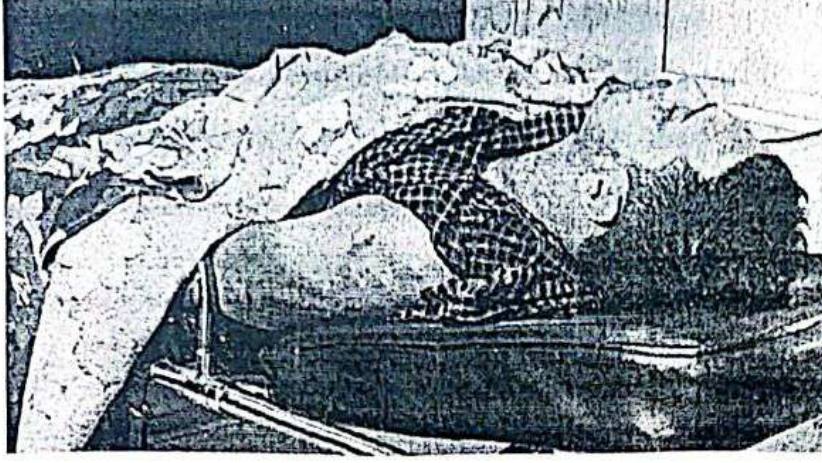
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকায় ছাত্রলীগ নেতা অমিত সাহাসহ আরো তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় সবুজবাগ থানার রাজারবাগ কালীবাড়ী এলাকার এক আত্মীয়ের বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ অমিত সাহাকে গ্রেফতার করে। অমিত সাহা উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠন ইসকনের সদস্য বলে জানা গেছে। [১]

ভোলার বুরহানুদ্দিনে...

ফেসবুকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিবি ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহাকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশকে কেন্দ্র করে ভোলার বোরহানউদ্দিনে সাধারণ তৌহীদি জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষে কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীসহ চার মুসল্লী নিহত হয়েছে। এঘটনায় পুলিশ সদস্য, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীসহ প্রায় দুই শতাধিক মুসল্লী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ভোলা সদর হাসপাতালে ৫৩ জন, বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেলে গুরুতর আহত প্রায় ৫৭ জন ও বাকীদের বোরহানউদ্দিন

---

1 [http://www.dailynayadiganta.com/crime/447245/]

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বরিবার সকাল ১০টার দিকে বোরহানউদ্দিন উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গত শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকের ম্যাসেঞ্জারে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিবি ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহাকে নিয়ে বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ২নং ওয়ার্ডের চন্দ্র মোহন বৈদ্দের ছেলে বিপ্লব চন্দ্র শুভ তার ফেসবুক বন্ধুদের কাছে কুরুচিপূর্ণ ম্যাসেজ পাঠায়। এ নিয়ে রবিবার বেলা ১১টার দিকে বোরহানউদ্দিন ঈদগাহ মাঠে সর্বস্তরের তৌহীদি জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিলে আয়োজন করা হয়।[২]

আমাদের পারলে ঠেকা...![৩]

---

[২] [যঃঃঢ়ং://িি.ফধরষুরহয়রষধন.পড়স/ধৎঃরপষব/২৪২৩৬৮/]

[৩] যঃঃঢ়ং://িি.ভধপবনড়ড়শ.পড়স/১০০০২৭২৬০৯৪০৮৪৭/ারফবড়ং/৪১২২১৭৭০৩০৩০২৫৮/

ইসকনের গুরু: প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজউক থেকে বত্রিশ কাঠা জায়গা দিয়েছে মাত্র এক লক্ষ টাকায়।

ভিডিও লিংক:

https://qrgo.page.link/ebKLh

হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন
ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অপরাধনামা

গত কয়েক বছরে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বারবার আগ্রাসন চালিয়েছে বাংলাদেশের হিন্দুরা। সীমালঙ্ঘন করেছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে।

- হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের উপর চড়াও হয়েছে পুলিশ।

- মিডিয়া হিন্দুদের অপরাধ ধামাচাপা দিয়েছে।

- সরকার পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে মুসলিমদের উপর আক্রমন করার।

- এবং আইডি হ্যাকের মতো হাস্যকর অজুহাত দিয়ে হিন্দুদের বাঁচানো হয়েছে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আগ্রাসনের সময়, বরাবরই তাগুত হাসিনার সরকার এবং তার আজ্ঞাবহ পুলিশ ও প্রশাসন অবস্থান নিয়েছে হিন্দুদের পক্ষে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মিডিয়াও অবস্থান নিয়েছে হিন্দুদের পক্ষে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কথিত সুশীল সমাজ অংশ নিয়েছে হিন্দুদের পক্ষে। আর এতে করে আরো উদ্ধত, আরো আগ্রাসী হয়েছে হিন্দুরা।

আগামী দিনগুলোতে এমন ঘটনা আরো বৃদ্ধি পাবে। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে বাংলাদেশের মুসলিমদের আগে বুঝতে হবে -

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের সময় হাসিনা, পুলিশ, প্রশাসন, মিডিয়া-এরা কেউ আপনার পাশে দাঁড়াবে না। বরং তারাই আপনার বুকে প্রথম গুলি চালাবে।

এই অপরাধের বিচার অন্য কেউ করবে না। এই অপরাধ রুখতে হলে বাংলার মুসলিমকে উঠে দাঁড়াতে হবে।

ডাউনলোড লিংক:

HQ (266MB)

https://files.fm/u/ujtyg9xf

https://archive.org/details/hinduttobader_agrason_HQ

https://www.mediafire.com/file/cf22r...rason.mp4/file

MQ (143MB)

https://archive.org/details/hinduttobader_agrason_MQ

https://www.mediafire.com/file/dr8dt...on_MQ.m4v/fil
e

LQ- 480p(66MB)

https://archive.org/details/hinduttobader_agrason_LQ

ভারতে মুসলিম নিধন প্রকল্প: [১]

১. ১৯৪৮ সালে ভারতের হিন্দুরা হায়দারাবাদে ৪০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে।

২. ১৯৬১-এর অক্টোবরে আলিগড়ে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

[1] [https://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_Muslims_in_India]

৩. ১৯৬২-তে মধ্য প্রদেশের জাবালপুরে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

৪. ১৯৬৪-তে কলকাতায় মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।[২]

৫. ১৯৬৭-তে বিহারের রানচিতে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

৬. ১৯৬৯-তে গুজরাটের আহমেদাবাদে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

৭. ১৯৭০-এ মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্দি, জালগন ও মালাদে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

৮. ১৯৭১-এ বিহারে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা লাগে।

৯. ১৯৭৮-এ আলিগড়ে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

১০. ১৯৭৮-৮০ পর্যন্ত বিহারের জামশেদপুর ও উত্তর প্রদেশের ভানারসিতে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

১১. ১৯৮০-তে উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

১২. ১৯৮১-তে আলিগড়ের মিনাকশিপুরাম ও বিহারাশরীফে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

১৩. ১৯৮২-তে উত্তর প্রদেশে মিরাটে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

১৪. ১৯৮৩-তে আসামে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা বাঁধে।

১৫. ১৯৮৪-তে দেল্লি মুসলিম নিধনে দাঙ্গা শুরু হয় এবং ১৯৯৫- তে গুজরাট মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

১৬. ১৯৮৬ তে বিহারে নেওয়াদাতে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

১৭. ১৯৮৭-তে হাশিমপুর গণহত্যা।

১৮. ১৯৮৯-তে বিহারের ভাগলপুরে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

১৯. ১৯৯০-৯১-এ আলিগড়ে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

---

[2] ["1964: Riots in Calcutta leave morethan 100 dead". news.bbc.co.uk. British Broadcasting Corporation. Retrieved 7 July 2015.]

২০. ১৯৯২-৯৩-এ মুম্বাই, সুরাট, আহমেদাবাদ, কানপুর, দিল্লিসহ সমগ্র ভারতে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

২১. ১৯৯৭-এ তামিলনাড়ুতে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

২২. ২০০০-এ আহমেদাবাদসহ বেশ কয়েক এলাকায় মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

২৩. ২০০১-এ কানপুর, মালিগাও তে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

২৪. ২০০২-এ গুজরাটে মুসলিম নিধনে দাঙ্গা হয়।

২৫. ২০০৩-এ মুসলিম নিধনে ৭১১টি দাঙ্গা হয়।

২৬. ২০০৪-এ মুসলিম নিধনে ৬৭৭টি দাঙ্গা হয়।

২৭. ২০০৫-এ মুসলিম নিধনে ৭৭৯ টি দাঙ্গা হয়।

২৮. ২০০৬-এ গোয়া ও ভাদোদ্রা (গুজরাট) দাঙ্গাসহ মুসলিম নিধনে ৬৯৮টি দাঙ্গা হয়।

২৯. ২০১৩-তে মুজাফফরনগর দাঙ্গা।

৩০. ২০১৪ -তে আসাম সহিংসতা।

চলমান কাশ্মীর ধর্ষণ ও মুসলমানঃ

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৯৪ হাজার ২৯০ জন কাশ্মীরীকে হত্যা করেছে। -এর মধ্যে ৭ হাজার ৩৮ জনকে কারাগারে হত্যা করা হয়। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের এক রিসার্স রিপোর্টে বলা হয়, এই হত্যা করার ফলে ২২ হাজার ৮০৬ নারী বিধবা হয়েছেন এবং ১ লাখ ৭ হাজার ৫৪৫ শিশু এতিম হয়েছে। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়, ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা ১০ হাজার ১৬৭ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয় এবং ১ লাখ ৬ হাজার ৫০টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়। রিপোর্ট আরো জানায়, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং পুলিশের অভিযানে প্রায় ৮ হাজার মানুষ গুমের শিকার হয়। [১]

সূত্রঃ এনডিটিভি, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, আলজাজিরা

[1] [https://www.dailyinqilab.com/article/13664]

প্রিয় বোন আসিফাঃ

কাশ্মীরের কাঠুয়া অঞ্চলের যাযাবর মুসলিম বাকারওয়াল গোষ্ঠীর মেয়ে ছিলো ৮ বছরের ছোট্ট আসিফা। কাঠুয়ার উপত্যকায় ঘোড়া চড়ানোর সময় অপহরণ করা হয় তাকে। মন্দিরে আটকে রেখে তিন দিন ধরে একদল হিন্দু পুরুষ ধর্ষণ করে তাকে। পরে মাথায় পাথর মেরে ও গলা টিপে হত্যা করা হয় আসিফাকে। [২]

ধর্ষণের বিস্তারিত রিপোর্টঃ

ভারতীয় বাহিনী ১৯৯০ সালের ২৬ জুন বিএসএফ সদস্যরা জামির কাদিমের একটি এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় ২৪ বছর বয়সী একজন তরুণীকে গণধর্ষণ করে। সে বছর জুলাইয়ে সোপোরের পুলিশ থানায় বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। [৩]

১৯৯০ সালের ৭ মার্চ সিআরপিএফ শ্রীনগরের ছানপোরা এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে হানা দেয়। এসময় বেশ কয়েকজন মহিলা ধর্ষণের শিকার হন। ১৯৯০ সালের ১২ থেকে ১৬ মার্চ 'কমিটি ফর ইনিশিয়েটিভ ইন কাশ্মীর'-এর সদস্যরা কাশ্মীর সফর করেন এবং ধর্ষিতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ধর্ষিতাদের মধ্যে ২৪ বছর বয়সী নূরা বিবরণে জানান যে, নূরা ও তাঁর ননদ জাইনাকে তাঁদের রান্নাঘর থেকে সিআরপিএফের ২০ জন সদস্য টেনে-হিঁচড়ে বের করে এবং তারপর তাঁদেরকে গণধর্ষণ করে। তাঁরা অন্য দু'জন কিশোরীকে ধর্ষিত হতে দেখেছেন বলেও বর্ণনা করেন। [৪]

১৯৯১ সালে শ্রীনগরের বাবর শাহ এলাকায় ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষীরা একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত বৃদ্ধা মহিলাকে ধর্ষণ করে। [৫]

---

[2] [https://somoynews.tv/pages/details/109463]

[3] [Kazi, Seema. "Rape, Impunity and Justice in Kashmir." Socio-Legal Rev. 10 (2014): 21-23.]

[4] [CHAPtER-V PROBLEM OF HUMAN RIGHtS IN JAMMU AND KASHMIR (PDF)| c,,ôv 224|]

[5] [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]

১৯৯১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কুনান পোষ্পোরা গ্রামে একটি তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় তারা গ্রামটির বিভিন্ন বয়সের শতাধিক নারীকে গণধর্ষণ করে।

১৯৯১ সালের ২০ আগস্ট ভারতীয় সৈন্যরা কুনান পোষ্পোরা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের পাজিপোরা-বাল্লিপোরা গ্রামের ১৫ জনেরও বেশি নারীকে গণধর্ষণ করে। [১]

১৯৯২ সালের ১০ অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২২তম গ্রেনেডিয়াস্রের একদল সৈন্য কাশ্মীরের চক সাইদপোরা গ্রামে প্রবেশ করে এবং ৯ জন নারীকে গণধর্ষণ করে। ধর্ষিতাদের মধ্যে ছিলেন ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা এবং ১১ বছর বয়সী এক বালিকা। [২]

১৯৯২ সালের ২০ জুলাই কাশ্মীরের হারান এলাকায় একটি সেনা অভিযানের সময় বেশ কয়েকজন মহিলা ধর্ষিত হন। এশিয়া ওয়াচ এবং পিএইচআর কয়েকজন ধর্ষিতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। ধর্ষিতাদের একজনকে দুই জন সৈন্য পালাক্রমে ধর্ষণ করেছিল। আরেকজন ধর্ষিতাকে একজন শিখ সৈন্য ধর্ষণ করেছিল।[৩]

১৯৯২ সালের ১ অক্টোবর বিএসএফ সদস্যরা কাশ্মীরের বাখিকার গ্রামে ১০ জন লোককে হত্যা করে এবং -এরপর নিকটবর্তী গুরিহাখার গ্রামে প্রবেশ করে কয়েকজন নারীকে ধর্ষণ করে। এশিয়া ওয়াচ গ্রামটির একজন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, যিনি তাঁর মেয়েকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে ধর্ষিতা বলে দাবি করেন (প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন তাঁর মেয়ে)। [৪]

---

[1] [Mathur, Shubh (1 †de"yqvwi 2016)| the Human toll of the Kashmir Conflict: Grief and Courage in a South Asian Borderland| Palgrave Macmillan US| c„ôv 60| AvBGmweGb 978-1-137-54622-7|]

[2] ["Rape in Kashmir: A Crime of War" (PDF). Asia Watch & Physicians for Human Righ:s A Division of Human Rights Watch. 5 (9): 8.]

[3] ["Rape in Kashmir: A Crime of War" (PDF). Asia Watch & Physicians for Human Righ:s A Division of Human Rights Watch. 5 (9): 12.]

[4] ["Rape in Kashmir: A Crime of War" (PDF). Asia Watch & Physicians for Human Righ:s A Division of Human Rights Watch. 5 (9): 13.]

১৯৯৩ সালে ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরের বিজবেহারা শহরের বহুসংখ্যক নারীকে গণধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন করে। স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিরা ঘটনাটি প্রচার হলে ধর্ষিতাদের পরিবার অসম্মানিত হবে এই আশঙ্কায় এই ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর ওপর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সৈন্যরা বিজবেহারা শহরের প্রান্তে গাধাঙ্গিপোরায় একজন নারীকে ধর্ষণ করে।[৫]

১৯৯৪ সালের ১৭ জুন মেজর রমেশ ও রাজ কুমারসহ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সৈন্যরা কাশ্মীরের হিহামা গ্রামের ৭ জন মহিলাকে ধর্ষণ করে।[৬]

১৯৯৪ সালে কাশ্মীরের শেখপোরায় সৈন্যরা একটি বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়ির পুরুষদের বন্দি করে ৬০ বছর বয়সী এক নারীকে ধর্ষণ করে।[৭]

১৯৯৪ সালে ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্যরা কাশ্মীরের থেনো বুদাপাথারীতে এক মহিলা ও তাঁর ১২ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ করে।[৮]

১৯৯৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সৈন্যরা কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বুরবুন গ্রামের একটি বাড়িতে প্রবেশ করে তিনজন নারীকে যৌন নির্যাতন করে এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে।

১৯৯৭ সালের নভেম্বরে কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার নরবল পিঙ্গালগোমে ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষীরা একজন তরুণীকে ধর্ষণ করে।[৯]

১৯৯৭ সালের ১৩ এপ্রিল ভারতীয় সৈন্যরা শ্রীনগরের নিকটে ১২ জন কাশ্মীরি তরুণীকে জোরপূর্বক নগ্ন করে এবং গণধর্ষণ করে।[১]

---

[5] ["the Massacre Of A town By Murtaza Shibli"| www.countercurrents.org| সংগ্রহের তারিখ ২০১৭-০৫-০৮ ।]

[6] [Hashmi, Syed Junaid (31 gvP© 2007)| "Conflict Rape Victims: Abandoned And Forgotten"| Counter Currents|]

[7] [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]

[8] [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]

[9] [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]

১৯৯৭ সালের ২২ এপ্রিল ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরের বাভুসা গ্রামে ৩২ বছর বয়সী এক নারীর বাড়িতে প্রবেশ করে ঐ নারীর ১২ বছর বয়সী মেয়ের ওপর যৌন নির্যাতন করে এবং ১৪, ১৬ ও ১৮ বছর বয়সী বাকি তিন মেয়েকে ধর্ষণ করে। অন্য একটি বাড়িতে তারা আরো কয়েকটি মেয়েকে ধর্ষণ করে এবং মেয়েটির মা বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে মারধোর করে।[২]

কাশ্মীরের দোদা জেলার লুদনা গ্রামের ৫০ বছর বয়সী এক নারী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানান যে, ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সদস্যরা তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় এবং প্রহার করে। - এরপর একজন হিন্দু ক্যাপ্টেন তাঁকে ধর্ষণ করে এবং বলে যে, "তোমরা মুসলিম, এবং তোমাদের সকলের সাথে এমন আচরণ করা হবে"।[৩]

২০০০ সালের ২৯ অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৫ বিহার রেজিমেন্টের সৈন্যরা কাশ্মীরের বিহোটায় একটি তল্লাশি অভিযানের সময় একজন মহিলাকে তুলে নিয়ে আসে। পরবর্তী দিন ২০ জন নারী ও কয়েকজন পুরুষ ঐ মহিলাকে মুক্ত করার জন্য যান। কিন্তু সৈন্যরা আগত মহিলাদের ৪-৫ ঘণ্টার জন্য বন্দি করে রাখে এবং তাদের ওপর অত্যাচার করে।[৪]

২০০৪ সালের ২৮ অক্টোবর কাশ্মীরের জিরো ব্রিজের একটি গেস্ট হাউজে ৪ জন নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্য ২১ বছর বয়সী এক তরুণীকে গণধর্ষণ করে।[৫]

---

[1] [Van Praagh, David (2003)| Greater Garnet India's Race with Destiny and China| McGill-Queen's University Press| পৃষ্ঠা ৩৯০। আইএসবিএন ৯৭৮০৭৭৩৫২৫৮৮৭। সংগ্রহের তারিখ ১৫ আগস্ট ২০১৭।

[2] ["India: High time to Put an End to Impunity in Jammu and Kashmir" (PDF). 15 May 1997. Archived from the original (PDF) on 29 October 2013. Retrieved 8 January 2010.]

[3] ["Under Siege: Doda and the Border Districts"| Human Rights Wa:ch|]

[4] [Kazi, Seema. "Rape, Impunity and Justice in Kashmir." Socio-Legal Rev. 10 (2014): 21-23.]

[5] [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]

২০০৬ সালের ৬ নভেম্বর কাশ্মীরের বাদেরপাইনে এক মা এবং তাঁর মেয়ে ধর্ষিত হন।[৬]

ধর্ষণকারী সেনা কর্মকর্তা (মেজর রহমান হুসেইন) একজন মুসলিম হওয়ায় সেনা কর্তৃপক্ষ এটিকে কোনো ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে নি। পরবর্তীতে ঐ কর্মকর্তাকে ধর্ষণের বদলে বেসামরিক সম্পত্তির অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে শাস্তি দেয়া হয়।[৭]

২০০৯ সালের ২৯ মে কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় ভারতীয় সৈন্যরা আসিয়া এবং নিলুফার জান নামে দু'জন নারীকে অপহরণ ও গণধর্ষণের পর হত্যা করে।

বর্তমান ভারত, রঞ্জিত বাহাদুর শ্রীবাস্তব ও যোগী আদিত্য নাথ:

মালাউন রঞ্জিত বাহাদুর শ্রীবাস্তব:

মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে নরেন্দ্র মোদিকে ভোট দিন : বিজেপি ভারতের উত্তর প্রদেশের বিজেপি নেতা রঞ্জিত বাহাদুর শ্রীবাস্তব বলেছেন, মুসলমানদের ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভোট দিন।

'গত পাঁচ বছরে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মনোবল ভেঙে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে জন্য আপনারা যদি মুসলমানদের ধ্বংস করতে চান তাহলে নরেন্দ্র মোদিকে ভোট দিন। দেশ ভাগের পর থেকে ভারতে মুসলিমদের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েছে। এবার ভোটদানের মাধ্যমে তারা এ দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাচ্ছে। এখনই না আটকানো গেলে তারা একদিন তাতে সফল হবে।

''লোকসভা নির্বাচনের পরে চীন থেকে দাড়ি কাটার মেশিন আনা হবে। সেই মেশিন দিয়ে ১০-১২ হাজার মুসলমানের দাড়ি শেভ করা হবে।

---

[6] [Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]

[7] [Ashraf, Ajaz| "'Do you need 700,000 soldiers to fight 150 militants?': Kashmiri rights activist Khurram Parvez"| Scroll.in (Bs‡iwR fvlvq)| msMÖ‡ni ZvwiL 2017-04-21|]

এরপর তাদেরকে জোর করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। নরেন্দ্র মোদি বা বিজেপিকে ভোট না দিলে -এর বিপরীতটাও হতে পারে। সে জন্য ওই ধরনের অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এবং মুসলিমদের ধ্বংস করতে মোদি ও বিজেপিকে ভোট দিন।"[১]

তথ্যসূত্র: নয়া দিগন্ত।

হিন্দুত্ববাদী নেতা মালাউন যোগী আদিত্যনাথ:

উত্তর প্রদেশে ২০০৫ সালে মালাউন বলেছিল, যতক্ষণ না ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হচ্ছে ততক্ষণ আমি থামব না।

২০১৫ সালে উত্তর প্রদেশের কইরানা এলাকা থেকে কিছু হিন্দু পরিবারকে উৎখাতের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়। এর পরে মালাউন যোগী আদিত্যনাথ বলে, যোগী আগামীকালের কথা বলছে না। যোগী ভবিষ্যতের কথা বলছে। হিন্দু পরিবারের উৎখাত আমাদের জন্য বিপজ্জনক হতে চলেছে। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলকে আর একটা কাশ্মীর হতে দেবে না বিজেপি।

২০১৫ সালে আদমশুমারির তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পরে মালাউন আদিত্যনাথ বলে, মুসলিমদের জন্যই গণতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

মালাউন বলে, আমরা আপনাদের (সংখ্যালঘু) কাউকে খুন করতে দেব না। এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করুন এবং দেশের উন্নতিতে মনোযোগ দিন।...যদি অন্যদিকে শান্তি না থাকে, তাহলে আমরা তাদের শেখাব কীভাবে শান্তিতে থাকতে হয়...তারা যে ভাষা বোঝে সে ভাষায়।

যদি একজন হিন্দু নারী নিয়ে যায়, তবে আমরা ১০০ মুসলিম নারীকে উঠিয়ে নিয়ে আসবো যদি এক হিন্দুকে মারে তো আমরা তাদের ১০০ কে মরবো। যেভাবে হিন্দু মেয়েদের অসম্মান করা হয়, আমি মনে করি তা সভ্য সমাজ গ্রহণ করবে না। যদি সরকার এ ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে হিন্দুরা নিজে পদক্ষেপ নেবে। উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে একটি ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন।

---

[1] [https://m.dailynayadiganta.com/subcontinent/404514]

মুসলিমদের মা বোন বেটিদের কবর থেকে উঠিয়ে আনো আর তাদের লাশের সাথে বলৎকার কর।

ভারতের কোনো রাজ্যে যদি হিন্দুরা নাজেহালের শিকার হয়, তাহলে আমরা তা মেনে নেব না। যদি কেউ আমাদের ছুঁতে চেষ্টা করেন, তবে -এর ফল ভোগ করতে হবে।

২০১৫ সালে বারানসির একটি অনুষ্ঠানে মালাউন আদিত্যনাথ বলেছিল,যারা সূর্য নমস্কার করে না, তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত কিংবা সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা উচিত। আর তা না হলে বাকি জীবনটা তাদের অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা উচিত।

উত্তর প্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে মালাউন আদিত্যনাথ যোগী বলেছিল, সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় এলে শুধু কবরস্থানের উন্নতি হবে। আর বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনেক বেশি রামমন্দির হবে।[২]

তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলোর আর্টিকেল অনুযায়ী ইন্ডিয়া টাইমস।

"মূর্তি বিসর্জন দেওয়ার সময়ে সবার মনে হয় পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, কিন্তু বকরি ঈদের দিন যে হাজার হাজার নিরীহ পশু কেটে ফেলা হয় কাশীতে, ওই সব পশুদের রক্ত যখন সরাসরি গঙ্গায় গিয়ে পড়ে, তখন দূষণ হয় না?"

"যদি অনুমতি পাই তাহলে দেশের প্রত্যেকটা মসজিদে গৌরী-গণেশের মূর্তি স্থাপন করে দেব। আর্যাবর্তে আর্যরা তৈরি হয়েছিলেন, হিন্দুস্তানে আমরা হিন্দু করে দেব। পুরো পৃথিবীতে গেরুয়া ঝান্ডা উড়াবে।"

তথ্যসূত্রঃ বিবিসি। [৩]

মোদ্দাকথা, আমাদের এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে বর্তমান হিন্দ প্রদেশের সর্বসাধারণ মুসলমানদের এক করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। এই হিন্দ এবং গোটা পৃথিবীর মুসলমানগণ যে অতিক্রম করছে ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ভারত জুড়ে এখন বইছে অখণ্ড ভারত, হিন্দুত্ববাদ, রামমন্দির আর

---

[2] [https://www.prothomalo.com/international/article/1113199]

[3] [h::ps://www.bbc.com/bengali/news-39319196]

গেড়ুয়া সন্ত্রাসের প্রবল স্রোত। গোটা হিন্দ ব্যাপী হিন্দুবাদের এই আগ্রাসন আমাদের সবাইকে এক অন্তিম ও চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপাত ভাবে সব বিচ্ছিন্ন মনে হলেও সব গড়িয়ে চলছে এক অমোঘ, অবধারিত উপসংহারের দিকে। আল্লহ যখন কোন কিছু চান তখন -এর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। ক্ষেত্র তৈরি করেন। আজ আমরা গোটা হিন্দ জুড়ে মুসলমানদের যে অবস্থা দেখছি তার সবই কি এক ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রর কথা বলেনা! তার সবই কি এক অবধারিত বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়না!

মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্রের অনুকরণে হিন্দুত্ববাদীরা উপহাদেশে এক অখণ্ডভারত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেখানে শুধু মুশরিকদের স্থান থাকবে। আর মালাউন এই সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ব সাম্প্রতিক সময়ে মারাত্বক বেড়ে গেছে। যার নমুনা বিজেপি নেতা মালাউন রঞ্জিত বাহাদুর শ্রীবাস্তব এবং হিন্দুত্ববাদী বিজিপি নেতা মালাউন যোগী আদিত্যনাথ -এর কথা থেকে সুস্পষ্ট হয়।

CIA Ges FDD longwar journal ইতি পূর্বে গাযওয়ায়ে হিন্দ বিষয়ে হিন্দু সরকারদের সতর্কও করে। এবং তারা আলোচনায় আসন্ন হতে যাওয়া যুদ্ধের ব্যাপারে সতর্ক করে। আলোচনার ইউটিউব শিরোনাম: USA/CIA knows abou: "Ghazwa-e-Hind" Conquest of India. [1]

সবশেষে হিন্দুত্ববাদী নেতা মালাউন যোগী আদিত্যনাথ এর আকেকটি ভাষ্য তুলে ধরছি, মালাউন বলে, "আমরা সবাই এক ধর্ম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি। জিহাদের মোকাবেলা কেবল এই ধর্ম যুদ্ধই করতে পারে। লোকে বলে- আরে হিন্দু বাহিনী গঠন করার কারণটা কি? আমি বলি কারণ আছে, হিন্দু আলাদা সংস্কৃতি, মুসলিম আলাদা সংস্কৃতি, দুটি এক সাথে থাকতে পারে না। দু সংস্কৃতি এক সাথে কখনই থাকতে পারে না। এক সংঘাত হবে, অবশ্যই হবে! আর যেহেতু এই দুই সংস্কৃতি এক সাথে থাকতে পারে না তাই বিভাজন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যই হওয়া দরকার।"

---

১ [যঃঃঢ়ং://িি.ুড়ঁঃনব.পড়স/ধিঃপয?া=থমহসউযীওড়শ৮]

বিস্তারিত জানতে নিচের ভিডিওটি দেখতে পারেন।

গেরুয়া সন্ত্রাসবাদের উত্থান- যোগী আদিত্যনাথ ।

সমগ্র ভারত জুড়ে আজ দেখা যাচ্ছে গেরুয়া সন্ত্রাসের উত্থান। অখন্ড ভারতে রাম রাজত্ব কায়েম করার লক্ষ্যে সমগ্র ভারত জুড়ে চলছে মুসলিম নিধন! গো হত্যা কিংবা জিহাদের নাম দিয়ে মুসলিম হত্যা নিত্য দিনের ব্যাপার। আর ভারত জুড়ে মুসলিম নিধনের নেতৃত্বে আছে গেরুয়া সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ নিজে এবং তার উত্তর প্রদেশ। মোদী, যোগী আদিথ্যনাথ, হিন্দু যুবা বাহিনী, আরএসএস, বাবরি মসজিদ, কাশ্মীর সন্ত্রাস - এগুলো কোনটাই বিচ্ছিন্ন নয় বরং এর সবই এক সুত্রে গাঁথা। আর তা হচ্ছে - অখন্ড ভারত জুড়ে এক পরিচয়, এক রাজত্ব - হিন্দুত্ব এবং রাম রাজত্ব।

ডাউনলোড করুন!

MediaFire

http://www.mediafire.com/file/09ks0m...itled.mp4/file

Archive.org

https://archive.org/download/JogiAdi...adittonath.mp4

https://www.mediafire.com/file/k1kkr...vidcompact.mp4

বাবরি মসজিদ ও নব্য আন্দোলনের সূচনা

বাবরি মসজিদ রায়:

কয়েক দশকের হিন্দু-মুসলিম বিবাদ, হিন্দুত্ববাদীদের বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা, মামলা এবং ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়।

ভারতের অযোধ্যার এক বিতর্কিত জমি নিয়ে কয়েক দশক অপেক্ষার পর রায় ঘোষণা করে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। রায়ে ওয়াকাফ বোর্ডের আর্জি এবং নির্মোহী আখড়ার জমির উপর দাবি দুটোই খারিজ করে দেন বিচারকরা। বিতর্কিত সেই জমিতে একটি ট্রাস্টের অধীনে মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি, একটি মসজিদ গড়তে কাছাকাছি অন্য কোথাও মুসলমানদের পাঁচ একর জমি দিতেও বলা হয়েছে রায়ে।

ভারতে ছোট ছোট বাচ্চাদের মসজিদ ভাঙার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আরএসএস

ভারতে আরএসএস পরিচালিত এক স্কুলে ছোট ছোট ছাত্রদের বাবরি মসজিদের প্রতীকী বানিয়ে তা ভাঙার শিক্ষা দেওয়া হলো। পুরো ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গেছে ভারতজুড়ে। গত রবিবার কর্নাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার শ্রী রাম বিদ্যাকেন্দ্র হাইস্কুলে একাদশ আর দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য ওই বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।

তাতে দেখা যায়, বাবরি মসজিদের একটি প্রতীকী তৈরি করা হয়েছে। বেশ কিছু শিক্ষার্থী ওই প্রতীকীকে ঘিরে রেখেছে।

চারিদিকে গেরুয়া পতাকা উড়ছে। কিছুক্ষণ পরেই প্রতীকী ঘিরে রাখা ছাত্ররা ভেঙে ফেলছে সেটি। পুরো ঘটনার একটি

ভিডিও সামনে এসেছে। এ ঘটনায় সমালোচনা শুরু হওয়ার পর আরএসএস নেতা তথা ওই স্কুলের

প্রেসিডেন্ট প্রভাকর ভাট বলেছেন, আমি আমার ছাত্রদের জন্য গর্বিত।'

নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯

ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বরে ভারতের সংসদে পাস হওয়া একটি আইন।[১] এ বিলের

---

[১] "ঞযব ঈরঃরুবহংযরঢ় (অসবহফসবহঃ) অপঃ, ২০১৯" (চউঋ)। ঞযব এধুবঃঃব ড়ভ ওহফরধ। ১২ ডিসেম্বর ২০১৯। সংগ্রহের তারিখ ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

উদ্দেশ্য ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে আগত নিপীড়িত সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি এবং খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী অবৈধ অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরকিত্ব পাওয়ার সুযোগ হয়েছে এই বিলের মাধ্যমে। মুসলিমদের জন্য এজাতীয় কোনো সুযোগের ব্যবস্থা রাখা হয় নি।[২] ভারতীয় আইনের আধারে প্রথমবারের মত ধর্মীয় পরিচয়কে নাগরিকত্ব লাভের শর্ত হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে।

ভারতে মুসলিম বিরোধী আইন: আসামে সবচেয়ে বড় বন্দিশিবির নির্মাণের কাজ চলছে।

ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ: মাওলানাকে নগ্ন করে পুলিশের নির্মম নির্যাতন।

ঘটনাসমূহের নোট চার্ট:

তারিখ শিরোনাম

[২] ঐবনবহ জবমধহ, ঝধিঃর এঁড়ঃধ ধহফ ঙসধৎ কযধহ, "ওহফরধ ঢ়ধংংবং পড়হঃৎড়াবৎংরধষ পরঃরুবহংযরঢ় নরষষ ঃযধঃ বীপষঁফবং গঁংষরসং," ঈঘঘ ঘবিং.

গাযওয়াতুল হিন্দ

কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে

ড. আইমান সাদীদ

ষষ্ঠ পাঠ

শাহ নেয়ামাতুল্লাহ শাহ নেয়ামাতুল্লাহ রহঃ এর ভবিষ্যদ্বাণী বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং গাজওয়াতুল হিন্দ।

আল্লাহ প্রদত্ত ইলহাম এর জ্ঞান দ্বারা আজ থেকে প্রায় সাড়ে আটশত বছর পূর্বে (হিজরী ৫৪৮ সাল মোতাবেক ১১৫২ সালে খ্রিস্টাব্দে) শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহঃ তার বিখ্যাত কাব্যগুলো রচনা করেন। আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দাগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবের বিষয় সম্পর্কে ইলহাম পেয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে যে, কোন সৃষ্টি জীবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই যে, সে ইচ্ছা করলেই গায়েবের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এই জ্ঞান দান করে থাকেন। উপমহাদেশের ইলমী জনক শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহঃ তার ইলহামী ইলম দিয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ সাওয়াতিউল ইলহাম রচনা করেন। অনুরূপ হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ তার ইলহামী জ্ঞানের কিছু অংশ একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এটি লিখার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলে গিয়েছে। কবিতার ৩৭ নং প্যারা থেকে বিশেষভাবে খেয়াল করুন। কারণ এর পূর্বের লাইনগুলো অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়ায় শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে এটাই আমাদের দেখার বিষয়। কিছুটা দীর্ঘ হলেও ধৈর্য সহকারে পড়লে "গাজওয়াতুল হিন্দ" সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।

***

আমাদের দুর্ভাগ্যই বলা চলে, পাকিস্তানি মুসলিম ভাইদের মাঝে কাসীদাগুলো বেশ পরিচিত, প্রসিদ্ধ এবং সমাদৃত অথচ বাংলাদেশে এ

সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। কবিতাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত "কাসিদায়ে সাওগাত" বইতে পাবেন। এই ছাড়াও মদিনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত "মুসলিম পুন:জাগরণ প্রসঙ্গ ইমাম মাহদি" বইতেও পাবেন। যারা উর্দু বুঝেন তারা এই নিয়ে ৮ পর্বের সিরিজ আলোচনা শুনতে পারেন, পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞ জায়েদ হামিদ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা সহকারে উনার সকল ভবিষ্যদ্বাণী (ইলহাম) তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষায় রুহুল আমীন খান অনূদিত শাহ নিয়ামতুল্লাহ রহ এর একটি কবিতা ১৯৭০/৭১ এর দিকে এদেশে প্রকাশিত হয়েছিল। নতুন ব্যাখ্যা সংযোজন ও পুন:সম্পাদন করে নিম্নে তা দেয়া হল:

৩৩)

মুকুটবিহীন নাদান বাদশা পাইবে শাসনভার

কানুন ও তার ফর্মান হবে আজেবাজে একছার

ব্যাখ্যা: এই প্যারা থেকে ভারত বিভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধরা যায়। এই সময় এই অঞ্চলে মুসলিমদের ঝান্ডাবাহী কোন সরকার আসে নি। মুকুটবিহীন নাদান বাদশাহ বলতে অনেকে গণতন্ত্রকে বুঝিয়েছে। আব্রাহাম লিংকনের তৈরি গণতন্ত্রকে জনগণের তন্ত্র বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে জন-নিপীড়নের তন্ত্র। এই গণতন্ত্রের নিয়ম কানুন যে আজেবাজে সে সম্পর্কে শেষ লাইনে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩৪)

পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও নগ্নতা বেহায়ামি

ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর গজব আসিবে নামি

৩৫)

ধ্বংস নিহত হবে মুসলিম বিধর্মীদের হাতে

হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ ভাসিবে রক্তপাতে

৩৬)

মুসলমানের জান-মাল হবে খেলনা মূল্যহত

রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে সাগর স্রোতের মত

৩৭)

এরপর যাবে ভেগে নারকীরা পাঞ্জাব কেন্দ্রের

ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের

ব্যাখ্যা: এখানে পাঞ্জাব কেন্দ্রের বলতে কাশ্মীর মনে করা হয়। গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থাৎ হিন্দুস্তানের যুদ্ধের পূর্বে মুসলিমরা সর্বপ্রথম ভারতের কাছ থেকে একটি এলাকা দখল করে নেবে। আশা করা যায়, এটা হচ্ছে পাকিস্তান সীমান্তলগ্ন পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীর এলাকা। কারণ কাশ্মীরের স্থানীয় মুজাহিদ, আল-কায়েদা, তালেবান সহ আরো অনেক জিহাদি গ্রুপ ব্যাপক আকারে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে জম্মু কাশ্মীরকে ভারতের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য।

৩৮)

অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের

তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের

৩৯)

হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি

ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি

ব্যাখ্যা: ৩৮ ও ৩৯ নং প্যারায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা যখন কাশ্মীর দখল করে নেবে তারপরই হিন্দুরা মুসলিমদের একটি এলাকা দখলে নেবে এবং সেখানে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভারতের হিন্দু মুশরিকরা লুটপাটের মাধ্যমে নিয়ে নেবে, মুসলিমদের ঘরে ঘরে কারবালার ন্যায় রূপধারণ করবে। কিন্তু আপনি কি জানেন মুসলিমদের যে দেশটা ভারতের হিন্দুরা দখলে নিয়ে এ ধরনের হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে সেটা কোন দেশ? ধারণা করা হয় সেটি আপনার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অর্থাৎ মুসলিমরা কাশ্মীর জয় করার পর হিন্দুরা বাংলাদেশ দখল করবে। পরবর্তী প্যারাগুলো পড়লে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

৪০)

মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে

মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে

ব্যাখ্যাঃ বর্তমান সময়ে এই উপমহাদেশে এ ধরনের নেতার অভাব নেই। যারা উপর দিয়ে মুসলমানদের নেতা সেজে থাকে কিন্তু ভেতর দিয়ে কাফিরদের এক নম্বর দালাল। সমগ্র ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে। যেখানকার নেতারা নামধারী মুসলিম হবে কিন্তু গোপনে গোপনে হিন্দুবান্ধব হবে। মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য ভারত সরকারের সাথে গোপনে পাপ চুক্তি করবে।

৪১

প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীনের অবস্থান

শেষের অক্ষরে থাকিবে নূন ও বিরাজমান

ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দুঈদের

ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম ধ্বংসকারী এই মুনাফিক শাসককে চেনার উপায় হল তার নামের প্রথম অক্ষর হবে আরবি অক্ষর শীন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "শ" এবং শেষের অক্ষর হবে আরবি অক্ষর নুন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "ন"। কেউ কেউ বলেন হতে পারেন তিনি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী (আল্লাহ ভালো জানেন)। আর এসব ঘটনা ঘটবে দুই ঈদের মাঝে। যেটা হতে পারে আগামী ঈদ কিংবা এর পরবর্তী বছরের ঈদ। প্রিয় ভাইয়েরা একটু কল্পনা করুন, এদেশে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকে আপনার পিতা, আপনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করবে, আপনার মা বোনদের ধর্ষণ করবে তখন কি অবস্থা হবে আপনার? আপনি ভেবেছেন কি আপনার সাজানো সংসার, আপনার চাকুরী, আপনার ব্যবসার ভবিষ্যৎ কি? সময় খুব অল্প। তাই হিন্দু মালাউনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি নিন। এছাড়া আর কোন পথ নেই।

***

বর্তমান পরিস্থিতি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খোরাসান (বর্তমান আফগানিস্থান) থেকে কালিমাখচিত কালো পতাকাধারীদের উত্থান এবং তাদের কাশ্মীর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে সাত লক্ষ সেনা মোতায়েন, পাক-ভারত-বাংলাদেশের হকপন্থী দলগুলোর সুদৃঢ় অবস্থান, পানি নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সাথে ভারতের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং মুসলিমদের নির্যাতন নিয়ে ভারতের ভেতরে মুসলিমদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ, সেভেন সিস্টারস বা ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনতার দাবি নিঃসন্দেহে ভারত বিভক্তি এবং আশু সে মহা যুদ্ধেরই ইঙ্গিত বহন করে।

বর্তমানে এই উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী ভূখণ্ডের মুসলিমপ্রধান ভূখণ্ডের ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অব্যাহত প্রচেষ্টা দেখলে বুঝা যায় যে, এটি খুব সত্বরই চূড়ান্ত সংঘাতময় রূপ ধারণ করবে এবং এখানকার ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে উম্মতের একটি দলকে এদিকে অগ্রসর হতে হবে। এটি ঘটবে সেই সমসাময়িক সময়ে, যখন সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা খিলাফতের আদলে সাজাতে আল্লাহ তাআলা ইমাম মাহদিকে প্রেরণ করবেন, যার খিলাফতের সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং দাজ্জালের সাথে মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে ইসা আলাইহিস সালামের আগমন ঘটবে। গাজওয়াতুল হিন্দের সময় অবশ্যই পাক-ভারত-বাংলাদেশের মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা আলাদা হয়ে যাবে। তারা হয়তো কাফিরদের পক্ষে যোগ দিবে অথবা পালিয়ে বেড়াবে। এই ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমরা জয়ী হবে এবং তারা ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে ইসা আলাইহিস সালামের সাথে মিলিত হবে।

এবার কোথায় যাবেন...

যারা বলে থাকেন যে যদি কোন হাক্কানী উলামায়ে কেরাম জিহাদের ডাক দেয় তাহলে আমরা সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আল্লামা আহমাদ শফী

দা.বা. তো গাযওয়াতুল হিন্দ-এর প্রস্তুতি নিতে বলেছেন, তাহলে এখনো কেন আমরা কোন প্রস্তুতি নিচ্ছি না। নাকি তার এ কথার মাঝেও কোন হেকমতে আমালি খুজে পেয়েছি।

তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকে খোশ খবরি দিচ্ছি। অতিসত্বর এই ইন্ডিয়া-ভারতবর্ষ একদিন মুসলমানদের কবলে আসবে। এটার খবর কে দিয়েছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে দিয়েছেন।...আমি আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি, আমি কত দিন বাচি তা তো আর জানি না, আমার একশ বছরের অভিজ্ঞতা..। এই মোদি সরকার থাকতে পারবে না। ভিডিওটি দেখতে নিচের কোড স্কান করুন।

অথবা ব্রাউজ করুন:

https://www.youtube.com/watch?v=mIvYPOX3xL8

জিহাদ

এক মাজলুমের আর্তনাদ

আমি মাজলুম। আমি শরিয়তের এক বিস্মৃত বিধান বলছি। আমার নাম জিহাদ। কুরআন ও হাদিস আমাকে যে সকল নামে ডাকে,

১. কুরআন আমাকে আল-হারব (الحرب) বলে। এর অর্থ যুদ্ধ। শব্দটি ধ্বংস, অনিষ্ট, হত্যা, ও কৃতঘ্নতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হারব এর প্রচলিত অর্থে সশস্ত্র সংগ্রামকে বুঝায়। আল-কুরআনে হারব শব্দটি ছটি জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কুরআন আমাকে আস-সীয়ার (السير) বলে। সীয়ার হচ্ছে সীরাহ এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে পন্থা, জীবন চরিত ও পদ্ধতি। আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত্র বর্ণনার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা আসার জন্য সীরাহকেও জিহাদের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ (আইন বিশারদ) সীরাহকে মাগাযী (যুদ্ধ) হিসেবে ধরেছেন। অবশ্য কেউ কেউ সীয়ারকে মাগাযী বলেননি, তবে মাগাযী (যুদ্ধ) ও সন্ধির বিধানগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের জীবন চরিত্র আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে।

৩. কুরআন আমাকে নুফুর (نفور) বলে। শব্দটি نفر-থেকে নির্গত। এর অর্থ অভিযান। ঘৃণা, বিমুখতা, অনীহা, পালানো, বিক্ষিপ্ত বা পৃথক পৃথক দল, হিজরত, সর্বোপরি এর এক অর্থ অভিযানে বের হওয়া। শব্দটি যুদ্ধ বা সশস্ত্র অভিযানের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৪. কুরআন আমাকে খুরুজ (خروج) বলে। এর সাধারণ অর্থ বের হওয়া। তবে এটি বিশেষ করে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়াকেই বুঝায়।

৫. কুরআন আমাকে দরবুল রিকাব (ضرب الرقاب) বলে। এর অর্থ আঘাত। আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়ের অর্থ গর্দানের ওপর আঘাত করা।

৬. হাদিস আমাকে আল-কুওয়াত (القوة) বলে। এর অর্থ শক্তি। এ শব্দটি সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অর্থে আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭. কুরআন আমাকে রিবাত আল-খায়িল (رباط الخيل) বলে। -এর অর্থ সীমান্ত রক্ষার জন্য অশ্বারোহী সেনার চৌকি বা ছাউনির ব্যবস্থাকরণ। এ শব্দটি সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অর্থে আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮. কুরআন আমাকে কিতাল-(قتال) বলে। কিতাল শব্দটির অর্থ মারা, হত্যা, যুদ্ধ, প্রতিশোধ, অভিশাপ, সর্বোপরি সশস্ত্র সংগ্রামকে কিতাল বলে। আল-কুরআনে আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকারকারীর (কাফির) বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে বুঝানোর (যুদ্ধের অনুমতি বা নির্দেশের) ক্ষেত্রে সাধারণত: قتال - শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত এ আয়াতে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, যারা আক্রান্ত হয়েছে, যাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম ব্যবহৃত হয়েছে। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জবাবে নাযিলকৃত আয়াতেও কিতাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে

৯. কুরআন আমাকে আলইরহাব বলে।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যার দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবেনা।[১]

অথচ আজ আমাকে ইরহাব বলে নিন্দিতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

---

[১]. সূরা আনআম ৮:৬০

১০. কুরআন আমাকে জিহাদ (جهاد) বলে। শব্দটি جهد শব্দ থেকে নির্গত। ج- (জিম) বর্ণের ওপর পেশ হলে -এর অর্থশক্তি ও সামর্থ্য, কঠিন, অতিরিক্ত, পরিশ্রম। আর জিমের ওপর ফাতাহ্ হলে এর অর্থ শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা, প্রচেষ্টা, লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালানো, পরীক্ষা করা, আগ্রহ প্রকাশ করা, ক্ষীণ বা দুর্বল করা, অধ্যাবসায় সহকারে কাজ করা, এবং সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। ইসলামী পরিভাষায়- জিহাদ হচ্ছে কাফির-আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। অথবা কাফেরদের হাত থেকে আল্লাহর দ্বীনকে হিফাযত করার জন্য পরিচালিত যাবতীয় অভিযানসমূহই জিহাদ। ইমাম শাফেয়ী বলেন, দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জিহাদ।

ইমাম মালিক বলেন, আল্লাহর কালেমা প্রচারের লক্ষ্যে (চুক্তিবদ্ধ জাতি ছাড়া) কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নাম জিহাদ।

আমার দুই প্রকার:

১. আক্রমণাত্মক ও প্রারম্ভিক জিহাদ।

২. প্রতিরোধ মূলক জিহাদ।

প্রথম প্রকার: আক্রমণাত্মক ও প্রারম্ভিক জিহাদ।

সংজ্ঞা: কাফেরদেরকে তাদের এলাকায় তলব করে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। যদি ইসলামের হুকুমকে মাথা পেতে গ্রহণ না করে তাহলে জিযয়ার গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া। তাও মেনে না নিলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। এ হচ্ছে আক্রমনাত্মক জিহাদের পরিচয়।

হুকুম: এ প্রকার জিহাদ ফরযে কিফায়া, তবে কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়।

কুরআনের ভাষায় কাফেরদের সাথে আমার নীতি।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

"অত:পর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকো। তবে যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"।[১]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।[২]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্যত্র বলেন,

فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين

"আর তোমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করো সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে সমবেতভাবে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন।"[৩]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

"তোমরা বেরিয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান নিয়ে এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো"।[১]

---

১. সূরা তওবা:৫

২. সূরা বাকারা.২১৬

৩. সূরা তওবা:৩৬

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেন,

قَٰتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযিয়া দেয়।[২]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য আয়াতে বলেন,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ

অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়*। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ নষ্ট করবেন না।[৩]

এ সকল আয়াতসমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুশরিক ও কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মহান আদেশ দিয়েছেন। দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতালের হুকুম দিয়েছেন।

---

[১]. সূরা তওবা: ৪১

[২]. সূরা তাওবা.২৯

[৩]. সূরা মুহাম্মাদ.৯

হাদিসের পাতায় পাতায় আমার বিচরণ

১. ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,

عن أبي هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله

আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, যখন নবী (সাল্লালাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যু হল এবং আবূ বকর রাযিআল্লাহু আনহু খলীফা হলেন আর আরবের যারা কুফুরি করার কুফুরি করলো তখন উমর রাযিআল্লাহু আনহু বললেন হে আবূ বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? অথচ নবী (সাল্লালাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই) বলবে। আর যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর তার হিসাব আল্লাহ্ র দায়িত্বে।[৪]

২. ইবনে আবি শায়বা ও আব্দুর রাজ্জাক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,

عن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الإسلام ثمانية أسهم الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له "

হযরত হুযাইফা আল ইয়ামেনি রাযিআল্লাহু আনহু বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামের আটটি অংশ। সালাত একটি অংশ, যাকাত একটি অংশ, হজ্ব একটি অংশ, সিয়াম একটি অংশ, ভালো কাজে আদেশ একটি অংশ, মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা একটি অংশ,

---

৪. সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৯২৪, সহিহ মুসলিম হাদিস নং ৩৩

আল্লাহর রাহে জিহাদ করা একটি অংশ, আর সেই তো হতভাগা যার কোন অংশ নেই।[১]

৩. ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,

عن ابن عباس . رضى الله عنهما . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا ".

ইব্‌নে আব্বাস রায়িআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, (মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়ত। যখন তোমাদের জিহাদের ডাক দেয়া হয়, তখন বেরিয়ে পড়।[২]

এ হাদিসটি একথা বুঝায় যে যখন ইমাম কোন ব্যক্তিকে জিহাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবেন তার জন্য তখন জিহাদে বের হওয়া ফরজ হবে। কেননা হাদিসের (وإذا استنفرتم فانفروا) এ ভাষ্য একথাই বুঝায়।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীর (রাযিআল্লাহু আনহুম) এর জবানে আমার গুণগান।

হাকেম ও ইবনে জারির আবি রাশেদ আল হিবরানি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাযিআল্লাহু আনহু কে হামস নামক স্থানে পেলাম যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি দেহকায়ে মোটা হওয়ার দরুন পোদ্দারদের বাক্সের উপর বসে আছেন, তখন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তো আপনাকে ওযরগ্রস্ত করে দিয়েছেন। তখন মিকদাদ রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, সুরা আল বুউস আমার রুখসতকে মেনে নিতে বারণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)

---

[১]. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৫/৩৫২,মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৫-১৭৩-১৭৪। হাদিসের মান হাসান।

[২]. সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৮৩

অর্থাৎ, "তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"[৩]

ইবনে মুবারক কিতাবু জিহাদে আতিয়্যাহ ইবনে আবি আতিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেন, কুফার যুদ্ধকালীন কোন সময়ে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুমকে জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের কাতারে একটি লোহার প্রশস্থ বর্ম টেনে নিতে দেখেছেন।[৪]

অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। আল্লাহ তাকে ওযরগ্রস্ত বানিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। এবং কাদেসিয়ার প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীতে শরিক হয়ে ছিলেন। ইসলামের পতাকা বহন করেছিলেন এবং সে রণাঙ্গনেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছিলেন।[৫]

কেউ কেউ বলেন মদিনায় ফিরে এসে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে আবি শায়বা আত তাবারি বর্ণনা করেন, মানসুর ইবনে যাজান (انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) এই আয়াত প্রসংগে বলেছেন, তোমরা ব্যস্ত অবস্থায় এবং ফারাহাতের অবস্থায়, উভয় অবস্থাতেই জিহাদে বাহির হও।[৬]

ইবনে জারির তাবারি তার তাফসির গ্রন্থে বলেন, কতক মুজাহিদ পদব্রজে বিলাদুস শাম বিজয়ের ইচ্ছা করলেন। অথচ বার্ধ্যক্যের কারণে তাদের চোখের ভ্রু চোখকে ঢেকে ফেলেছে। তখন তাদের একজন তাদেরকে বললেন, চাচা আল্লাহ তো আপনাদেরকে ওজরগ্রস্ত করেছেন! তখন তারা বললেন, শোন ভাতিজা, আল্লাহ আমাদেরকে হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।[৭]

আমি (জিহাদ) কি ফরজে কেফায়া নাকি ফরজে আইন।

উলামায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে একমত যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসার আহ্বান করা, ইসলামের

---

[৩]. সূরা আত তাওবা ৯-৪১

[৪]. ইবনে মুবারক, কিতাবুল জিহাদ ১-১১৯

[৫]. আল ইসাবা ৩-৫২৪-৫২৫

[৬]. ইবনে আবি শায়বা ৫-৩০৬, তাফসিরে তাবারি ১০-৯৭,ইবনে কাসির ২-৩৫৯

[৭]. তাফসিরে তাবারি ১০-৯৭

দাওয়াত দেয়া; আর যদি দাওয়াত কবুল না করে তাহলে তাদের উপর কর আরোপ করা অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা - একটি ফরজ দায়িত্ব, যা রহিত হবার নয়। প্রারম্ভিক ও আক্রমনাত্মক জিহাদ ক্ষেত্রবিশেষ ব্যতীত ফরজে কিফায়া। যখন মুমিনগণের একটি অংশ তা বাস্তবায়ন করবে, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতের জন্য তারা যথেষ্ট হবে তখন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাদের সাথে জিহাদে বের হওয়া জরুরি নয়। তার প্রমাণ এই,

১. আল্লাহর বাণী,

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

"আর সকল মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে স্বজাতিকে, যখন তাঁরা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন কারবে, যেন তারা সতর্ক হতে পারে"।[১]

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন,এ আয়াতের ভাষ্য হলো, জিহাদ ফরজে আইন নয় বরং ফরজে কিফায়া। যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। কারণ, যদি সকলেই জিহাদে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তাদের পশ্চাতে রয়ে যাওয়া পরিবার-পরিজন সংকটে পড়ে যাবে। তাই তাদের একদল জিহাদে বেরিয়ে পড়বে। অপর আরেক দল অবস্থান করবে, দ্বীন শিখবে এবং দেশ রক্ষা করবে; যখন মুজাহিদ বাহিনী জিহাদ থেকে ফিরে আসবে তখন অবস্থানকারী দল যে সব বিধি-বিধান শিখেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নতুন যে অহী অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে তা শেখাবে"।[২]

২. আল্লাহ তাআলার বাণী,

لا يستوي القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما

---

[১]. সূরা তাওবা:১২২

[২]. তাফসীরে কুরতুবী:৮/২৯৩

"গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা জান-মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদগণকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন"।[৩]

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ জমহুরের মতের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন,আমাদের প্রমাণ لايستوي القاعدون আল্লাহর এ বাণীটি। এই আয়াতটি প্রমাণ বহন করে যে, যখন একটি দল জিহাদ করতে থাকবে তখন উপবিষ্টরা গোনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا

"আর সকল মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে"।

এই জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযান প্রেরণ করতেন আর তিনি নিজ এলাকায় অবস্থান করতেন তাঁর সাথে অনেক সাহাবীও। কাসানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা মুজাহিদ ও উপবিষ্টদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। যদি জিহাদ সব সময়ের জন্য ফরজে আইন হতো তাহলে উপবিষ্টদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করতেন না। বরং বসে থাকা তখন হারাম কাজ হতো।

৩. আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী লাখয়ানের উদ্দেশ্যে একটি অভিযান প্রেরণ করার সময় বললেন, প্রত্যেক দুই জনের একজন (জিহাদের জন্য) বের হবে। সেইসাথে এও বলে দিলেন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সততার সাথে জিহাদে গমনকারী ব্যক্তির পরিবার ও সম্পদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তার জিহাদে গমনকারী ব্যক্তির অর্ধেক নেকি অর্জিত হবে"।[৪]

---

৩. সূরা নিসা:৯৫

৪. মুসলিম

যায়েদ ইবনে খালেদ রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধাকে আল্লাহর রাস্তার জন্য প্রস্তুত করে দিলো, তাহলে সে যেন নিজেও যুদ্ধ করলো। আর যে সততার সাথে আল্লাহর রাস্তার কোনো যোদ্ধার (পরিবার ও সম্পদের) দেখাশোনার দায়িত্ব নিলো তাহলে সেও যুদ্ধ করলো"।[১]

৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম ও অভিযান।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো নিজে অভিযানে বের হতেন, কখনো নিজে বের হতেন না; অন্য একজনকে অভিযানের আমির নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিতেন। আবার সাহাবী সকলেই বের হতেন না; বরং কিছু সাহাবী অভিযানে বের হতেন। আর এটি একটি পরিষ্কার বিষয়। গাযওয়ায়ে মুতাসহ আরো অনেক অভিযানে এমনটি হয়েছে। সারাখসী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,...তার আরেক প্রকার হচ্ছে, ফরজে কিফায়া। যখন কিছু লোক তা বাস্তবায়ন করবে তখন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাওয়ার ব্যক্তি অন্যদের পক্ষ থেকেও আদায় হয়ে যাবে। উদ্দেশ্যটি হচ্ছে মুশরিকদের শক্তি ভেঙ্গে দেয়া, দ্বীনকে উঁচু করা। তা না করে যদি তা সব সময়ের জন্য সবার উপর ফরজ করে দেয়া হয় তাহলে মূল লক্ষ্যই ব্যহত হয়ে যাবে। মূল লক্ষ্য হলো, মুসলমানরা যেন নিরাপদে থাকতে পারে এবং দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণকর বিষয়াবলী বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে যখন সকলেই জিহাদে শামিল হয়ে যাবে তখন দুনিয়ার মাসালিহ বাস্তবায়ন করার সুযোগ তাঁদের মিলবে না"।[২]

অতএব আমাদের কাছে স্বীকৃত হয়ে গেলো যে, কাফেরদের সাথে তাদের ভূখণ্ডে যুদ্ধ করা, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া যদি গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সাথে কিতাল করা অথবা জিযিয়া গ্রহণ করা মুসলমানদের উপর ফরজ।

কাফেরদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদ করা নফল হওয়ার যে বক্তব্য ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ও ইমাম সাওরী থেকে বর্ণিত আছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আক্রমণাত্মক জিহাদ সকল মুসলমানের উপর ফরজে আইন

১. বুখারী

২. আল-মাবসূত লিস-সারাখসী: ৩/১০

নয়; বরং ফরজে কেফায়া। যখন এ ফরজ দায়িত্ব একটি জামাত আদায় করবে তখন অন্য মুসলমানের উপর তা নফল হিসেবে বিবেচিত হবে। তাদের এ বক্তব্যের অন্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা জায়েয হবে না।

ফাতহুল কাদিরের ব্যাখ্যাকার জিহাদ ফরজ হওয়ার বিষয়টি দলীলসহ আলোচনা করার পর বলেন,

وبهذه ينتفي ما نقل عن الثوري وغيره أنه ليس بفرض، ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين

"-এর মাধ্যমে ইমাম সাওরী ও অন্যান্যদের থেকে এ প্রকারের জিহাদ ফরজ না হওয়ার ব্যাপারে যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা অকার্যকর হয়ে যায়। তাদের বক্তব্য যদি সঠিকও হয়ে থাকে তাহলে একে ফরজে আইন না হওয়ার উপর প্রয়োগ করা আবশ্যক"।[৩]

ইমাম জাসসাস রাহ. বলেন,

إن مذهب ابن عمر في الجهاد أنه فرض على الكفاية وأن الرواية التي رويت عنه في نفي فرض الجهاد إنما هي على الوجه الذي ذكرنا، من أنه غير متعين على كل حال في كل زمان

"জিহাদের ক্ষেত্রে ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহু-এর মতামত হলো এটি ফরজে কিফায়া। আর যে বর্ণনায় জিহাদ ফরজ না হওয়ার কথা রয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য তাই যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ প্রত্যেকের উপর প্রত্যেক জমানায়ই ফরজে আইন নয়"।[৪]

ইবনে কুদামা ও ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ জিহাদের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে ফরজ ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করেননি। ইবনে ওমর ও সাওরীর দিকে সম্পৃক্ত করে এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সে দিকে ইশারা করে তারা বলেন, এসব বক্তব্য তাদের থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত নয় অথবা তাদের কথা থেকে ফরজে কেফায়া ছাড়া অন্য কিছু বোঝা যায় না।[৫]

---

[৩]. শরহে ফতহুল কাদীর: ৫/৪৩৭

[৪]. তাফসিরে জাসসাস: ৩/১১৬

[৫]. দ্রষ্টব্য- আল-মুগনী:৮/৩৪৬, যাদুল মাআদ:৩/৭১

ইবনে আতিয়া রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরে আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে বলেন,

واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الغسلام فهو حينئذ فرض عين وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال: الجهاد تطوع. وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد فقيل هذا تطوع .

"এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত চলে আসছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের উম্মতের উপর জিহাদ করা ফরজে কেফায়া। সুতরাং মুসলমানদের একটি অংশ যদি তা আদায় করে তাহলে অন্যদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে যখন মুসলিম ভূখণ্ডে শত্রুবাহিনী আক্রমণ করে বসবে তখন সকলের উপর জিহাদ ফরজে আইন। মাহদাওয়ী ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম ইমাম সাওরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, জিহাদ একটি নফল ইবাদত। আমার মতে এই উক্তিটি সেসময়ের প্রশ্নকারীর উত্তরে বলা হয়েছে যখন জিহাদের ফরজ দায়িত্ব অন্যদের দ্বারা আদায় হচ্ছে। তখন তাকে উত্তরে বলা হলো এ মুহূর্তে জিহাদ করা নফল।[১]

আমার মতে, ইবনে আতিয়া রাহি.-এর এ ব্যাখ্যাটি খুবই চমৎকার হয়েছে। স্বর্ণযুগের বড় বড় আলেমগণ ছাড়াও যে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান রাখে, সেও জিহাদ ফরজ হওয়া ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। আর ফরজ না হওয়ার ব্যাপারে তাদের থেকে যেসব উক্তি পাওয়া যায় তা তিন অবস্থা থেকে মুক্ত নয়:

১. এমনও তো হতে পারে যে, এসব বক্তব্যকে তাদের বক্তব্য বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ অনেক বক্তব্য এমন আছে যার কোনো ভিত্তি নেই।

২. অথবা তাদের পক্ষ থেকে এ বক্তব্য ব্যক্তি কেন্দ্রিক ফাতওয়া হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, এমন ব্যক্তির জন্য, যে তাঁদের কাছে ফাতওয়া চেয়েছিলো। অথচ সে ছাড়া অন্যদের জন্য জিহাদ ফরজ। সুতরাং তাঁরা যখন তাকে

১. তাফসীরে ইবনে আতিয়া:২/৪৩

জানালেন যে, এ মুহূর্তে তোমার জন্য জিহাদ নফল তখন শ্রোতা মনে করলো এটা মনে হয় জিহাদের ক্ষেত্রে মুফতি সাহেবের সাধারণ ফাতওয়া।

৩. হতে পারে যে, তারা ফরজ নয় বলে প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন নয় উদ্দেশ্য নিয়েছেন; বরং তা ফরজে কেফায়া। এ জাতীয় ব্যাখ্যা ছাড়া তাদের ব্যাপারে অন্য কোনো ধারণা পোষণ করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না।

হাসান আল-বান্না রাহিমাহুল্লাহ জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে ইসলামের বক্তব্য পর্যালোচনা করার পর বলেন,

ها أنت ذا ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين و مقلدين سلفيين و خلفيين على أن الجهاد فرض كفاية

"এসব বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আপনিই বলবেন যে, পূর্ববর্তী-পরবর্তী মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদ সকলে কীভাবে দাওয়াত প্রসারের জন্য মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন![২]

আক্রমাণাত্মক জিহাদ ফরজে কেফায়া হওয়ার ব্যাপারে যে আলোচনা করেছি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন যথেষ্ট পরিমাণ লোক তা পালন করবে তখন অবশিষ্টরা গোনাহমুক্ত হয়ে যাবে। এটাই অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য। কিছু কিছু সালাফে সালেহের মত হলো, আক্রমণাত্মক জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের মতই ফরজে আইন। এটি কতক সাহাবি ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য।

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

قد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله عز وجل (انفروا خفافا و ثقالا) العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا، منهم أبو أيوب الأنصاري و المقداد ابن الأسود وغيرهم ... رضي الله عنهم.

انفروا خفافا و ثقالا এ আয়াতের নির্দেশ থেকে কিছু সাহাবি ব্যাপক অর্থ বুঝেছেন। এ জন্য তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ থেকে পেছনে থাকেননি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবু আইয়ুব আনসারি, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাযিআল্লাহু আনহু প্রমুখ"।[৩]

---

২. আল-জিহাদ লিল-বান্না:৮৪

৩. ফাতহুল বারী:৬/২৮

انفروا خفافا و ثقالا এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة : "كهولا وشبابا، ما سمع الله عذر أحد" ثم خرج إلى الشام حتى قتل...

وفي رواية: قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية "انفروا خفافا و ثقالا" فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبابا. جهزوني يا بني.. فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات،... فنحن نغزو عنك. فأبى، فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسع أيام، فلم يتغير فدفنوه بها

"আলী ইবনে যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ আনাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে আবু তালহা রাযিআল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যুবক-বৃদ্ধ (সবাই বেরিয়ে পড়বে) আল্লাহ তাআলা কারো ওযর শুনবেন না। এরপর তিনি শামের উদ্দেশ্যে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন এবং শহিদ হয়ে গেলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু তালহা রাযিআল্লাহু আনহু সূরা বারাআ তিলাওয়াত করতে করতে যখন انفروا خفافا وثقالا এ আয়াত পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন তখন বললেন, আমাদের প্রতিপালককে দেখছি বৃদ্ধ-যুবক সকলকেই জিহাদে বেরিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন!... তাহলে তোমরা আমাকে প্রস্তুত করো। ছেলেরা বললো, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন আপনি তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ করেছেন আবু বকর-উমরের সাথেও তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ করেছেন...। সুতরাং এখন আমরাই আপনার পক্ষ থেকে জিহাদ করছি। তিনি অস্বীকার করলেন। রওয়ানা হয়ে গেলেন সমুদ্রপথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে)। ঘটনাক্রমে সে পথেই মারা গেলেন। তো লোকেরা তাঁকে দাফন করার মতো কোনো দ্বীপ পাচ্ছিলো না। পরিশেষে নয় দিন পর জায়গা মিললো সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর দেহ কোনো রূপ বিকৃত হয়নি।

'আল-ইসাবা এ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তা আবু তালহা রাযিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়াতটির সঠিকতাকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি বলেন,

قال ثابت عن أنس مات أبو طلحة غازيا في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة ايام و لم يتغير. أخرجه الفسويّ في تارخه وأبو يعلى وإسناده صحيح...

"আনাস রাযি. থেকে সাবেত রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আবু তালহা রাযিআল্লাহু আনহু সমুদ্রে জিহাদ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন, তখন লোকেরা তাঁকে দাফন দেয়ার মত কোনো দ্বীপ পাচ্ছিলো না। পরিশেষে নয়দিন পর পাওয়া গেলো। তখনও পর্যন্ত তাঁর লাশ কোনো রকম বিকৃত হয়নি। ফাসাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ তার তারিখের মধ্যে এ বর্ণনাটি নিয়ে এসেছেন। সেইসাথে এটি বর্ণনা করেছেন আবু ইয়ালা রাহি.ও। তাঁর সনদটি সহিহ"।[১]

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

إن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه.

"কাফেরদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি প্রত্যেক মুসলমানের উপর নির্ধারিত দায়িত্ব। তা হয়তো হাত দিয়ে, যবান দিয়ে, মাল দিয়ে কিংবা অন্তর দিয়ে"।[২]

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অত:পর ব্যাপকভাবে মুশরিকদের সাথে জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। প্রথমদিকে হারাম ছিলো অত:পর অনুমতি দেয়া হয়েছে তারপর মুশরিকরা যাদের সাথে কিতাল শুরু করে দিয়েছে তাঁদেরকে জিহাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়। পরিশেষে সকল মুশরিকদের সাথে জিহাদের ব্যাপক নির্দেশ দেয়া হয়। এক বক্তব্য অনুযায়ী তা ফরজে আইন অথবা প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তা ফরজে কেফায়া।

তবে বাস্তব কথা হচ্ছে জিহাদ ফরজে আইন। তা হয়তো অন্তর দিয়ে, যবান দিয়ে, মাল দিয়ে কিংবা হাত দিয়ে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উপর এ পদ্ধতিসমূহের যে কোনো পদ্ধতিতে জিহাদ করা ফরজ। নিজের জান দিয়ে

---

[১]. আল-ইসাবা: ১/৫৬৭

[২]. ফতহুল বারী: ৬/২৮

জিহাদ করা ফরজে কেফায়া। মাল দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে সঠিক মত হলো ফরজ; কেননা কুরআনে কারিমে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার নির্দেশ একই রকম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

انفروا خفافا و ثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون .

"তোমরা বেরিয়ে পড়ো স্বল্প ও প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেরদের মাল ও জান দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা বুঝতে"।[১]

জাহান্নাম থেকে মুক্তি, গোনাহের ক্ষমা এবং জান্নাতে প্রবেশ করার বিষয়কে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী,

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله و رسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.

"মুমিনগণ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিবো না যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বোঝো। তিনি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখেল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য"।[২]

ইবনে মুসায়্যাব এবং ইবনে শুবরুমাহ থেকে বর্ণিত ওজরগ্রস্ত অবস্থায়ও জিহাদ করা ফরজ।

তবে প্রসিদ্ধ মত হল মহান আল্লাহ যাদেরকে ওযরগ্রস্ত করেছেন তারা পিছিয়ে থাকার কারণে গুনাহগার হবেন না।

---

১. সূরা তাওবা: ৪১

২. সূরা সাফ: ১০-১২; যাদুল মাআদ:৩/৭২

এখন প্রশ্ন হলো মুসলমানরা এ ফরজ দায়িত্ব কীভাবে আদায় করবে? মুসলমানদের উপর কি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মাসেই ফরজ নাকি প্রত্যেক বছরে নাকি অন্য কোনো ভাবে? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দুটি অভিমত রয়েছে,

প্রথম অভিমত:

কমপক্ষে প্রতিবছরে একবার জিহাদ করা ফরজ। আর সর্বসম্মতি ক্রমে এরচেয়ে বেশি জিহাদ পরিচালনা করা অতিউত্তম। বাকিগুলো নফল হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে তাঁদের দলীল হলো জিযিয়া ওয়াজিব হয় জিহাদের বদলা হিসেবে আর জিযিয়া বছরে একবারের বেশি ওয়াজিব হয় না। সুতরাং বদলাও এমনই হওয়া চাই। কোন বছর জিহাদ মুক্ত থাকা এটা জায়েজ নয়। কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমামের উপর জিহাদী কাজের দ্বিতীয় আরেকটি ফরজ দায়িত্ব হলো প্রত্যেক বছর শত্রুর মুকাবেলায় একটি অভিযান প্রেরণ করবে। নিজে সেখানে অংশগ্রহণ করবে অথবা বিশ্বস্ত কাউকে পাঠাবে যাতে শত্রুদলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে পারে তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে পারে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে পারে এবং আল্লাহর দ্বীনকে তাদের উপর বিজয়ী করতে পারে যতক্ষণ না তারা ইসলামে দাখিল হয় কিংবা নিজেদের হাতে জিযিয়া প্রদান করে। আরেক প্রকার জিহাদ আছে যার নাম নফল জিহাদ। তা হলো, ইমাম একের পর এক দল পাঠিয়ে সুযোগ বুঝে অভিযান প্রেরণ করবে। স্পর্শকাতর জায়গায় প্রহরার ব্যবস্থা করবে এবং শক্তি প্রদর্শন করবে"।[৩]

তবে যদি কোন শরয়ী ওজর থেকে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন মুসলিমগণ দুর্বল হয়ে পড়া। শত্রু সংখ্যা বেশি হওয়া। মুসলমানদের নির্মূল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর এ বিধান তখনই যখন মুসলিমগণ সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেবে।

সুতরাং যদি কোন জরুরত কিংবা কোন ওজর না থাকে তাহলে কোন অবস্থাতেই একটি বছরও সম্মুখ যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা বৈধ হবে না। আর এটা ইমাম শাফেয়ী এবং তার অনুসারীদের মত।

---

৩. তাফসিরে কুরতুবী: ৮/১৫২

আর আলেমগণ প্রতি বছরে অন্তত একবার জিহাদ পরিচালনার যে কথা বলেছে তা সাধারণ অবস্থার ভিত্তিতে। কেননা প্রতি বছরে অন্তত একবার জিহাদের রসদ পত্র যোগার করা এবং বাহিনী প্রস্তুত করা অতি সহজেই করা যায়।

ইবনে কুদামা আল মুগনী গ্রন্থে বলেন, প্রতি বছরে অন্তত একবার জিহাদ পরিচালনা করা। আর এটি ফরজ। তবে কোন ওজর থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। আর যদি কোন বছরে একবারের বেশি জিহাদ পরিচালনার প্রয়োজন দেখা যায় তাহলে সেটাও ফরজ হবে। ফরজে কেফায়া। সুতরাং যত সংখ্যক লোক প্রয়োজন হবে তাদের সবার উপর জিহাদ ফরজ হবে।[১]

শিশু, পাগল, মহিলা, এবং যুদ্ধ থেকে বিরত রাখে এমন অসুস্থ ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজ হবে না।

এক চক্ষু অন্ধ, মাড়ির রোগে আক্রান্ত, মাথা ব্যথায় আক্রান্ত, সাধারণ জ্বরাক্রান্ত এবং খোঁড়া ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজ হবে।[২]

সন্তানের জন্য পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ বৈধ নয়। অনুমতির ক্ষেত্রে পিতামাতার অবর্তমানে দাদা-দাদি তাদের স্থলাবর্তী হবেন। তবে যদি জিহাদ শুরু হয়ে যাওয়ার পর পিতা-মাতা জিহাদে অংশগ্রহণে নিষেধ করেন তাহলে সন্তানের জন্য জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করা বৈধ হবে না।[৩]

দ্বিতীয় অভিমত:

সময় নির্ধারণ করা ছাড়া কাফের ভূখণ্ডে কাফেরদের সাথে যখন সম্ভব হয় তখনই যুদ্ধ করা ওয়াজিব। ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ এ বক্তব্য সম্পর্কে বলেন, وهو قويّ এ অভিমতটি শক্তিশালী"।[৪]

কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

---

১. আল মুগনী- ইবনে কুদামা রা. ৮-৩৪৮

২. আল মুগনী- ইবনে কুদামা রা. ৮-৩৪৭-৩৪৮

৩. আল মুগনী- ইবনে কুদামা রা. ৮-৩৫৮-৩৫৯

৪. ফাতহুল বারী: ৬/২৮

,التثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرام

"বিতৃষ্ণা প্রকাশের মাধ্যমে জিহাদকে কঠিন মনে করা হারাম"।[৫]

এ বক্তব্যটি যদিও অধিকাংশের বক্তব্য নয়; তথাপি আমার দৃষ্টিতে এর মাধ্যমেই দায়িত্বমুক্ত হওয়া সম্ভব। আল্লাহ তাআলাই সঠিকতা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তার কারণ এই,

১. জিহাদ নির্দেশিত নসগুলো কোনো সময় নির্ধারণ করে দেয়নি। সুতরাং সময় নির্ধারণ নসের উপর অতিরিক্ত করণের অন্তর্ভুক্ত। আর জিযিয়ার ব্যাপারে যে বক্তব্যটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা বছরে একবার ওয়াজিব হয় যা জিহাদের বদলে নির্ধারিত যুক্তিটি মেনে নেয়া যায় না। জিযয়া একটি স্বতন্ত্র শরঈ বিধান। যার পেছনে রয়েছে অনেক হেকমত। যেমন এর মাঝে রয়েছে কাফেরদের অপমান, মুমিনদের সম্মান। কাফেরদেরকে ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী মুসলমানদের সাথে উঠাবসা করার সুযোগ দেয়া হয়; তাদের মধ্যে যে কল্যাণকে বুঝতে চায় সে যেন ইসলামের আদর্শপূর্ণ বিধিবিধান দেখে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং জিযিয়া সাধারণভাবে জিহাদের বদলে আবশ্যকীয় বিধান এ কথা বলা যাবে না। মুসলমানরা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি করতে পারে সন্ধির সময়ে তাদের সাথে কিতাল করতে পারে না তাই বলে সন্ধিকে জিহাদের বিকল্প বলা যায় না।

২. কাফেরদের সাথে কাফের ভূখণ্ডে জিহাদ করতে হবে যখনই সম্ভব হয় এটি জিহাদের উদ্দেশ্যের উপযুক্ত একটি মত। কেননা জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হলো, যমিন থেকে বিশৃঙ্খলা দূর করা এবং গোটা পৃথিবীতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। জিহাদের ফরজ দায়িত্ব মুসলমানদের পক্ষ থেকে ততক্ষণ আদায় হবে না যতক্ষণ না চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হয়। আর তা হলো গোটা পৃথিবীর কর্তৃত্ব হাতে নেয়া। এমনকি একজন ব্যক্তিও এমন থাকবে না যে ইসলামের হুকুমের সামনে মাথা নত করেনি।

অথবা তারা জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে তাদের চেষ্টা ব্যয় করে যাবে। তখনই কি তাদের ওয়াজিব দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে? না; কারণ

---

৫. কুরতুবী:৮/১৪১

জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারিত একটি বিষয়। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এ কথা বলা যাবে যে, তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছে। আর আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

এই জন্য ইবনে হাজার রাহি.জিহাদ যখন সম্ভবপর হয় তখন ওয়াজিব এ বক্তব্য সম্পর্কে বলেন এটিই শক্তিশালী অভিমত যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সেইসাথে বছরে একবার অভিযানে বের হওয়ার দ্বারা ফরজ দায়িত্ব আদায় হয়ে যায় এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, অনেক সময় মুসলমানদের শাসনভার এমন ব্যক্তির হাতে পড়ে যায় জিহাদ বিষয়ে শিথিলতা পোষণের ব্যক্তি ইসলাম প্রচার কাজে যাদের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ ইখলাস থাকে না। তাছাড়া বছরে মাত্র একটি অভিযান প্রেরণ করাকে ওয়াজিব দায়িত্ব আদায়ের জন্য যথেষ্ট হিসেবে গণ্য করা যায় না। যার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট ইসলামের কোনো কোনো যুগে কিছু কিছু মুসলিম শাসকের দুর্বল সময়কাল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ রেখে অনর্থক কাজে তাদের পড়ে থাকা।

৩. কাফেরদের সাথে যুদ্ধের বিষয়টি সম্ভব হওয়ার সাথে জুড়ে দেয়া নির্দিষ্ট সময়ের সাথে জুড়ে দেয়ার চেয়ে উত্তম। কেননা জিহাদের অর্থ হলো, কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ করতে গিয়ে নিজের চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। জিহাদের সম্পর্ক নির্দিষ্ট কোনো এক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় যে তাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। বরং মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হলো, সক্ষমতার সময় তাঁদের পার্শ্ববর্তী কাফেরদের সাথে জিহাদ করা। ইবনে আবিদীন রাহিমাহুল্লাহ রদ্দুল মুহতারের টিকায় উল্লেখ করেন,

وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا

‘তুমি এসব অলিক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো যেমন ধরো, রোমানদের জিহাদ করার দ্বারা হিন্দবাসীদের পক্ষ থেকে জিহাদের ফরজ দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে”।[১]

উলামায়ে কেরামের ভাষ্য মতে যেসব অবস্থায় কাফেরদের সাথে তাদের ভূখণ্ডে জিহাদ করা ফরজে আইন তা এই,

১. হাশিয়া রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪

১. যখন মুসলিম বাদশাহ নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে জিহাদের জন্য নির্ধারণ করে দেবেন।

২. যখন জিহাদের ব্যাপক নির্দেশ আসবে। এভাবে যে, বাদশা কোনো গ্রামবাসী বা কোনো এলাকার সকলকে জিহাদে বের হতে বলেন।

৩. যখন মুসলমানদের কোনো ব্যক্তি কাফেরদের হাতে বন্দি হয় তখন তাদের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনার আগ পর্যন্ত জিহাদ ফরজ।

৪. কাফেরদের সাথে কিতাল চলাকালে যখন কোনো মুসলমান মুসলিম বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়, তখন তার উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।

মুসলমানদের উপর আক্রমণাত্মক ও প্রারম্ভিক জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত:

১. মুকাল্লাফ (যার উপর শরীয়তের বিধিবিধান আরূপিত হয়)।

২. ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকা।

৩. পুরুষ হওয়া।

৪. সক্ষমতা।

এসব শর্তের আলোচনা ফিকহী কিতাবগুলোতে ভরপুর রয়েছে।

এতক্ষণ আমরা যে বিষয়টি উলামায়ে কেরাম সূত্র দিয়ে আলোচনা করলাম তা অনেক দীর্ঘ। এখানে শুধু আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরজ হওয়ার বিষয়টি তাদের কিছু হাওয়ালা এনে প্রমাণ করা হয়েছে। যদিও আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে তাদের অনেক বক্তব্য ও বিপুল পরিমাণ দলীল রয়েছে। তারপরও ইলমের দাবিদার কিছু লোককে আল্লাহ তাআলা অন্ধ বানিয়ে রেখেছেন। তারা জিহাদ বলতে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদই বুঝে। তারা জিহাদকে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। নসসমূহের গলা চেপে ধরে, উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের এদিক সেদিক ব্যাখ্যা দিয়ে আক্রমণাত্মক জিহাদ ও কাফেরদের সাথে কাফেরভূখণ্ডে জিহাদ করা ফরজ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার চেষ্টা চালিয়েছে। কখনো তারা

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

"তোমরা আল্লাহর পথে কিতাল করো তাদের সাথে, যারা তোমাদের সাথে কিতাল করে। আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"।

আল্লাহর এ আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে। কখনো তারা ইসলামের সরলতাকে ব্যবহার করে বলে, আল্লাহর বাণী لا إكراه في الدين দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ী নেই। ইসলাম মানুষদেরকে বাধ্য করেনি সেখানে প্রবেশ করতে। ইসলাম বলেনি বল প্রয়োগ করে ইসলামে দাখেল করার জন্য কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে তাদের ভূখণ্ডে গিয়ে তাদের সথে যুদ্ধ করতে এসব উক্ত আয়াত বিরোধী কাজ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যা দাবি করে বলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিযানগুলো প্রতিরক্ষামূলক ছিলো আক্রমণাত্মক ছিলো না। ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক দলীল ও অলিক ধারণার মাধ্যমে তারা এমন বিধানকে মিটিয়ে দিতে চায়, যে ব্যাপারে রয়েছে মুতাওয়াতির নস, উলামায়ে কেরামের অগনিত বক্তব্য, আর যুগ যুগ ধরে উম্মতের আমল। তার অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির অবস্থার মত, যে সূর্যের আলোকে হাতের তালু দিয়ে ঠেকাতে চায়।

বর্তমানে জিহাদ সকলের জন্য ফরযে আইন।

কারনঃ

আরাকানী মুসলিমদের উপর যখন সেখানকার কাফেররা হামলা করেছে, তখন সর্বপ্রথম তাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। কিন্তু তারা যেহেতু মোকাবিলা করছে না বা শত্রুর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, তাই পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে আমাদের বাংলাদেশের সকল ওযর মুক্ত মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমগণ যদি ভীতি কিংবা অলসতা বশত এই ফরয আদায় না করে, তাহলে পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্ব পার্শ্ববর্তী অন্য মুসলিমদের উপর অর্পিত হবে। এবং এই ধারাহিকতায় সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। অবশ্য সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর অনেক পূর্ব থেকেই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে রয়েছে। কারন, ১৪৯২ ইং সালে দারুল ইসলাম আন্দালুস তথা বর্তমান স্পেন খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যওয়া, ১৯৪৭ সালে

নরকের কীট গো-মূত্রপায়ী হিন্দুবাদী ভারত কতৃক ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীর অক্রান্ত হওয়া, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে উসমানি খেলাফত পতন হওয়া, ২০০১ সালে দাম্ভিক আমেরিকা কতৃক ইরাক ও আফগানের মুসলিমগণ অক্রান্ত হওয়াসহ নানাবিধ কারনে কয়েক শতক পূর্ব থেকেই সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর জিহাদ ঐ রকম ফরয হয়েছে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরযে আইন।

সুতরাং উলামায়ে উম্মাহের দায়িত্ব হল, উম্মাহকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া যে কাশ্মির, ফিলিপাইন, চেচনিয়া, মধ্য এশিয়া, ইরাক, সিরিয়া, আরব উপদ্বীপ, সোমালিয়া, ইসলামী মাগরেব এবং তুর্কিস্তানের জিহাদ হলো সকল মুসলমানের উপর ফরজে আইন। যতক্ষণ মুসলিমদের এলাকাগুলো থেকে আগ্রাসী কাফেরদের বিতাড়িত করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন না হচ্ছে ততক্ষণ এ বিধান বজায় থাকবে।

আখেরি গুজারেশ

আমি তো গাযওয়ায়ে হিন্দের জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই?

আমি কিভাবে জিহাদ করব?

আমি কোথায় জিহাদ করব?

কার সাথে জিহাদ করব?

কারা হক্ক দল?

আমি কিভাবে জিহাদ করতে পারি?

এখন কি জিহাদ করা সম্ভব?

প্রশ্নের উত্তরে যাবার আগে কিছু জরুরি আলোচনা সেরে নেয়া দরকার। সবার আগে আমাদের বর্তমানে জিহাদের কনসেপ্ট ভালো ভাবে বুঝতে হবে। আমরা সাধারণ ভাবে জিহাদ বলতে বুঝে থাকি "কিতাল"। যেটাকে "আর্মড কমব্যাট" ও বলা যেতে পারে। সশস্ত্র যুদ্ধ। এটা জিহাদের একটা কাজ অবশ্যই কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ জিহাদ না। তাই বিষয়গুলো আমাদের আগে ভালো ভাবে জেনে নেয়া দরকার।

১। গ্লোবাল জিহাদ মডেল:

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে জিহাদ চলমান তা হচ্ছে জিহাদের গ্লোবাল মডেল। অর্থাৎ সারা দুনিয়াব্যাপী জিহাদ একই মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে। এই বিষয়টি জানা দরকার এজন্য যে, আমাদের জিহাদি যে কোন কাজ গ্লোবাল জিহাদের বাইরে নয়। অর্থাৎ আপনি একা

করেন বা কোন দলের সাথে করেন আপনার জিহাদি কাজ এমন হওয়া দরকার তা যেন গ্লোবাল জিহাদের কাজের সহায়ক হয়। এই জিহাদের কাজ যদিও অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু দিন শেষে প্রতিটি কাজ একই মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য। যেমন একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কুফরের সর্দার আমেরিকার স্বার্থে আঘাত করা। এটি একটি মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এখন আলাদা আলাদা ভূখণ্ডের জন্য এই উদ্দেশ্য অর্জনের পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। এটি জরুরি নয় যে, প্রতিটি ফ্রন্টে একই কৌশলে কাজ করতে হবে। এছাড়া গ্লোবাল জিহাদ মডেলের জন্য এটিও জরুরি নয় যে, আপনাকে কোন দল বা জামাতের সাথে যুক্ত হতেই হবে। যদি আপনি কোন হকপন্থি জিহাদি জামাত বা দলের সাথে যুক্ত হতে পারেন তবে তা সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু আপনি যদি কোন হকপন্থি জিহাদি জামাতের সাথে যুক্ত হতে নাও পারেন তবুও আপনার জন্য জিহাদের কাজ বন্ধ নয় বরং আপনি নিজে একাকী মুজাহিদ (ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় Lone Wolf) বা কয়েকজন সমমনা দ্বীনী ভাইকে সাথে নিয়ে উলফ প্যাক হিসেবে কাজ করতে পারেন।

২। ইম্প্রোভাইজড আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার:

এটাও আমাদের জানা জরুরি যে, আমাদের বর্তমান জিহাদের ধরন কেমন? এই জিহাদ কোথাও কনভেনশনাল (প্রথাগত যুদ্ধ), আবার কোথাও গেরিলা ওয়ারফেয়ার। তবে অধিকাংশ জায়গায় এই যুদ্ধ গেরিলা ওয়ারফেয়ার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার। তাই আমাদের এটাও জানা জরুরি যে, গেরিলা ওয়ারফেয়ার কেমন হয়, বিশেষ করে আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার। এ ব্যাপারে আরো জানার জন্য এই বইটি দেখতে পারেন Mini Manual of :he Urban Guerrilla By Carlos Marighella| একজন গেরিলা যোদ্ধার কিছু মৌলিক চাহিদা আছে। আর সেগুলোকে এক কথায় প্রকাশ করার জন্য বলতে হয় একজন গেরিলা যোদ্ধাকে প্রায় সকল বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়। বর্তমানের জিহাদ আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ারের ইম্প্রোভাইজড ভার্শন। অর্থাৎ এটি আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার, কিন্তু প্রতিনিয়ত এটি শত্রুর চালের সাথে সাথে এর কৌশল এবং প্রায়োরিটি ইম্প্রোভাইজড করে চলেছে।

৩। ফ্রন্টের ধরন :

ভূমির ধরন। যে কোন যুদ্ধের জন্যভূমির ধরন বা সে এলাকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ারে ভূমির ধরন বা বলতে সাধারণত ভূমির ভৌগলিক অবস্থার বিবরণ বুঝায়। কিন্তু গেরিলা ওয়ারফেয়ারে বা আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ারে এটি আরো বেশি কিছু বুঝায়। বর্তমান দুনিয়াতে ভূমির ধরন অনুযায়ী জিহাদের ময়দানগুলোকে (ফ্রন্টগুলোকে)কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, কিছু ফ্রন্ট আছে যেগুলো সরাসরি কিতাল বা আর্মড কমব্যাট এর জন্য উপযুক্ত। কিছু আছে যেগুলো সরাসরি আর্মড কমব্যাট বা কিতালের জন্য উপযুক্ত না কোন ভাবেই না। বরং সে এলাকাগুলো সাপোর্টিং ল্যান্ড হিসেবেই বেশি উপযুক্ত। অর্থাৎ ঐ সমস্ত এলাকাগুলো "আর্মড কমব্যাটের" জন্য উপযোগী না। বরং অন্য কোন ফ্রন্টের জন্য সাপোর্টিং ল্যান্ড হিসেবে কাজ করার জন্য বেশি উপযুক্ত। কোন ল্যান্ড কি কাজের জন্য উপযুক্ত তা কিছু বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। যেমন,

- ভূমির অবস্থা (পাহাড়ী, সমতল, মরুভূমি)।

- জনগণের অবস্থা (জিহাদের পক্ষে, জিহাদের বিপক্ষে)।

- শাসকের ক্ষমতার অবস্থা (ক্ষমতার প্রয়োগ বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে কেমন?)

এবং এ রকম আরো কিছু বিষয়ের উপরে নির্ভর করে কোন একটি ফ্রন্টের কাজের ধরন কেমন হবে। এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে জানার জন্য "Managemen: Of Savagery - By Abu Bakr Nazi - এই বইটি পড়ে নিতে পারেন।

৪। শত্রু সম্পর্কে জানা :

“If you know :he enemy and know yourself, you need no: fear :he resul: of a hundred ba::les. If you know yourself bu: no: :he enemy, for every vic:ory gained you will also suffer a defea:. If you know nei:her :he enemy nor yourself, you will succumb in every ba::le.”

"তুমি যদি তোমার শত্রুর সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কে জানো তবে ১০০ যুদ্ধ হলেও তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। তুমি যদি শুধু নিজেকে জানো কিন্তু শত্রুর ব্যাপারে না জেনে থাকো তবে প্রত্যেক বিজয়ের সাথে তুমি পরাজয়ও পাবে। তুমি যদি শত্রু এবং নিজের উভয় ব্যাপারেই না জেনে থাকো তবে তুমি প্রত্যেক যুদ্ধেই পরাজয়ের স্বাদ পাবে"।

— সানজু দা আর্ট অফ দা ওয়ার

এখানে মূল যে বিষয়টি জানা দরকার তা হচ্ছে শত্রু কিভাবে দুনিয়াব্যাপী জিহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। সত্যি বলতে এটি অনেক বিশদ আলোচনা। এই বিষয়টিকে ভাসমান বরফ খন্ডের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ বরফের উপরে যা দেখা যায় পানির নিচে তারচেয়েও অধিক বিদ্যমান যা দেখা যায়না। ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার শক্তির যে ক্রুসেড দৃশ্যমান এরচেয়ে হাজার গুন বেশি চক্রান্ত অধিকাংশের সামনে অদৃশ্য। কাফেরদের এই ক্রুসেড শুধু "ট্যাঙ্ক" আর "এফ ১৫" এর নয়। বরং তাদের এই যুদ্ধের আরো বড় একটি ক্ষেত্র হচ্ছে "ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড"। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কে পরিবর্তন করে দেয়া। এবং এটিই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ। কারণ আপনি ট্যাঙ্ক দেখতে পাবেন, কিন্তু তাদের এই চক্রান্ত আপনার চোখে সাধারণভাবে ধরা পড়বেনা। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে - মুজাহিদদের শক্তির একটা বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায় শুধুমাত্র এই সন্দেহ দূর করতে যে, "এখন কোন জিহাদ নাই"! সারা দুনিয়াব্যাপী এখন জিহাদের আরেক রুপ হচ্ছে "মিডিয়া জিহাদ"। বাস্তবতা হচ্ছে মিডিয়া এখন জিহাদের ৮০ ভাগ কিংবা আরো বেশি। আর এটির কারণ হচ্ছে শত্রুর আক্রমণের বড় একটা অংশ হচ্ছে মিডিয়া কেন্দ্রিক। শত্রুদের যুদ্ধের অন্যতম একটি কৌশল হচ্ছে "সাইকোলজিক্যাল ওয়ার"। আপনি যদি মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন বর্তমান সমাজে এই জিহাদ বিমুখীতা এবং জিহাদের ব্যাপারে অপব্যাখ্যার মূল কারণ হচ্ছে এই "সাইকোলজিক্যাল ওয়ার" বা "প্রোপাগান্ডা"। প্রত্যেকটি যুদ্ধের জন্য একটি আদর্শ দরকার হয়। যে আদর্শের জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফেররা পরিষ্কার ভাবে জেনে গেছে যে, মুসলিমদের ঈমান এবং আকিদাহ কে বোমা এবং গুলি দিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই তারা বেছে নিয়েছে ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড। এখন তারা আকিদাহ কে শেষ করতে চায়না তারা চায় আকিদাহ কে পরিবর্তন করে

ফেলতে। আল্লাহ বলেছেন (ভাবার্থে) কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা, তারা কক্ষনো তোমাদের বন্ধু নয়। অথচ মুসলিম এখন কাফেরদেরকেই বেশি আপন মনে করে! অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমাদের উপরে কোন হামলা হলে, আমরা মনে করি আমাদের কাফের বন্ধুরাই আমাদের নিরাপত্তা দিবে! নাউজুবিল্লাহ!

আপনি জিহাদ করতে চাইলে উপরের ৪ টি বিষয় খুব ভালো ভাবে জানা থাকতে হবে! কারণ এই ৪ টি বিষয়ের উপরে নির্ভর করবে আপনার পরবর্তী কাজের ধরন কেমন হবে।

যেমন আপনি যদি "গ্লোবাল জিহাদ মডেল" ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে কোথায় জিহাদ করব? এই প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই বের করে নিতে পারবেন।

আপনি যদি "শত্রু সম্পর্কে জানা" বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিতে পারেন তাহলে কিভাবে জিহাদ করব? এই প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই বের করে নিতে পারবেন!

আমি জিহাদ করতে চাই কিন্তু তা কিভাবে?

১। নিয়ত

সর্বপ্রথম আপনি নিজের নিয়ত ঠিক করবেন। ঠিক কেন এবং কি ব্যক্তি আপনি জিহাদ করতে চান? কারণ প্রত্যেক কাজ তার নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। আপনি বিশ্বাস করেন কিংবা না করেন আপনার জিহাদের কাজের জন্য কোন জিহাদি দল, কমান্ডার বা কোন শায়েখ কোন উপকারেই আসবেন না যতক্ষণ না আপনার নিয়ত ঠিক হবে। কারণ এই পথে চলার জন্য আপনার আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য দরকার হবে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন মুজাহিদের পক্ষে সফলতার দিকে এক কদমও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়! তাই সবার আগে আপনি আপনার নিজের নিয়ত ঠিক করে নেন।

২। ইলম

-এরপরেই সবার আগে যা দরকার তা হচ্ছে ইলম। আপনি যা কিছুই করেন না কেন তার আগে আপনার সে বিষয় ইলম দরকার। আপনি যদি সত্যি

জিহাদ করতে চান তবে জিহাদের ব্যাপারে ইলম অর্জন করুন। অন্তত এটি সবার আগে আপনার জানা দরকার আপনি কেন জিহাদ করবেন? জিহাদের এই পথ সোজা নয় এবং সংক্ষিপ্তও নয়, এই লম্বা কঠিন সফরের জন্য আপনার দরকার হবে ইলম। আপনি যথাসম্ভব জিহাদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার চেস্টা করুন। এবং অবশ্যই তা কুরআন এবং হাদিস দিয়ে শুরু করুন। ইলম শুধু অর্জনের জন্য নয় বরং যা কিছু শেখার তাউফিক আল্লাহ দিবেন তা আমল শুরু করুন। আমল ব্যতীত ইলম কোন উপকারে আসতে পারেনা।

৩। আনসার কিংবা মুজাহিদ

জিহাদের জন্য দুটি আবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে আনসার এবং মুহাজির। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন আপনি কি একজন মুহাজির হতে পারবেন? নাকি একজন আনসার। আনসার অর্থ আপনি কোন একজন মুহাজির বা মুজাহিদ ভাই এর আনসার হবেন। আপনি আপনার অর্থ সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি যা কিছু আছে তা দিয়ে জিহাদের আনসার হবেন। অথবা আপনি হিজরত করবেন কিংবা একজন মুজাহিদ হবেন। সবাই মুহাজির হতে পারবে এমন কথা নাই আবার সবাই আনসার হবে এমন না। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেন আপনি কোন কাজ উত্তম ভাবে করতে পারবেন? যেটি আপনার জন্য উত্তম মনে হচ্ছে আপনি সেটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। যদি আপনি মনে করেন আপনি হিজরত করে মুহাজির হতে পারবেন তবে আপনি হিজরতের প্রস্তুতি নেন। আর যদি আপনি মনে করেন আপনি আনসার হতে পারবেন তবে আপনি নিজেকে একজন মুহাজির বা একজন মুজাহিদকে পালন করার প্রস্তুতি হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করুন।

মুহাজির হিসেবে প্রস্তুতির মানে কি? অর্থাৎ আপনি নিয়ত করেন আপনি হিজরত করবেন এবং এর জন্য যা যা করা দরকার তার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। অনেকে প্রশ্ন করেন কিভাবে হিজরত করবো? প্রশ্ন হিসেবে এটি অসঙ্গত নয় তবে আমি এবং আপনি যে ময়দানে আছি সে ময়দানের প্রেক্ষিতে এ প্রশ্নটি একটু জটিল। আপনাকে একটি বিষয় বুঝতে হবে জিহাদ সোজা না। এটা জিহাদ এখানে কষ্ট আছে চ্যালেঞ্জ আছে। এই পথে

অনেকটাই আপনাকে নিজে নিজে হাঁটতে হবে। এতে আপনার মন খারাপ করার বা কষ্ট পাবার কিছু নাই। কেন? কারণ আপনিই প্রথম না বরং আপনার মতই সবাই এরকম ভাবেই শুরু করে। আপনাকে শুরু করতে হবে এবং বাকি ব্যবস্থা আল্লাহ্ আস্তে আস্তে করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় বিষয় মানুষ বিদেশে স্কলার শিপের জন্য কত কিছু করে। বাইরের একটা চাকরির জন্য কত আবেদন করে। তাহলে জিহাদ কেন এর ব্যতিক্রম হবে! আপনি যদি হিজরত করতে চান এই পথ আল্লাহ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ কিন্তু শুরুটা আপনাকেই করতে হবে। আমি হিজরত করতে চাই বলে এই আশায় বসে থাকা চলবেনা যে কেউ একজন এসে আপনাকে হিজরতের রাস্তা দেখিয়ে দিবে। বরং আপনি নিয়ত নিয়ে শুরু করেন দেখবেন আল্লাহ আপনার জন্য রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। এমনটাই বরাবর হয়ে থাকে।

আনসার হিসেবে প্রস্তুতির মানে কি? অর্থাৎ আপনি এখন মুহাজির বা মুজাহিদকে নিজের সমস্ত কিছু অপেক্ষা অধিক ভালোবাসবেন। আপনি আপনার সমস্ত কিছু দিয়ে সেই মুহাজির বা মুজাহিদ ভাই এর সমস্ত প্রয়োজন বিশেষ ভাবে সমস্ত জিহাদি প্রয়োজন পূরণ করার সাধ্যমত চেস্টা করবেন। হতে পারে আপনি সেই ভাইকে আপনার বাসায় রাখবেন কিংবা আপনার মেয়ের সাথে বিয়ে দিবেন কিংবা যে কোন প্রয়োজনে আপনি সেই ভাইয়ের জন্য এগিয়ে যাবেন যে কোন বিপদে আপনি ভাইয়ের সামনে ঢাল হয়ে দাড়াবেন এতে যদি আপনার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে হয় তবুও! এটিই হচ্ছে আনসারের কাজ। এখন আপনি নিজে ঠিক করে নিবেন আপনি কতটুকু পারবেন? কিভাবে পারবেন? হতে পারে আপনি আপনার বাসায় কোন মুজাহিদ ভাইকে রাখতে পারবেন না কিন্তু আপনি মাসে ২০,০০০ টাকা সাদাকাহ করতে পারবেন সেটাই করুন।

৪। দাওয়াহ

ইলম অর্জনের পরে আপনি যখন ঠিক করে নিলেন আপনি আনসার হবেন নাকি মুহাজির বা মুজাহিদ হবেন তখন অন্য প্রস্তুতির সাথে সাথে আপনি এবার দাওয়াতের কাজ শুরু করতে পারেন। এই দাওয়াতের বিষয়টি আসলে একটু ব্যাপক। আপনার মূল লক্ষ্য থাকবে চেতনা এবং আদর্শ

হিসেবে জিহাদের দাওয়াত দেয়া। কেননা কাফেরদের একটি চেষ্টা হচ্ছে চেতনা এবং আদর্শ হিসেবে জিহাদকে বিকৃত করে দেয়া। তাই আপনার কাজ হবে কাফেরদের সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়া। একই সাথে আপনি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তাওহিদের দাওয়াতও দিবেন। এভাবে আপনি আস্তে আস্তে ছোট ছোট তয়িফা বা গ্রুপ গঠনের চেষ্টা করবেন। আপনি তাদেরকে গড়ে তুলবেন এবং তাদের থেকে বিভিন্ন কাজ নিতে পারেন। তাদেরকে আনসার কিংবা মুজাহিদ বা মুহাজির হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। এছাড়া আপনি তাদেরকে বিভিন্ন জিহাদি কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেন যেমন হ্যাকিং, মিডিয়া ইত্যাদি। এই কাজটি আসলে অত্যন্ত ব্যাপক যদি আপনি তা এভাবে গ্রহণ করতে সাহসী এবং ইচ্ছুক থাকেন। এখানে বিষয়টি এমন যে আপনি নিজে একজন মুজাহিদ হিসেবে গড়ে উঠবেন এবং একই সাথে আরো অনেককে আপনার মত মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলবেন। প্রথম দিকে আপনি কি অর্জন করলেন তা দেখতে যাবেন না বরং আপনি শুধু এই চেষ্টা করবেন যত বেশি সম্ভব জিহাদের চেতনা এবং আদর্শকে প্রচার করা। জিহাদের আদর্শ মানে উগ্রতা নয়। এমনকি জিহাদ বুঝেন এমন অনেকে জিহাদের দাওয়াতকে উগ্রতা ভাবেন এক্সট্রিমিজম ভাবেন যদিও তারা মোটিভেটেড। কিন্তু আসলে আমি যা বলতে চাচ্ছি তা সেরকম কিছু না। আমি যখন বলছি জিহাদ একটি চেতনা তখন এটির উপস্থাপনা এমন সাবলীল এবং বাস্তবমুখী হতে হবে যেন মানুষ বুঝতে পারে জিহাদ আলাদা কোন বিষয় নয় বরং নিজের ঈমান এবং আকিদাহ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই জিহাদ অপরিহার্য। আর এই কাজ আপনি সবার আগে আপনার নিজের পরিবার থেকে শুরু করতে পারেন। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে আপনি হিজরতের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর এবং সে অনুযায়ী আপনি চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন অবস্থায় দাওয়াতি কাজ করলে আপনার হিজরতের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তবে আপনি ইস্তেখারা সাপেক্ষে দাওয়াতের কাজ বন্ধ রাখতে পারেন।

৫। জিহাদে অংশ গ্রহণের ৪৪ উপায়

জিহাদের অংশগ্রহণের প্রায় ৪০ এর অধিক উপায় আছে। শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি রাহিমাহুল্লাহ-এর বিখ্যাত লেকচার আছে - "44 Ways

of suppor:ing Jihad" এই লেকচারটি শুনে নিতে পারেন বা এই ম্যানুয়ালটি পড়ে নিতে পারেন। নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে ৪৪ টি পন্থাই আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

০১. জিহাদের জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা।

০২. শাহাদাত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

০৩. নিজের মাল দ্বারা জিহাদ করা।

০৪. মুজাহিদদের জন্য টাকা সংগ্রহ করা।

০৫. একজন মুজাহিদকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা।

০৬. একজন মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।

০৭. শহীদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।

০৮. জেলে বন্দি ভাইদের পরিবারগুলোর দেখাশোনা করা।

০৯. মুজাহিদদের যাকাত প্রদান করা (জিহাদের খরচ বাবদ)।

১০. মুজাহিদদের মনোবল বাড়ানো এবং তাদের উৎসাহ প্রদান করা।

১১. মুজাহিদদের চিকিৎসায় সাহায্য প্রদান করা।

১২. মুজাহিদদের সমর্থন করা এবং তাদের জন্য উঠে দাঁড়ানো।

১৩. পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যাচারের মোকাবিলা করা।

১৪. মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা।

১৫. জিহাদের ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহ প্রদান করা।

১৬. মুজাহিদদের নিরাপত্তা দেয়া এবং তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

১৭. মুজাহিদদের জন্য দোয়া করা।

১৮. জিহাদের খবর জানা এবং তা প্রচার করা।

১৯. মুজাহিদ এবং তাদের আলেমদের লেখনী প্রচার করা।

২০. মুজাহিদদের পক্ষে ফতোয়া দেয়া।

২১. আলেম এবং ইমামদের মুজাহিদদের তথ্য এবং খবর পৌঁছে দেয়া।

২২. শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করা।

২৩. অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেয়া।

২৪. প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেয়া।

২৫. জিহাদের ফিকহ্ ও মাসআলা জানা।

২৬. মুজাহিদদের রক্ষা করা এবং তাদেরক সাহায্য করা।

২৭. "আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা"-এই আকিদার বিকাশ করা।

২৮. মুসলিম বন্দীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করা।

২৯ . জিহাদি ওয়েবসাইট তৈরি করা।

৩০. আমাদের সন্তানদের জিহাদ এবং মুজাহিদদের প্রতি ভালবাসা শেখানো। ফতোয়া দেয়া।

৩১. বিলাসী জীবনযাপন এড়িয়ে চলা।

৩২. মুজাহিদদের কাজে লাগে এমন যোগ্যতা অর্জন করা।

৩৩. যে সব দল জিহাদের জন্য কাজ করছে তাদের সাথে যোগ দেয়া।

৩৪. হক আলেমদের দিকে অন্যদের এগিয়ে আনা।

৩৫. হিজরতের জন্য প্রস্তুত থাকা।

৩৬. আত্মিক প্রশিক্ষণ নেয়া।

৩৭. মুজাহিদদের নসিহাহ্ দেয়া।

৩৮. ফিতনা বিষয়ের হাদিস পড়া।

৩৯. বর্তমান যুগের ফেরাউন এবং তার জাদুকরদের মুখোশ উন্মোচন করা।

৪০. নাশীদ (জ্বিহাদী গজল) তৈরি করা।

৪১. শত্রুদের অর্থনীতি বর্জন করা।

৪২. আরবী শেখা।

৪৩. বিভিন্ন ভাষায় জিহাদি লেখনী অনুবাদ করা।

৪৪. "মুক্তি প্রাপ্ত দল"--এর বিশিষ্ট সম্পর্কে অন্যদের শিক্ষা দেয়া।

এবার আপনার নিজের জন্য যে কাজটি সবচেয়ে সহজ হয় সেটি দিয়ে শুরু করুন। এরপরে আস্তে আস্তে আরো বেশি উপায়ে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতে থাকেন। আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ্। এছাড়া জিহাদ যখন ফরজ তখন জিহাদের প্রস্তুতিও ফরজ। এখন আমার কিংবা আপনার এই বলে বসে থাকার কোন সুযোগ নাই যে, আমি তো জানিনা কিভাবে জিহাদ করব? আমি তো জানিনা কার সাথে জিহাদ করব? কিছু করতে না পারলেও অন্তত প্রস্তুতি নিতে হবে আনসার হিসেবে কিংবা মুজাহিদ বা মুহাজির হিসেবে।

আবারো বলছি জিহাদের ফরজিয়াত পূরণের জন্য কোন দল বা জামাতের সাথে অংশগ্রহণ জরুরি না। হক্বপন্থী দল বা জামাতের খোঁজে থাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দুয়া করতে হবে কিন্তু এই অপেক্ষায় বসে থাকা যাবেনা। এখানে একটি বাস্তবতা আমাদের বোঝা দরকার আমি কোন দলের সাথে যোগ দিব? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর আপেক্ষিক। একই সাথে যুদ্ধের ধরন অনুযায়ী ময়দানে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর আশা করা ঠিক না। মনে করেন, আপনি একটি গেরিলা ইউনিটের কমান্ডার। আপনাকে কেউ একজন ফেসবুকে নক দিয়ে বললো আমি আপনাদের ইউনিটে যোগ দিতে চাই কিভাবে জয়েন করবো? বা কোথায় জয়েন করবো? আপনি এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? নিরাপত্তার ব্যক্তি আপনার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব না। বাস্তবতাও তাই। আপনি যদি আশা করেন কেউ একজন আপনাকে বলে দিবে কিভাবে কি করতে হবে কোথায় জয়েন করতে হবে তাহলে আপনি ভুল করছেন। তাহলে আপনি হয়ত নিজেকে জানেন কিন্তু আপনার শত্রুকে জানেন না। এক্ষেত্রে আপনার কোন একটি সফলতা আসলেও তার সাথে একটি ব্যর্থতাও থাকবে।

সব শেষে আমি জিহাদ করতে চাই এটি বলা সবচেয়ে সোজা। এটি বলে সে অনুযায়ী আমল করা কঠিন সে অনুযায়ী আমল করে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ধরে রাখা সবচেয়ে কঠিন যতক্ষণ না আল্লাহ সহজ করে দেন। আপনাকে

এখুনি সব করে ফেলতে হবে এমন নয়। বরং আপনি নিজেকে প্রস্তুত করেন সময় নিয়ে। আপনি মনে রাখবেন আপনি যদি আল্লাহর সাথে সত্য থাকেন, আল্লাহও আপনার সাথে সত্য থাকবেন। আপনি যদি সত্যি জিহাদী কাফেলার সাথে শরীক হতে চান আপনাকে জামাতের সাথে শরীক করার দায়িত্ব আল্লাহর। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। তবে ভাবার বিষয় হচ্ছে একবার জামাতের দেখা পাবার পর আপনি সেই পরিস্থিতির জন্য কতটুকু প্রস্তুত! এমন অনেক ভাই আছেন যারা জিহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন কিন্তু যখন জিহাদের কঠিন বাস্তবতা সামনে হাজির হয়েছে তখন তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তারা এই কঠিন পথে পাড়ি দেয়ার সাহসটুকু যোগাড় করতে পারেননি, কিংবা পথিমধ্যে ঝরে গেছেন!

আপনার প্রতি আমার শেষ কথা আপনি মুজাহিদ হিসেবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং নিজেকে একজন মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলেন আর মুজাহিদদের সাথে মিলিয়ে দেয়ার জিম্মাদারি আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন -

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ

"আর যদি তারা (সত্যি) বের হবার (জিহাদের পথে) সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো (প্রস্তুতি গ্রহণ করত)। কিন্তু তাদের যাত্রা আল্লাহর পছন্দ নয় তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ দেয়া হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক"।[১]

কোন জামা'আর সাথে জিহাদ করবো? বাংলাদেশে কি উপযুক্ত জামা'আ আছে যারা সঠিকভাবে জিহাদ করছে?

এ প্রশ্নটি বহুল উচ্চারিত এবং একই সাথে যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ। জিহাদের মতো একটি ইবাদাত কোন জামা'আর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে করা হবে তা অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত যা নিয়ে প্রত্যেক

---

[১]. সূরা তাওবা ৯:৪৬

মুসলিমের আন্তরিকতার সাথে গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। তবে একই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে জিহাদের ফরয হবার হুকুমটি এ প্রশ্নটির উত্তরের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ কোন দেশে যদি জিহাদ ফরয হয় এবং এমন একটিমাত্র মুসলিম জামা'আ থাকে যারা জিহাদ করছে তবে সে জামা'আর মধ্যে ভুল-ক্রটি থাকলেও তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েই জিহাদ করতে হবে। জামা'আর মধ্যে থাকা ভুলক্রটির জন্য জিহাদ ছেড়ে দেওয়া যাবে না। যেমন ধরুন একজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহনের পর জানতে পারলো জুমু'আর সালাত ফরয। এখন দেখা গেল সে যেখানে থাকে সেটা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা হবার কারনে সেখানে কোন মাসজিদ নেই। সবচেয়ে কাছাকাছি মাসজিদ হল দুই গ্রাম পরে। আবার সে মাসজিদের ইমামের তাজউয়ীদ পুরোপুরি সঠিক না, কুর'আনের খুব বেশি অংশ তার হিফয করা নেই, মুসল্লীদের'ও 'ইলম-আমলের অবস্থা ভালো না। কিন্তু সেখানে জুমু'আর সালাত আদাইয়ের ফরয হুকুমটা আদায় হচ্ছে। এখন এ কমতি গুলোর জন্য এ নওমুসলিম ব্যক্তি এ জামাতের সাথে ফরয দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে পারে? অবশ্যই না, বরং এই নওমুসলিমের জন্য ফরয হল এই জামাতের সাথেই জুমু'আর সালাত আদায় করা, এবং পাশপাশি সাধ্যমত জামাতের 'ইলম-আমলের অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করা। আর যদি এ জামাতের অবস্থা এতোই খারাপ হয়, তারা যদি দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে এমনভাবে গোমরাহ হয় যে এদের সাথে ইবাদাত করা যাচ্ছেই না, তাহলে ওই ব্যক্তিকে নিজের একটি জামাত বানাতে হবে। কিন্তু ফরয ইবাদাত ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

বরং সালাফদের মধ্যে, তাবেয়ী ও তাবে-তাব'ঈনদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যারা খারেজি নেতার অধীনে রাওয়াফিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। যখন তাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কেন আপনারা জাহান্নামের কুকুরদের অধীনে জিহাদ করছেন?", তখন তাদের জবাব ছিল, "আমরা ইসলামের শত্রুদের অধীনের আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছি।" [বিস্তারিত জানতে দেখুন, "খাওয়ারিজ ও জিহাদঃ, শায়খ আবু হামযা আল-মাসরি ফাকাল্লাহু আসরাহু]। খাওয়ারিজরা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত না, তথাপি

সালাফদের অবস্থান ছিল ফরয জিহাদ আদায় করতে হবে, দরকার হলে খাওয়ারিজের অধীনে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের সময় ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের যে ফাতাওয়াতে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহন প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্র ও ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়, যে ফাতাওয়াতে সাক্ষর করেছিলেন শায়খ বিন বায, আল-ফাওযান সহ আরো অনেক আলেম, সেখানেও কোন নির্দিষ্ট জামা'আর কথা বলা হয় নি, জিহাদে যোগদান আবশ্যক এ হুকুম তুলে ধরা হয়েছিল। যদিও এ সময় আফগানিস্তানে জিহাদরত জামা'আগুলোর মধ্যে এমন জামা'আ ছিল যারা কট্টর বেরলভী আক্বিদা পোষণ করতো, ছিল শি'আ আহমাদ শাহ মাসুদের দল, ছিল ইউরোপ, অ্যামেরিকা দ্বারা সরাসরি সমর্থিত ও অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত দল। কিন্তু এগুলোর কিছু জিহাদ ফরয হওয়া এবং জিহাদে যোগদান করার (কোন একটি জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত হবার মাধ্যমে, যদি সে জামা'আর ভুলও থাকে) ফাতাওয়ার উপর প্রভাব ফেলেনি।[1]

বর্তমানে সময়েও শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি হাফিযাহুল্লাহ, শায়খ আবু ক্বাতাদা হাফিযাহুল্লাহসহ অনেক মুজাহিদ 'আলিম, জামাতুল বাগদাদীকে খাওয়ারিজ কিংবা খাওয়ারিজের চাইত নিকৃষ্ট বললেও, ইরাকে রাওয়াফিদের বিরুদ্ধে তারা জামাতুল বাগদাদীকে সাহায্য করতে বলেছেন, প্রয়োজনে ইরাকে রাওয়াফিদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য তাদের সাথে যোগ দিতেও বলেছেন (যদি কোন সুন্নী মুজাহিদ দল বা ত্বইফা খুজে না পাওয়া যায়)। একইভাবে হাকীম আল-উম্মাহ শায়খ ডঃ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ স্পষ্ট ভাবে বলেছেন জামাতুল বাগদাদীর পাহাড়সম ভুল থাকা সত্ত্বেও ক্রুসেডার-যায়নিস্ট, নুসাইরী, রাওয়াফিদের বিরুদ্ধে তিনি তাদের সমর্থন করেন, এবং সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কারন এ বিষয়টি (এ কুফফারদের বিরুদ্ধে জিহাদ) অনেক বেশি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।[2]

---

[1] [বিস্তারিত দেখুন, রাবেতা আল আলাম আল ইসলামীর ১৪০৮ হিজরির ফাতাওয়া। পিডিএফের ৩৭ নম্বর পৃষ্ঠা http://bit.ly/28Ih3AS]

[2] [ইসলামী বসন্ত, আস সাহাব]

এ ব্যাপারে শায়খ আল-'আল্লামা সুলাইমান বিন নাসিল আল-'উলওয়ানের একটি ক্বওল বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করবে ইন শা আল্লাহ। শায়খ সুলাইমান আল 'উলওয়ান বলেন – *যদি কোন কাফির রামাদ্বানের কোন এক দিনে ইসলাম গ্রহন করে, তবে ঐ মূহুর্ত থেকে তাকে সিয়াম পালন করতে হবে, তবে (ঐ) রামাদ্বানের পূর্ববর্তী রোযাগুলো তাকে পালন করতে হবে না, কারন এর আগে তার উপর রোযা বাধ্যতামূলক ছিল না।*

অর্থাৎ যদি আজ যুহরের সময় একজন মুশরিক ইসলাম গ্রহন করে, তবে ঐ মূহুর্ত থেকে তার উপর ইসলামের সকল ফরয বিধান আবশ্যক হয়ে যাবে। সুতরাং শাহাদাহ উচ্চারনের পর থেকেই তাকে রোযা পালন করতে হবে এবং মাগরিব আগ পর্যন্ত পানাহার তার জন্য হারাম হবে। আর সে যদি আজ ইসলাম গ্রহনের পর রোযা না রাখে, এবং আজ মারা যায় তবে সে এ ফরয ইবাদাত ছেড়ে দেবার জন্য জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং ফরয ইবাদাতের সম্পর্কে অবহিত হওয়া মাত্র সে ইবাদাত ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে (যদি না গ্রহনযোগ্য ওজর থাকে)। একই কথা ফরয জিহাদ, ফরয সালাত, ফরয যাকাত, ফরয হাজ্জের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এবার আসা যাক বাংলাদেশে এ মূহুর্তে যোগ দেবার জন্য কোন কোন জামা'আ আছে, সে প্রশ্নে। এ মূহুর্তে বাংলাদেশের অপারেশানাল আছে এমন তিনটি জামা'আ হল আনসার আল ইসলাম [AQIS], জামাতুল বাগদাদী বা "আইএস" [জেএমবির একটি অংশ তাদের বা'ইয়াহ দিয়েছে], এবং জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি [সালাউদ্দীন গ্রুপ বা মূল জেএমবি]। এর মধ্যে প্রথম দুটি হল বৈশ্বিক জিহাদের সাথে যুক্ত থাকা দুটি প্রধান জামা'আর সাথে সরাসরি সংযুক্ত শাখা। বর্তমান বিশ্বে যত জিহাদী তানযীম আছে তার ৯০% এর বেশি এ দুটি জামা'আর যেকোন একটির সাথে বাইয়াহবদ্ধ বা সংযুক্ত। যারা বৈশ্বিক জিহাদকে সমর্থন দেন তারা সকলেই এ দুটি জামা'আর যেকোন একটিকে হাক্ব মনে করেন, অনেকে দুটি জামা'আকেই হাক্ব মনে করেন। মোট কথা এ দুটি জামা'আর [আল-ক্বা'ইদা ও জামাতুল

বাগদাদী/"আইএস"] কমপক্ষে একটি জামা'আ যে বিশ্বব্যাপী সঠিক পদ্ধতিতে জিহাদ করে, এ দুটি জামা'আর যেকোন একটি জামা'আ যোগদান করার মত উপযুক্ত জামা'আ সেটি সকল "জিহাদ সমর্থক"..রাই স্বীকার করেন। সিরিয়াতে, কিংবা আফগানিস্তানে গেলে এ দুটী জামা'আর যেকোন একটিতে জিহাদ করার ইচ্ছার কথাই এ ভাইরা বলে থাকেন। সুতরাং এক্ষেত্রে উত্তর খুব সোজা, যেহেতু আপনি এদুটো দলের কোন একটাকে হাক্ব জামা'আ বলে মনে করেন, এবং বিশ্বজুড়ে তাদের জিহাদকে সমর্থন করেন, তাদের মানহাজকে সঠিক মনে করেন অতএব তাদের শাখা যেহেতু এ মূহুর্তে এ ভূখণ্ডে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, অতএব আপনি এ দুটোর মাঝে যে জামা'আকে হাক্বের অধিকতর নিকটবর্তী মনে করেন সেটাতে যোগ দিন।

খুব সহজ সমাধান। সমস্যা হল এ সহজ সমাধান তাদের সামনে উত্থাপন করা হলে অনেক ভাই এ প্রশ্নটি করেন তা হল আনসার আল ইসলাম কি আসলেই আল-ক্বাইদার শাখা? বাংলাদেশে "আইএসের" নামে যে কাজ হচ্ছে এগুলো কি আসলেই "আইএস"-এর লোকজন করছে? যদিও এ ফোরামের ভাইদের কাছে এ প্রশ্নগুলো হাস্যকর মনে হতে পারে তবুও ব্যাপকভাবে "মানহাজের ভাই"-দের কাছ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হবার কারনে, এ প্রশ্নগুলোর দালীল প্রমান সহ জবাব দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। আসুন দেখা যাক, এ দলগুলো কি আসলেই আল-ক্বাইদা বা জামাতুল বাগদাদীর সাথে সম্পৃক্ত কি না।

আনসার আল ইসলাম কি আসলেই আল-ক্বাইদা, আনসার কি আসলেই AQIS?

প্রমানে যাবার আগে প্রথমে আমরা একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি। *আমরা কিভাবে জানি ৯/১১ এর হামলা আল-ক্বাইদা করেছিল? আমরা কি এটা বুশের কথার ভিত্তিতে বিশ্বাস করি? কিংবা মার্কিন মিডিয়া বা মার্কিন কংগ্রেসের দাবির ভিত্তিতে?* না আমরা বিশ্বাস করি, আল-ক্বাইদার দায় স্বীকার এবং তাদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত তথ্য

প্রমানের কারনে। যেমন আমরা জানি শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ থেকে শায়খ আইমান হাফিযাহুল্লাহ, শায়খ আবু নাসীর আল উহায়শী রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল লিব্বি রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আবু ইয়াহিয়া আল লিব্বী রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ ইউসুফ আল-উয়ায়রী রাহিমাহুল্লাহ সহ তানযীম ক্বাইদাতুল জিহাদে উমারাহ ও 'আলিমগণ অসংখ্যবার একথা স্বীকার করেছেন যে ৯/১১ এর হামলা তারাই করেছেন। বিশেষভাবে আস-সাহাব মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত শায়খ উসামার বক্তব্য এবং এ বরকতময় হামলায় অংশগ্রহনকারী ভাইদের জবানবন্দীর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভাবে আমরা জেনেছি তানযীম ক্বাইদাতুল জিহাদই এ হামলা করেছে।

আচ্ছা *শায়খ আবু মুস'আব আল-যারক্বাউয়ীর রাহিমাহুল্লাহ জামা'আ তাওহীদ ওয়াল জিহাদ, যে শায়ক উসামাকে বাইয়াহ দেয়ার মাধ্যমে আল-ক্বাইদা ইন ইরাকে-AQI পরিণত হয়েছিল এ তথ্য আমরা কিভাবে জানি?* আমরা এটা জানি আল-ক্বাইদা ইন ইরাক এবং মূল আল-ক্বাইদার অফিশিয়াল মিডিয়া বক্তব্যের মাধ্যমে। একই ভাবে চিন্তা করুন *শায়খ আনওয়ার আল-আওলাকী যে AQAP এর সদস্য এটা আমরা কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করি?* ওবামার কথার ভিত্তিতে কি? না, এটা আমরা বিশ্বাস করি AQAP এর অফিশিয়াল মিডিয়া আল-মালাহীমের মাধ্যমে প্রকাশিত শায়খ আওলাকীর বক্তব্য, AQAP এর অফিশিয়াল ম্যাগাযিন ইন্সপায়ারে তার লিখিত বক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে। এ একই কথা জাবহাত আল-নুসরা, AQIM, আল-শাবাব, আল মুরাবিতুন [শায়খ মুখতার বেল মুখতার] – সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উভয় দিকের অফিশিয়াল বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের দাবির সত্যতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হচ্ছি।

বিশেষ করে আস-সাহাব মিডিয়ার বক্তব্যের মাধ্যমে। কারন এটি হল আল-ক্বাইদার সর্বপ্রথম অফিশিয়াল মিডিয়া যেখান থেকে শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ, এবং শায়খ আইমান হাফিযাহুল্লাহর বক্তব্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং আস-সাহাব মিডিয়া থেকে যখন কোন বক্তব্য প্রকাশিত হবে, তখন সেটা আল-ক্বাইদার বক্তব্য হিসেবেই আমরা

গ্রহন করি। *আর যদি আস-সাহাব মিডিয়াকে আমরা অবিশ্বাস করি, তাহলে ৯/১১ যে আসলেই আল-ক্বাইদা করেছে, শায়খ উসামা যে আসলেই আল-ক্বাইদার আমীর, উনি যে আসলেই আমীরুল মু'মীনীন মুল্লাহ মুহাম্মাদ উমার রাহিমাহুল্লাহকে বাইয়াহ দিয়েছেন, মিশরের জামাহ ইসলামিয়্যাহর বিভিন্ন নেতা যেমন শায়খ মুহাম্মাদ হাসান খালিল আল-হাকীম রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আহমেদ রেফা'ই তাহা রাহিমাহুল্লাহ যে আল-ক্বাইদাতে যোগ দিয়েছেন এরকম অসংখ্য তথ্য আমাদের তখন অস্বীকার করতে হবে। অফিশিয়াল মিডিয়াকে যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে শারলি এবদোর আক্রমন যে আল-ক্বাইদা করেছে, প্যারিস ও ব্রাসেলসের আক্রমন যে জামাতুল বাগদাদী করেছে এ প্রত্যাকটি বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে।*

যদি AQIS এর প্রসঙ্গ আসে, তাহলে প্রশ্ন হবে AQIS যে আসলেই আল-ক্বাইদার শাখা এর প্রমান কি? এর প্রমান হল শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরির বক্তব্য যা প্রকাশিত হয়েছে আস সাহাবের মাধ্যমে যেখানে তিনি আল-ক্বাইদার নতুন একটি উপমহাদেশীয় শাখার ঘোষণা দিয়েছেন যার নাম Jamā'at Qā'idat al-Jihād fī Shibh al-Qārrah al-Hindiyah বা AQIS. শায়খ আসীম উমার হাফিযাহুল্লাহ যে এ শাখার আমীর, উস্তাদ আহমেদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহ যে এ শাখার প্রথম নায়েবে আমীর এটা আমরা কিভাবে জানি। একই উত্তর আস সাহাব মিডিয়ার বিভিন্ন রিলিযের মাধ্যমে এ তথ্যগুলো আমরা জানতে পেরেছি।

তাহলে এখন দেখা যাক আনসার আল ইসলামের ব্যাপারে কি তথ্য-প্রমান পাওয়া যায়।

১। From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down/ ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশঃ এ ধূলো মিটবার নয় – আস সাহাব ২০১৫ সালের মে-র ২ তারিখ আস সাহাব মিডিয়া কতৃক প্রকাশিত From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down, শীর্ষক বক্তব্যে আল-কাইদার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখার আমীর শায়খ আসীম উমার হাফিযাহুল্লাহ সরাসরি

বাংলাদেশে সংঘটিত আহমেদ হায়দার রাজীব (থাবা বাবা), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যিন্দীক একেএম শফিউল ইসলাম, মুক্তমনার অভিজিৎ রায়, এবং ওয়াশিকুর রহমান বাবু হত্যা দায় স্বীকার করেন। [1]

আবার এ একই ভিডিওতে শায়খ আসিম উমার হাফিযাহুল্লাহ বাংলাদেশী একজন মুজাহিদিনের নাম উল্লেখ করেছেন যিনি বাংলাদেশ থেকে হিজরাহ করে খুরাসানে যান এবং সেখানে আল-ক্বাইদাতে যোগদান করেন, এবং অতঃপর শাহাদাত বরন করেন।[2] পরবর্তীতে বাংলাদেশে খুরাসানে হিজরত করা মুজাহিদিনকে নিয়ে আস সাহাব মিডিয়া থেকে বের হয় বাংলা ভিডিও "আমাদের মারকায", এবং "জীবনের সাফল্য" ।[3]

অর্থাৎ আল ক্বাইদার অফিশিয়াল মিডিয়া আস-সাহাবের মাধ্যমে প্রকাশিত বার্তায় AQIS এর আমীর নিজের মুখে দায় স্বীকার করে বলেছেন আনসার আল ইসলামের হামলাগুলো আল-ক্বাইদার মুজাহিদীন করেছেন। একই সাথে শায়খ আসীম উমার এটাও বলছেন শুধু যে বাংলাদেশে শুধু আল -ক্বাইদার মুজাহিদিন কাজ করছেন তাই না, বরং বাংলাদেশ থেকে মুজাহিদিনকে খুরাসানেও নিয়ে যাওয়া

---

১ [দেখুন, From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down, আস সাহাব মিডিয়া উপমহাদেশ, https://www.youtube.com/watch?v=3EC-j6_rnsI ৫.৫১-৬০৫ মিনিট, আন্তার্জাতিক জিহাদী ফোরাম আল-ফিদাতে আপলোড করা একই ভিডিওর কথা উল্লেখ করেছে জিহাদোলজি নামক, কাউন্টার টেরোরিযম ওয়েবসাইটটি – http://bit.ly/28OKcgJ

২ [দেখুন, From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down, আস সাহাব মিডিয়া উপমহাদেশ, https://www.youtube.com/watch?v=3EC-j6_rnsI ৬.২৮-৬.৪০ মিনিট]।

৩ [জীবনের সাফল্য ভিডিওটির কথা জাবহাত আল-নুসরার .আল-রিসালাহ্ম ম্যাগাযিনের ২য় সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়, এবং ২০১৫ সালের বাছাইকৃত শীর্ষ মুজাহিদিন ভিডিওর মধ্যে একটি বলে অভিহিত করা হয়।[

হচ্ছে/হয়েছে। অতএব এর মাধ্যেম প্রমানিত হয় আনসার আল ইসলাম আল-ক্বাইদার বিশেষ করে AQIS এর একটি শাখা, আনসার আল ইসলামের মুজাহিদিন আল-ক্বাইদার মুজাহিদিন এবং এ কথার সাক্ষী AQIS এর আমীর শায়খ আসিম উমার হাফিযাহুল্লাহ।

২) আল হাদীদ নিউয রিপোর্ট – আস সাহাব মিডিয়া ২০১৬ সালের ৮-ই মার্চ আস-সাহাব মিডিয়া থেকে প্রকাশিত হয় AQIS এর আল-হাদীদ নিউয রিপোর্ট। তিনটি অংশে বিভক্ত ও রিপোর্টে তুলে ধরা হয় গত প্রায় তিন বছরে AQIS এর বিভিন্ন হামলার বর্ণনা, এবং কোন কোন শ্রেণীর টার্গেটকে AQIS প্রাধান্য দিচ্ছে তার বিশ্লেষণ। একই সাথে এ ভিডিউতে তুলে হরা হয় পাকিস্তানের মুজাহিদিনে সাথে মুরতাদ পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর যুদ্ধের বাস্তবতা ও সামরিক-কৌশলগত বিশেষণ।[4]

আল হাদীদ নিউয বুলেটিনের তৃতীয় পর্বের শুরুতে AQIS কোন কোন শ্রেণীর টার্গেটের উপর উপমহাদেশ ব্যাপী হামলা করেছে তার আলোচনায়, শাতেমে রাসূলদের নিয়ে হামলার বর্ণনায় শায়খ আসীম উমার হাফিযাহুল্লাহর From France To Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down এর একটি ক্লিপ দেখানো হয় [লিঙ্ক ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে]। ভিডিওটির ২.৩০ মিনিট থেকে শায়খ আসীম উমারের বক্তব্য শুরু হয় এবং ৩:০৮ মিনিটের দিকে বাংলাদেশের হামলার ব্যাপারে শায়খের দায় স্বীকারের অংশটি দেখানো হয়।[5]

একই ভিডিওর ৪:৫৬ মিনিট থেকে আবারো থাবা বাবা, শফিউল ইসলাম, অভিজিৎ রায় ও ওয়াশিকুর বাবুর উপর আনসার আল ইসলামের হামলাগুলোর কথা উল্লেখ করে এগুলোকে সরাসরি

---

[৪] তিনটি পর্বের লিঙ্ক [আন-নাসর মিডিয়া কতৃক বাংলা সাবটাইটেলকৃত] – http://bit.ly/28LnhR0

[৫] [দেখুন আন নাসর মিডিয়া কতৃক বাংলা সাবটাইটেলকৃত "আল হাদীদ নিউয রিপোর্ট" তৃতীয় পর্ব, আস সাহাব মিডিয়া – https://www.youtube.com/watch?v=3ZHX6attiFM[

আল-ক্বাইদা উপমহাদেশের বা AQIS এর মুজাহিদিনের বরকতময় হামলা বলে উল্লেখ করা হয়। একই ভিডিওর ৬:৩৯ মিনিট থেকে ৬:৪৭ মিনিট পর্যন্ত ওয়াশিকুর রাহমান বাবুর হত্যাকারী আনসার আল ইসলামের মুজাহিদীন ভাই আরিফুল ও যিকরুল্লাহকে দেখিয়ে আল-ক্বাইদা উপমহাদেশের বীর মুজাহিদীন বলে উল্লেখ করা হয় -- আল্লাহ আমাদের এই দুই বীর সিংহের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।[1]

দেখা যাচ্ছে আস সাহাব থেকে প্রকাশিত AQIS এর শায়খ আসিম উমারের হাফিযাহুল্লাহ "From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down" ভিডিওটির মতোই, আস সাহাব থেকে প্রকাশিত AQIS এর ভিডিও "আল-হাদীদ নিউয রিপোর্ট" – এও আনসার আল ইসলামের হামলাগুলোকে AQIS এর হামলা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং আনসার আল ইসলামের মুহাজিদিনকে AQIS এর মুজাহিদিন বলে গর্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর।

৩) GIMF

GIMF বা Global Islamic Media Front হল আল-ক্বাইদার সাথে সম্পর্কিত একটি মিডিয়া যা আল-ক্বাইদার বিভিন্ন শাখার বক্তব্যগুলোকে ইংলিশ, জার্মান সহ অন্যান্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে থাকে। GIMF এর সূচনা হয় GIM [Global Islamic Media] নামের একটি ইয়াহু গ্রুপ থেকে। ২০০৩ সালের মার্চে GIM এর মাধ্যমে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় যেখানে স্পেনে হামলার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। ৩ মাস পর মাদ্রিদে বোমা হামলা ঘটে। তখন থেকেই আল-ক্বাইদার বিভিন্ন বক্তব্যের অনুবাদ GIM এর মাধ্যমে প্রকাশিত হতো, এবং আস সাহাব ছাড়া GIM/GIMF আল ক্বাইদার বক্তব্যের একমাত্র গ্রহনযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো। এমনকি আল-ক্বাইদার

---

[১] [দেখুন আন নাসর মিডিয়া কতৃক বাংলা সাবটাইটেলকৃত "আল হাদীদ নিউয রিপোর্ট" তৃতীয় পর্ব, আস সাহাব মিডিয়া – https://www.youtube.com/watch?v=3ZHX6attiFM.]

নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেও সে সময় বলা হয়েছিল যেকোন বক্তব্য, বই, কৌশলগত পর্যালোচনা ইত্যাদি বৈধ/অফিশিয়াল হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য GIM এর মাধ্যমে প্রকাশ হওয়া বাধ্যতামূলক। পরবর্তীতে GIM পরিণত হয় GIMF এ। বিভিন্ন প্রকাশন ও রিলিযের সত্যায়ন শুরু থেকেই GIMF এর কাজের একটি। বর্তমানেও আল শাবাব, আনসার আদ-দ্বীন (মালি), AQIM, তুর্কিস্তানী ইসলামী পার্টি ইত্যাদি আল-ক্বাইদা শাখার বিভিন্ন অপারেশানের এবং বিবৃতির অনুবাদ প্রকাশ হয় GIMF থেকে। এমনকি শায়খ আইমান হাফিযাহুল্লাহর সাম্প্রতিক বেশ কিছু বিবৃতির ["*Killing of Mujahideen by the Al-Saud Regime*", "*Sham A Trust Upon Your Necks*, "*The Sun of Victory Shines from Nusantara*", "*Let's Unite for the Liberation of Al-Quds* ইত্যাদি] ইংরেজী,জার্মান, উর্দু, এবং ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে GIMF থেকেই।

এ GIMF এর মাধ্যমে আনসার আল ইসলামের বেশ কিছু হামলার ব্যাপারে বার্তা অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হয়েছ।

একটি উদাহরনের লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল। নিলয় চৌধুরী নীলের হত্যাকান্ডের ব্যাপারে আনসার আল ইসলামের বিবৃতির আরবী অনুবাদ।[2]

GIMF এ বক্তব্যটি আরবী ও ইংরেজীতেও অনুবাদ করে তাদের টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ডেড হয়ে যাবার কারন তার লিঙ্ক দেওয়া গেল না।

১৮/৮/২০১৫ এ GIMF ও আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের " *Refuting News About the Role of Anṣār Allah Bangla Team In the Assassination of the Blasphemer Blogger Niloy Chowdhury Neel in Bangladesh*" শীর্ষক যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয় যেখানে বলা হয় আনসারুল্লাহ বাংলা টিম একটি মিডিয়া টিম মাত্র তবে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এবং GIMF এর পক্ষ থেকে এ

---

[২] https://dawahilallah.in/archive/index.php/t-423.html

বিবৃতিতে ব্লগার নিলয় চৌধুরী নিল হত্যার জন্য *AQIS এর বাংলাদেশ শাখার মুজাহিদিনের* প্রশংসা করা হয়।

পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর GIMF এর একটি বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হয় আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামের মিডিয়াটি GIMF এর সাথে মার্জ (Merge) করেছে বা একীভূত হয়ে গেছে, যা এখন থেকে GBT [GIMF Bangla Team] নামে পরিচিত হবে। এখন থেকে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামে কোন আলাদা মিডিয়া আর থাকবে না, বাংলাতে যে বিবৃতি তা বের হবে GBT এর মাধ্যমে।[1]

২০১৫ সালে জাগৃতি ও শুদ্ধস্বর প্রকাশনীতে আনসার আল ইসলামের হামলার ব্যাপারে GIMF/GBT এর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় বাংলা ভিডিও "চার্লি হেব্দ থেকে জাগৃতি/From Charlie Hebdo to Jagriti" [2]

২০১৬ এর জানুয়ারীতে GBT এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে আনসার আল ইসলামের বিভিন্ন বরকতময় হামলার ইনফোগ্রাফিক যেখানে থাবা বাবা থেকে শুরু করে জাগৃতি পর্যন্ত প্রতিটি হামলা উল্লেখ করা হয়।[3]

২০১৬ এর মে-তে ঢাকায় সমকামীতার প্রচারক ও প্রসারক অ্যামেরিকান এজেন্ট জুলহাজ মান্নানের উপর বরকতময় হামলার কারনে আনসার আল ইসলামকে অভিনন্দন জানানো হয় GIMF এর

---

১ [দেখুন "The Creation of the GIMF Bangla Team Following the Merger of the Anṣār Allah Bangla Team" – http://bit.ly/28JcJSK]

২ [https://justpaste.it/GBT-1]

৩

[দেখুন: /files/justpaste/d315/a12075290/vxgsfjx.jpg ইংরেজি /files/justpaste/d315/a12075290/w70m2wp.jpg বাংলা] ,

অফিশিয়াল টুইটার থেকে। টুইটার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ডেড হবার কারনে লিঙ্ক দেওয়া গেল না, তবে দাওয়াহইলাল্লাহ ফোরামে GIMF এর অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া পোষ্টের লিঙ্ক দেওয়া হল। [4]*এ বার্তাতে আনসার আল ইসলামকে সুনির্দিষ্ট ভাবে AQIS এর বাংলাদেশ শাখা বলে উল্লেখ করা হয়[GIMF Bangla Team (GBT) Congratulates the Blessed Operation by Ansar Al-Islam Bangladesh (AQIS, Bangladesh branch)]*

উল্লেখ্য দাওয়াহ্‌ইলাল্লাহ ফোরাম ছাড়া আর মাত্র দুটি ফোরামে GIMF এর অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট আছে, এবং এ ফোরাম দুটো হল (এক.[5]) এবং (দুই.[6])।

এ ব্যাপারে অফিশিয়াল মেসেজটি পড়ুন।[7]

আবার এ GIMF থেকেই আস-সাহাব মিডিয়া থেকে প্রকাশিত AQIS এর বিভিন্ন ভিডিও ইংরেজী সাবটাইটেল সহ রিলিয করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল "The Jihadi Memories" নামের সিরিযটি।

GIMF এর এধরনের আরো বিবৃতি খুজতে পারেন নিচের লিংকে। [8]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আনসার আল ইসলামের মুজাহিদিনের খবর প্রচার করছে, এবং সুনির্দিষ্টভাবে আনসার আল ইসলামকে AQIS এর শাখা হিসেবে আখ্যায়িত করছেAQIS সহ আল-ক্বাইদার বিভিন্ন শাখার এবং আল-ক্বাইদার সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন মুজাহিদিন জামা'আর জন্য বিভিন্ন ভাষাতে ইন্টারনেটভিত্তিক প্রচারের কাজ করা GIMF – যা এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আল-ক্বাইদার মুজাহিদিনের খবর প্রচার করে আসছে, যা ছিল এক সময় ইন্টারনেটে আল-ক্বাইদার বার্তা প্রকাশের

---

[4] http://bit.ly/28MuNOQ1

[5] https://alfidaa.info/vb

[6] https://shamikh1.info/vb

[7] – http://bit.ly/28KLiFv

[8] - http://bit.ly/28MRVuM

একমাত্র অফিশিয়াল মাধ্যম, এবং যাকে খোদ আল-ক্বাইদার পক্ষ থেকে ভেরিফাই করা হয়েছে বা তাযকিয়্যাহ দেওয়া হয়েছে।

৪) ইন্সপায়ার ম্যাগাযিন সংখ্যা ১৪ ২০১৫ এর সেপটেম্বরের ৯ তারিখে আল মালাহীম মিডিয়া থেকে প্রকাশিত হয় AQAP [Al Qa'idah in the Arabian Peninsula]-এর ইন্সপায়ার ম্যাগাযিনের ১৪ তম সংখ্যা। গুপ্তহত্যা নিয়ে তৈরি এ সংখ্যার ২৫ তম পৃষ্ঠায় শাতেমে রাসূলদের উপর বিশ্বব্যাপি হামলার একটি টাইমলাইন তুলে ধরা হয়, যেখানে শার্লি এবদোর হামলা ২০০৪ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ১০ দশটি হামলার কথা তুলে ধরা হয়। এ টাইমলাইনে স্থান পায় আনসার আল ইসলামের ৪টি হামলা [অভিজিৎ, ওয়াশিকুর, নিলয় নীল, অনন্ত বিজয়]। এ টাইমলাইনে স্থান পাওয়া দশটি হামলার মধ্যে দুটি হামলার ক্ষেত্রে হামলাকারীর নাম উল্লেখ করা হয় [মুহাম্মাদ বুয়েইরি, আমির আব্দুর রশীদ চিমা]। এছাড়া শার্লি এবদো সহ বাকি আটটি হামলার ক্ষেত্রে কোন/ব্যক্তি বা সংগঠনের কথা উল্লেখ করা হয় নি। অবশিষ্ট এ আটটি হামলার মধ্যে বাংলাদেশের চারটি হামলা বাদ দিয়ে বাকি চারটি হামলার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখা এগুলোর প্রতিটি করা হয়েছিল সরাসরি আল-ক্বাইদার কোন একটি শাখার তত্ত্বাবধানে [শার্লি এবদো, কার্ট ওয়েস্টারগার্ড], অথবা আল-ক্বাইদার নির্দেশনা অনুযায়ী কোন সেলের মাধ্যমে [লারস ভিলকস]। অর্থাৎ যে হামলাগুলোর সাথে আল-ক্বাইদা যুক্ত না সেগুলোর ক্ষেত্রে হামলাকারীদের নাম এ টাইমলাইনে উল্লেখ করা হয়ছে, আর যে হামলাগুলোর সাথে আল-ক্বাইদা জড়িত সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন ব্যযাক্তি বা সংগঠনের নাম আলাদা করে উল্লেখ করা হয় নি। অর্থাৎ এ টাইমলাইনে শারলি এবদো এবদো বাংলাদেশের আনসার আল ইসলামের হামলাগুলোকে একই ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপরোক্ত অফিশিয়াল রিলিয সমূহের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমান হয় AQIS এর পক্ষ থেকে একাধিকবার আনসার আল ইসলামকে আল-ক্বাইদার শাখা হিসেবে দাবি করা হয়েছে, খোদ AQIS এর আমীর আনসার আল ইসলামের মুজাহিদিনকে, "আল-ক্বাইদার মুজাহিদিন"

বলে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী আল-ক্বাইদার অনলাইন প্রচারনার কাজ করা GIMF এর পক্ষ থেকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে আনসার আল ইসলাম হল AQIS এর বাংলাদেশ শাখা। এমনকি AQAP এর ইন্সপায়ার ম্যাগাযিন ও জাবহাত আল-নুসরার আর রিসালাহ ম্যাগাযিনেও ও তথ্য পরোক্ষ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে আনসার আল ইসলামের পক্ষ থেকেও তাদের একাধিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে তারা আল-ক্বাইদা উপমহাদেশের বাংলাদেশ শাখা। অর্থাৎ আনসার আল ইসলামের পক্ষ থেকে এবং AQIS এর পক্ষ থেকে একই দাবি করা হয়েছে। সুতরাং মুজাহিদিন মিডিয়ার ব্যাপারে সাধারন পর্যায়ের ধারনা রাখেন এমন ব্যাক্তিদের জন্যও এ সত্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে আনসার আল ইসলাম, AQIS এর বাংলাদেশ শাখা, এবং আনসার, আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ কতৃক প্রতিষ্ঠিত তানযীম ক্বাইদাতুল জিহাদের একটি অংশ।

আর এ দাবিকে অস্বীকার করা হয়েছে কোন উৎস থেকে? যেখানে আল-ক্বাইদার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আনসার আল ইসলাম আল-ক্বাইদার শাখা, সেখানে বাংলাদেশের তাগুতের বিভিন্ন বাহীনি কতৃক এবং বাংলাদেশের মিডিয়া এ কথাকে অস্বীকার করেছে। এখন প্রশ্ন হল যেসব "মানহাজের ভাই জিহাদ সমর্থক" নিজেরা বিশ্বাস করছেন এবং আত্ববিশ্বাসের সাথে অপরকে বলছেন তারা কিসের ভিত্তিতে এ কথা বলছেন? তারা কি মুসলিমদের কথার উপরে, মুজাহিদিনের অফিশিয়াল রিলিযের উপরে মুরতাদ বাহিনী ও বাংলাদেশের মিডিয়ার কথাকে স্থান দিচ্ছেন? নাকি তারা অফিশিয়াল মিডিয়া বলে যে আদৌ কিছু আছে তা সম্পর্কে জানেন না? অথচ এ বক্তব্য, বিবৃতি, প্রকাশনা গুলো অনালাইনে অ্যাভেইলেবল ১/২ ঘন্টা সময় নিয়ে একটু মনযোগ দিয়ে খুজলেই এ তথ্যগুলো অতি সহজে সত্যায়ন করা সম্ভব। নাকি তারা অফিশিয়াল মিডিয়া সম্পর্কে জানেন কিন্তু তা খুজে দেখার পরিশ্রমটুকু করার সময় তারা পাননি, আর তাই না জেনেই , জানার চেষ্টা ছাড়াই "অমুক ভাই" বা তমুক ভাই"-এর কাছ থেকে শোনা কথার ভিত্তিতে এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে "বিশেষজ্ঞ" মতামত

প্রদান করছেন? যদি এর যেকোন একটি করা হয়, তবে কি তারা তথ্য সত্যায়নের যে মূলনীতি শরীয়াহতে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার অনুসরন করছেন?

বাংলাদেশে "আইএস" এর নামে যে হামলাগুলোর দায় স্বীকার করা হচ্ছে এগুলো কি আসলে "আইএস" করছে?

আনসার আল ইসলামের ব্যাপারে আমরা যে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছি তার আলোকে দেখা যায়, ইতিমধ্যে 'আল-হায়াত মিডিয়া সেন্টার" থেকে প্রকাশিত "আইএস"-এর অফিশিয়াল ইংরেজী ম্যাগাযিন "দাবিক্ব"-এ একাধিকবার বাংলাদেশে চালানো হামলার ব্যাপারে দায় স্বীকার করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে যারা "আইএস" এর ব্যানারে কাজ করছে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনটি প্রমান এখানে তুলে ধরা হল।

১) দাবিক্ব ১২ – নভেম্বর ১৮, ২০১৫ তে প্রকাশিত "Just Terror" নামক এ সংখ্যাটিতে উপস্থাপন করা "The Revival of Jiahd in Bengal" নামের একটি আর্টিকেল। এ আর্টিকেলে হোশি কুনিও, সিযার তাভেলা এবং হোসেনী দালানে রাওয়াফিদের তাজিয়া মিছিলের উপর হামলার দায়স্বীকার করে বলা হয়, "খিলাফাহ্‌র অধীনস্ত" দুটি সেল "ক্রুসেডার সিযার তাভেল" ও "জাপানী নাগরিক হোশি কুনিও" –এর উপর হামলা চালায়। একইভাবে হোসেনী দালানের হামলারা ব্যাপারে বলা হয় "খিলাফাহর সৈন্যরা" এ হামলা চালায়। এ আর্টিকেলটিতে শায়খ আবদুর রাহমানের রাহিমাহুল্লাহ ও "তার ছাত্রদের" কথা প্রশংসার সাথে আলোচনা করা হয়, যা উদ্দেশ্য ছিল মূল জেএমবির (সালাউদ্দীন গ্রুপ) কাছ থেকে বা'ইয়াহ পাওয়া।

২) দাবিক্ব ১৪ – ১৩ই এপ্রিল ২০১৬ তে প্রকাশিত "ইখওয়ানুল মুরতাদ্দীন' নামক সংখ্যায় "আইএস" –এর বাংলাদেশের আমীর আবু ইব্রাহীম আল হানিফের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়, যেখানে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে "আইএস" এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য উদ্দেশ্যসহ দীর্ঘ আলোচনা তুলে ধরা হয়। একই সাথে এ

সংখ্যাতে আবু জানদাল আল-বাঙ্গালী নামে একজন বাংলাদেশী মুজাহিরের কথা তুলে ধরা হয়, যিনি উত্তর সিরিয়াতে "আইএস" এর হয়ে লড়াই করার সময় মৃত্যুবরন করেন। আমরা আশা করি যদিও জামা'আ হিসেবে জামাতুল বাগদাদী একটি খাওয়ারিজ জামা'আ তথাপি এ বাংলাদেশী মুহাজিরের নেক নিয়্যাতের ভিত্তিতে এবং তিনি যদি মুওয়াহিদিন ও মুজাহিদিন হত্যায় অংশগ্রহন না করে থাকেন তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করবেন।

৩) আমাক্ব – এখন পর্যন্ত "আইএসের" নামে যতোগুলো হামলারা দায় স্বীকার করা হয়েছে, তার সবই হয়েছে আমাক্ব (Amaq) নিউয এজেন্সীর মাধ্যমে। সাধারনভাবে জামাতুল বাগদাদীর মিডিয়া নীতি হল সব অপারেশানের খবর প্রথমে আমাক্বের মাধ্যমে স্বীকার করা, এবং তারপর অন্যান্য অফিশিয়াল প্রকাশনার মাধ্যমে স্বীকার করা। এজন্য প্যারিস, ব্রাসেলস এবং মিশরীয় বিমান হামলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম আমাক্ব নিউয এজেন্সীর মাধ্যমে দায় স্বীকার করা হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে আনসার আল ইসলামের মতো বাংলাদেশের "আইএসের" ক্ষেত্রেও দুই দিক থেকেই একই দাবি করা হচ্ছে, এবং দাবি অস্বীকার করা হচ্ছে মুরতাদ বাহিনী ও বাংলাদেশের মিডিয়া পক্ষ থেকে। সুতরাং এ বিষয়টি পরিষ্কার যে আল-ক্বাইদা এবং জামাতুল বাগদাদী উভয় জামাতের কাজ সক্রিয়ভাবে এখন বাংলাদেশে চলছে। সুতরাং বৈশ্বিক জিহাদকে সমর্থনকারী [যেহেতু এ দুটি জামা'আর অধীনেই বর্তমানে বিশ্বের ৯০% এর বেশি জিহাদী তানযীম কাজ করছে] এবং জিহাদকে ফারযুল আইন বলে যারা বিশ্বাস করেন, তাদের জন্য ঘরে বসে থাকার আর কোন অজুহাত থাকে না। কারন যেকোন বিচারে (আপনি আল-ক্বাইদাকে হাক্ব মনে করুন, কিংবা জামাতুল বাগদাদী/"আইএস" কে) হাক্ব জামা'আ এখন বাংলাদেশে বিদ্যমান আছে, আর এটা স্বীকৃতি খোদ আল-ক্বাইদা ও "আইএস"-ই দিচ্ছে।

আমার সম্মানিত মুসলিম ভাইয়েরা! দ্বীনের ফরয একটি বিধানের ব্যাপারে, ফারযুল আইন আমলের ব্যাপারে, হাক্ব জামা'আকে খুজে বের

করার ব্যাপারে, ফরয পালনের জন্য এ জামা'আর সাথে আবদ্ধ হবার ব্যাপারে - এতোগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্নের ব্যাপারে সঠিক তথ্য সঠিক পদ্ধতিতে জানার প্রচেষ্টা ছাড়া এরকম অবস্থান নেওয়া, তা প্রচার করা এবং এ অবস্থানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া কিভাবে মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা শারীয়াহগত - কোন দিকে যৌক্তিক বা Justifiable হতে পারে? সুবহান'আল্লাহ্, "তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?" [আল-ক্বালাম, ৩৬]

জিহাদের সাধারণ দিক-নির্দেশনা

শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ) ১৪৩৪হিঃ

উৎস: আস-সাহাব মিডিয়া

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

প্রথমত: ভূমিকা

১। এটা কোন গোপন বিষয় নয় যে, এ পর্যায়ে আমাদের কর্মকান্ড দু'টি ধারায় বিভক্ত: প্রথমটি হচ্ছে সামরিক এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দাওয়াত।

২। সামরিক কর্মকান্ড: সামরিক কর্মকান্ডের প্রথম টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে কুফরের (আন্তর্জাতিক) কেন্দ্র আমেরিকা ও তার মিত্র ইসরায়েল এবং দ্বিতীয় টার্গেট হচ্ছে তাদের স্থানীয়/আঞ্চলিক মিত্র যারা মুসলমানদের দেশগুলোর শাসক।

ক. আমেরিকাকে লক্ষ্যবস্তু বানানো: আমেরিকাকে টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু বানানোর উদ্দেশ্য হলো, তাকে নিঃশেষ করে ধ্বংসের দুয়ারে পৌঁছে দেয়া যেন তা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্যবরণ করে এবং তার সামরিক, জনবল ও অর্থনৈতিক ক্ষতির দরুন নিজ ভারেই মুখ থুবরে পড়ে। যার ফলস্বরূপ আমাদের ভূমিসমূহে তাদের প্রভাব খর্ব হয়ে যাবে এবং তাদের মিত্রদেরও একের পর এক পতন হতে থাকবে।

সাম্প্রতিক আরব বিপ্লবে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আমেরিকার কুপ্রভাব পতনের ইঙ্গিত বহন করে। আফগানিস্তান এবং ইরাকে মুজাহিদীনদের হাতে অব্যাহত নাস্তানাবুদ হবার পর এবং সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর থেকে তাদের জাতীয় নিরাপত্তা ক্রমাগত হুমকির মুখে পড়ায় আমেরিকা এখন মুসলিম দেশসমূহের জনগণের চাপের মুখে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি এখন স্ফীত হয়ে মোড় নিয়েছে তাদের তাবেদারদের দিকে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে, আগত পর্যায়টি আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে আমেরিকার প্রভাব আরো কমে যাওয়া এবং পশ্চাদপসরণের ফলে আমেরিকার তার নিজ খোলসের ভেতরে আরো বেশী ঢুকে যাওয়ার সাক্ষী হয়ে থাকবে, যা তাদের দোসর ও তাবেদার সরকার সমূহকেও দুর্বল করে দেবে।

খ. মুসলিম দেশে আমেরিকার তাবেদার সরকারকে লক্ষ্যবস্তু বানানো: আমেরিকার তাবেদারদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর ব্যাপারে বলতে হলে, এর বাস্তবতা একেক জায়গায় একেক রকম। এক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে, তাদের সাথে যে কোন সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া, শুধুমাত্র সেই দেশসমূহ ব্যতীত যেখানে সম্মুখ সমরে তাদের মোকাবেলা করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

উদাহরণস্বরূপ,

- আফগানিস্তানে তাদের (আমেরিকার তাবেদার সরকার বাহিনীর) মোকাবেলা করা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই অংশ।
- পাকিস্তানে তাদের (তাবেদার সরকার গোষ্ঠী) বিরুদ্ধে লড়াই আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদারিত্ব হতে মুক্তির ক্ষেত্রে পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। এরপর এর অপর উদ্দেশ্য হলো, সেখানে পাকিস্তানের মুজাহিদীনদের জন্য একটি অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা যা পরবর্তীতে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য জিহাদের উৎক্ষেপণাঞ্চল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- ইরাকে তাদের (তাবেদার সরকার গোষ্ঠী) বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্য হচ্ছে সুন্নিদের অঞ্চল সমূহকে আমেরিকার উত্তরাধিকারী শিয়াদের হাত থেকে মুক্ত করা।

- আলজেরিয়ায়, যেখানে মার্কিন উপস্থিতি নগণ্য এবং ক্ষীণ সেখানেও সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্য হচ্ছে তাদেরকে দুর্বল করে ফেলা এবং "ইসলামিক মাগরিব", পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ সাহারার দেশসমূহে জিহাদী চেতনা উজ্জীবিত করা ।সম্প্রতি আমেরিকা এবং এর মিত্রদের সাথে সংঘাতের সম্ভাবনা এ অঞ্চলে প্রকটভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে।

- আরব উপদ্বীপসমূহে তাদের (তাবেদার সরকার গোষ্ঠী) বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণ হচ্ছেআমেরিকার তাবেদারী।

- সোমালিয়ায় তাদের (তাবেদার সরকার গোষ্ঠী) বিরুদ্ধে লড়াই এর কারণ হচ্ছে তারা ক্রুসেডার দখলদার বাহিনীর অগ্রবাহিনী হিসেবে কাজ করছে।

- সিরিয়ায় তাদের (তাবেদার সরকার গোষ্ঠী) বিরুদ্ধে জিহাদ এই কারণে যে, এর শাসকেরা কোন মুসলমানের নূন্যতম ইসলামী সত্তাকে সহ্য করে না, আর জিহাদী চেতনার মুসলমানদের ব্যাপারে বলা বাহুল্য। এবং তাদের ইসলাম নির্মূলের প্রচেষ্টার রক্তাক্ত ইতিহাস একটা সর্বজন-বিদিত বিষয়।

- জেরুজালেমের পরিবেষ্টনে, সর্বপ্রথমও প্রধান যুদ্ধ হচ্ছে ইহুদিদের বিরুদ্ধে এবং এক্ষেত্রে স্থানীয় শাসকদের সাথে অবশ্যই যথাসম্ভব ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হবে যারা "অসলো চুক্তির" অধীনে ক্ষমাতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

৩। দাওয়াতী কাজ: আগ্রাসী ক্রুসেডারদের হুমকির বিষয়ে উম্মতকে সচেতন করে তোলা, তাওহীদের সঠিক ব্যাখ্যা তাদের নিকট পরিষ্কার করে দেয়া যে, বিধান প্রদান এবং সার্বভৌমত্ব কেবল একমাত্র আল্লাহরই অধিকারভুক্ত এবং ইসলামভিত্তিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সকল ভূমিসমূহের মুসলমানদের একতার উপর গুরুত্বারোপ করা। আল্লাহর ইচ্ছায় এটা হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি অনুসারে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বরঙ্গ। এ পর্যায়ে দাওয়াতী কর্মকান্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই দুইটি ধাপে সম্পন্ন হবে:

প্রথম ধাপ: অগ্রবর্তী মুজাহিদদেরকে শিক্ষিত ও উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়া যারা ক্রুসেডার ও তাদের তাবেদারদের মোকাবেলার দায়িত্বভার বহন করছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত করবেন।

দ্বিতীয় ধাপ: জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা যেন তারা তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইসলামের পক্ষে যোগ দান করে এবং এর জন্য কাজ করে।

দ্বিতীয়ত: প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা

উপরোক্ত ভূমিকার উপর ভিত্তি করে আমরা সিয়াসাতুশ শরীআতের (ইসলামী রাজনীতি) আলোকে নিম্নোক্ত দিক-নির্দেশনা সমূহ পেশ করছি যার উদ্দেশ্য স্বার্থ (মাসলাহাত) সংরক্ষণ এবং ক্ষতি (মাফসাদাহ) এড়ানো।

(দাওয়াতের ক্ষেত্রে)

১। সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে মনযোগ দিন যাতে তাদের সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ করে তোলা যায়। একইভাবে মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে আরো অধিক মাত্রার সচেতনতা ও বোধশক্তির উন্নয়নে অধিক মনোযোগ দিন যেন একটি সুসজ্জিত, সংঘবদ্ধ, আদর্শিক এবং সচেতন মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা যায় যারা ইসলামী আকাঈদে দৃঢ় বিশ্বাসী, এর বিধানের প্রতি অটল এবং মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর। সেই সাথে যারা আলেম এবং বাগ্মীতার অধিকারী তারা যাতে মুজাহিদীনদের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে সামনের কাতারে চলে

আসেন তা সুনিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে আমাদের বার্তা ও আদর্শ সুরক্ষিত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী দাওয়াতের প্রচার-প্রসার হয়।

(সামরিক ক্ষেত্রে)

২। সামরিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কুফরের কেন্দ্রকে (আমেরিকা) অব্যাহত ভাবে দুর্বল করতে মনযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে যে যাবৎ না তা সামরিক এবং অর্থনৈতিক উভয় খাতে দেউলিয়া হয়ে যায়, এর জনশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তা পশ্চাদপসরণ ও একাকীত্বের পর্যায়ে পৌঁছে নিজেকে নিজ খোলসে ফিরিয়ে নেয় (যা আল্লাহর ইচ্ছায় খুবই নিকটে)।

সকল মুজাহিদ ভাইয়েরা অবশ্যই বিশ্বের যেকোন অংশে পশ্চিমা জায়নবাদী ক্রুসেডার জোটের স্বার্থে আঘাত করাকেই অগ্রগণ্য দায়িত্বরূপে গ্রহণ করবেন। এ লক্ষ্যে তাদেরকে অবশ্যই তাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু ঢেলে দিতে হবে।

অনুরূপভাবে, মুসলিম বন্দীদের মুক্তকরণে আমাদের ভাইদের অবশ্যই যেকোন উপায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যার অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে তা ঘেরাও করা, অথবা মুসলিম দেশসমূহকে আক্রমণে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের নাগরিকদের জিম্মী করা যাতে তাদের বিনিময়ে আমাদের বন্দীদের মুক্ত করে আনা যায়।

এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকা উচিত যে, কাফেরদের প্রধান, আমেরিকাকে আক্রমণ করার এই নীতি মুসলমানদেরকে যারা অত্যাচার করছে তাদের বিরুদ্ধে কথা কিংবা অস্ত্রের জিহাদের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সুতরাং, ককেশাসে আমাদের মুসলমান ভাইদের অধিকার এটা যে, তারা আগ্রাসী রাশিয়া এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। এটা আমাদের কাশ্মীরের মুসলমান ভাইদের অধিকার যে, তারা সেখানকার অপরাধী হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। এটা আমাদের পূর্ব তুর্কিস্তানের ভাইদেরও সমান অধিকার যে, তারা চীনা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। একইভাবে ফিলিপাইন, বার্মা এবং এমন প্রতিটি ভূমি যেখানে মুসলমানেরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন সেখানে তারা সেখানকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবেন।

(স্থানীয় প্রশাসন এর ব্যাপারে)

৩। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সশস্ত্র সংঘাত এড়িয়ে যাবেন যদি না আপনারা তা করতে বাধ্য হন, উদাহরণস্বরূপ, যদি স্থানীয় প্রশাসন আমেরিকার বাহিনীর একটা অংশ হিসেবে কাজ করে, যেমন আফগানিস্তানে হচ্ছে; অথবা যদি স্থানীয় প্রশাসন আমেরিকার পক্ষ থেকে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যেমন সোমালিয়া ও জাযিরাতুল আরবে হচ্ছে; অথবা যদি কোন স্থানে স্থানীয় প্রশাসন মুজাহিদীনদের উপস্থিতি মোটেও সহ্য না করে, যেমন ইসলামী মাগরিব, সিরিয়া এবং ইরাকে দেখা যাচ্ছে।

যাই হোক, এই ধরনের প্রশাসনের সাথে সশস্ত্র সংঘাতে জড়িয়ে যাওয়া যখনই সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

যদি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাধ্য করা হয় তাহলে আমাদেরকে এটা অবশ্যই পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, এদের সাথে আমাদের এই সংঘাত ক্রুসেডারদের দ্বারা মুসলমানদেরকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলারই একটা অংশ মাত্র।

অধিকন্তু, যখনই স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সংঘাতের বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকবে তখনই তা করে ফেলা, যেন দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আদান প্রদান করা, ঈমানদারদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা ও জিহাদে শরীক করা, ফান্ড (জিহাদের জন্য অর্থ) সংগ্রহ করা এবং সমর্থক বাড়ানোর সুযোগ জারি থাকে। আমাদেরকে অবশ্যই এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত কারণ আমাদের জিহাদ অনেক দীর্ঘ এবং এই জিহাদের নিরাপদ ঘাঁটি এবং লোকবল, অর্থ ও অভিজ্ঞদের সার্বক্ষনিক সমর্থন দরকার রয়েছে।

হ্যাঁ, তবে যে সকল স্থানীয় প্রশাসন ক্রুসেডারদের হত্যাযজ্ঞের সাথী, আমাদের এই (উপরোক্ত) মূলনীতি তাদেরকে পরিষ্কারভাবে এই বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না যে, আমরা কোন সহজ শিকার নই এবং তাদের প্রতিটি কার্যকলাপের এক যথাযথ প্রতিউত্তর অবশ্যই দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ যদিও তা আসতে কিছুটা কালক্ষেপণ হতে

পারে। এই নীতি সব ফ্রন্টে (মুসলমানদের নিজ নিজ ভূখন্ডে) বাস্তবায়ন করা উচিত সেখানকার পরিস্থিতির সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ সে অনুযায়ী।

(বিভ্রান্ত দল এর ক্ষেত্রে)

৪। বিভ্রান্ত দল যেমন: রাফেজী শিয়া, ইসমাঈলী, কাদিয়ানী এবং বিদআতী সুফীদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে যান যদিও তারা সাধারণত আহলে সুন্নাতের সাথে সংঘাতে লিপ্ত থাকে। যদি তারা আহলে সুন্নাতের সাথে লড়াই করতে থাকে তবে প্রতিঘাত শুধু ঐসব দলের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে যারা সরাসরি আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। একই সাথে আমাদের অবশ্যই পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, আমরা শুধু আমাদের প্রতিরক্ষা করছি। যারা এবং যাদের পরিবার আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদেরকে তাদের বাড়িঘর, ইবাদতখানা, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় সমাবেশে লক্ষ্যবস্তু বানানো উচিত হবে না। যদিও তাদের মিথ্যা এবং তাদের বাতিল আমল ও আকীদার ভ্রান্তি অনবরত উন্মোচন করা থেকে বিরত থাকা আমাদের জন্য উচিত হবে না।

আর যেসব অঞ্চল মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে সেসব জায়গায় এসব দলগুলোকে প্রজ্ঞার সাথে পরিচালনা করতে হবে। এই দলগুলোকে প্রথমে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে, তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, তাদের সন্দেহের অবসান করতে হবে এবং এমনভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে হবে যাতে তার চেয়ে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি না হয়, যেমন: ঐসব এলাকা থেকে মুজাহিদীনদের বের করে দেয়া, তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনতার বিদ্রোহ, অথবা অশান্তির সৃষ্টি যার সুযোগ শত্রুপক্ষ নেয়ার চেষ্টা করবে।

(মুসলিম ভূখণ্ডে বসবাসরত কাফেরদের ব্যাপারে)

৫। খ্রিষ্টান, শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের যেসকল সদস্যমুসলিম ভূখণ্ডে বসবাস করছে তাদের সাথে ঝগড়া না করা। তবে যদি তারা সীমালঙ্ঘন

করে তবে সেটার যথাযথ ও আনুপাতিক প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট। এই প্রতিক্রিয়া একটি বিবৃতিসহ আসতে পারে যে, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতে চাই না যেহেতু আমরা কুফরের প্রধান আমেরিকার সাথে যুদ্ধরত আছি এবং নিকট ভবিষ্যতে আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পরে আমরা তাদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চাই।

(সরাসরি যারা যুদ্ধ করছে না এমন কাফেরদের ক্ষেত্রে)

৬। সাধারণভাবে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি অথবা এই ধরনের শত্রুতাপূর্ণ কর্মকান্ডে জড়িত হয়নি তাদের বিরুদ্ধেযুদ্ধ করা অথবা তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানো পরিহার

করবেন এবং প্রাথমিক লক্ষ্য ক্রুসেডার বাহিনীর উপর আর তারপর তাদের স্থানীয়/আঞ্চলিক সহযোগীদের উপর রাখবেন।

৭। যুদ্ধে জড়িত নয় এমন নারী ও শিশুকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকুন এবং এমনকি তারা যদি যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত তাদের পরিবারও হয় তবুও তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানো থেকে যতটুকু সম্ভব বিরত থাকুন।

(সতর্কতা)

৮। মুসলমানদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকুন। অর্থাৎ, হত্যা, অপহরণ, বিস্ফোরণ অথবা তাদের সম্পদ ও মালামালের ধ্বংস সাধন ইত্যাদি সকল প্রকার ক্ষতি সাধন থেকে বিরত ও সাবধান থাকুন।

৯। শত্রুদেরকে মসজিদ, বাজার এবং এমন সমাবেশ যেখানে তারা মুসলমান অথবা যারা যুদ্ধরত নয় তাদের সাথে মিশে থাকে ইত্যাদি জায়গায় লক্ষ্যবস্তু বানানো থেকে বিরত থাকুন।

(উম্মতের উলামা)

১০। ওলামায়ে কেরামদেরকে সম্মান করুন এবং তাদের সম্মান রক্ষা করুন যেহেতু তারা নবীদের (আঃ) উত্তরাধিকারী এবং এই উম্মতের

নেতা। এই দায়িত্ব ঐসব আলেমদের প্রতি পালন করা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ যারা সত্য প্রকাশ করেন এবং এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। ওলামায়ে সু' (খারাপ আলেম) দের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ, তাদের দ্বারা সৃষ্ট সংশয় দূরীকরণ এবং তাদের মুনাফিকীর বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল-প্রমাণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তাদের সাথে না যুদ্ধে জড়ানো উচিত, আর না তাদের হত্যা করা উচিত, তবে যদি তারা মুসলমান ও মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন সামরিক কুকর্মে জড়িত থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

১১। অন্যান্য ইসলামী দলের ব্যাপারে করণীয়:

ক. তাদের সাথে যেসব বিষয়ে আমরা একমত সেগুলোতে সহযোগিতা করি এবং যেগুলোতে আমাদের একে অপরের মাঝে মতভেদ আছে সেগুলোতে সংশোধন করি।

খ. আমাদের মৌলিক সংঘাত হলো, ইসলামের শত্রুদের সাথে এবং যারা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে। সুতরাং, অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে আমাদের মতপার্থক্য যেন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সামরিক, দাওয়াহ, আদর্শিক অথবা রাজনৈতিক সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়।

গ. যদি কোন দল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততার দাবি করে এবং কখনোও আমাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসী কাফের শত্রুদের পক্ষে যুদ্ধে জড়ায় তবে তা সর্বনিম্ন এমন নূন্যতম প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রতিহত করা উচিত যার ফলে তার সীমালঙ্ঘন বন্ধ করা যায়, যেন মুসলমানদের মাঝে বিভেদের দরজা বন্ধ থাকে এবং যারা শত্রুর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত নয় তাদের ক্ষতি না হয়।

১২। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের বিপ্লবের ব্যাপারে করণীয়:

সমর্থন – অংশগ্রহণ – দিকনির্দেশনা

ক.সমর্থন:মজলুমকে জালেমের বিরুদ্ধে সাহায্য করা, সে মুসলমান হোক অথবা অমুসলিম হোক, ইসলামী শরীয়তে এটি বাধ্যতামূলক।

খ.অংশগ্রহন: জালেমদের বিরুদ্ধে মজলুমদের সাহায্য সহযোগিতা করা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের অন্তর্ভুক্ত, যা করা শরীয়তে আমাদের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ. দিক-নির্দেশনা: বিপ্লবী কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তাদের উচিত আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মাধ্যমে শরীয়তকে সুউচ্চে তুলে ধরে একটি ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা।

১৩। এমন প্রত্যেককেই উৎসাহিত এবং সমর্থন করা উচিত যারা মুসলমান মজলুমদের অধিকারের পক্ষে থাকে এবং সে তার কথা, মতামত অথবা কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধেসীমালঙ্ঘনকে মোকাবেলা করে। মৌখিক অথবা শারীরিকভাবে সরাসরি এমন মানুষদের কোন ভাবে ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের সমর্থক থাকে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের শত্রুতা না করে।

১৪। মুসলমানদের অধিকার রক্ষা করুন এবং তাদের পবিত্রতাকে শ্রদ্ধা করুন যেখানেই তারা থাকুক না কেন।

১৫। জুলুমের শিকার হয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জালেমের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করুন হোক তারা মুসলমান অথবা অমুসলিম। যারাই মজলুমের সাহায্য করে তাদেরকে উৎসাহিত করুন যদিও সে অমুসলিম হয়।

(মিথ্যা অপবাদ ও ভুলত্রুটির ব্যাপারে)

১৬। মুজাহিদীনদের অবশ্যই এমন প্রত্যেক মিথ্যা ও অন্যায় অপবাদের সংশয় নিরশন করতে হবে যা তাদের বিরুদ্ধে করা হয় এবং এই ধরনের অপবাদের ব্যাপারে প্রকৃত সত্যকে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরতে হবে। এবং যদি কখনো মুজাহিদীনদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, কোন একটা নির্দিষ্ট ভুল তাদের পক্ষ থেকে হয়ে গেছে তবে তাদেরকে অবশ্যই এর জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং জনসমক্ষে সেই ব্যক্তি যেই ভুলে পতিত হয়েছে তার থেকে

নিজেদেরকে পৃথক ঘোষণা করতে হবে এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করতে হবে শরীয়তের দাবি অনুযায়ী এবং মুজাহিদীনদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী।

(আহবান)

১৭। পরিশেষে, আমরা কায়েদাতুল জিহাদের (আল কায়েদাহ) অধীনস্থ সংগঠনের প্রধানদের এবং আমাদের সকল সমর্থক এবং সহানুভূতিশীলদের এই মর্মে আহবান জানাচ্ছি যে, তারা যেন এই নির্দেশনাগুলো তাদের অনুসারীদের মাঝে ছড়িয়ে দেন হোক তা দায়িত্বশীল কোন অবস্থান অথবা সাধারণ ব্যক্তি বিশেষ। কারণ এই নথির মধ্যে লুকায়িত কোন গোপন বিষয় নেই, বরং এটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। এর উদ্দেশ্য হলো, শরীয়াতের হুকুমের পরিপন্থী নয় এবং এর মূলনীতিগুলোর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী জিহাদী কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতায় বর্তমান পর্যায়ে শরীয়তের বিধি বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত ইসলামের স্বার্থসমূহের সরক্ষণ করা এবং এগুলোকে সকল প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে হেফাজত করা।

আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করি এবং তিনিই হলেন সেই একমাত্র সত্তা যিনি সঠিক পথের নির্দেশনা দেন। এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা, মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবাগণের প্রতি। আমাদের শেষ কথা এটাই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগতসমূহের রব।

আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনায় লিখিত

আপনাদের ভাই,

আইমান আল-জাওয়াহিরী

ইসলামের সমর্থনে একটি প্রামাণ্যপত্র

উৎস: আস-সাহাব মিডিয়া

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহবান

"আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশ" এর বাংলাদেশী শাখা "আনসার আল-ইসলাম" এর পক্ষ থেকে

"A Call To The Ummah"

সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলে কারিম এর উপর।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"আর তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে এবং জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন"। (সূরা তওবা, আয়াতঃ ৩৬)

ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ক্রুসেডার, যায়নবাদি ইহুদি ও ব্রাহ্মণ্যবাদি শক্তির চালানো বর্তমান এই যুদ্ধের বাস্তবতা হল এই যে, এ যুদ্ধ হল এক সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী যুদ্ধ। এটি নিছক দুটি বিরোধী পক্ষের মাঝে যুদ্ধ নয়, বরং এ হল এমন দুটি আদর্শের অস্তিত্বের লড়াই যে আদর্শদ্বয় সহাবস্থান করতে পারে না। এ হল হক্ব ও বাতিলের চিরন্তন যুদ্ধ, যাতে তৃতীয় কোন পক্ষ নেই। এই যুদ্ধ একই সাথে অস্ত্র ও আদর্শের। এ যুদ্ধ যেমন তলোয়ারের, তেমনি কলমেরও। এ যুদ্ধ হলো সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক।

বৈশ্বিক কিংবা আঞ্চলিক, যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন, সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী এ যুদ্ধের বাস্তবতা চিন্তাশীল সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। ইসলাম বিদ্বেষী কাফির-মুশরিক এবং তাদের আজ্ঞাবহ মুরতাদ ও মুনাফিক গোষ্ঠী তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রচারমাধ্যমের সকল শক্তি প্রয়োগ করছে ইসলামকে মুসলমানদের জীবন, রাষ্ট্র, সমাজ ও মানসপট থেকে মুছে দেয়ার জন্য। আর যদি তারা তাদের সামরিক আগ্রাসন সাময়িক ভাবে কখনো বন্ধ রাখেও, তবু তাদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ তারা নিরন্তর চালিয়ে যায়।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা মারাত্মক। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে।'[1]

উপমহাদেশের এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাপ্রবাহকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে, আমাদেরকে এই সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী যুদ্ধের আলোকে বাস্তবতাকে বুঝতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে, এই তাগুতি শাসনের সংসদ থেকে শুরু করে জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে, প্রশাসন থেকে শুরু করে বিচার-বিভাগে, সচিবালয় থেকে শুরু করে চেম্বার অফ কমার্সে, নিরাপত্তা বাহিনী থেকে শুরু করে প্রেস ক্লাবে, কর্পোরেট জগত থেকে শুরু করে কৃষি ও কুটির শিল্পে - প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদি শক্তি যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, তা এই সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী যুদ্ধেরই অংশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সকল গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর উপর, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের উপর, প্রচারমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের উপর ক্রুসেডার ও হিন্দুত্ববাদী শক্তি যে আধিপত্য কায়েম করেছে, তা এই যুদ্ধেরই অংশ। রামপাল থেকে রূপপুর, বিনা শুল্কে ট্রানজিট থেকে শুরু করে ভারতীয় টিভি চ্যানেল ও সিনেমার মাধ্যমে নোংরামিপূর্ণ, শিরকী সংস্কৃতির অবাধ প্রচার-প্রসার, সব একই সূত্রে গাঁথা।

---

[1]. (সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ১১৮

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে, সম্প্রীতি ও ঐক্যের অজুহাতে মুসলিম তরুণ-তরুণীদের মাঝে মুশরিকদের বিভিন্ন উৎসব ও বিশ্বাসের স্বাভাবিকীকরন, সুকৌশলে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যবইয়ের মাঝে ইসলামবিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসী বিভিন্ন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়ার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মগজধোলাই, কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি এবং কওমী শিক্ষা কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতির আড়ালে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর সিলেবাসকে নিয়ন্ত্রনের হীন প্রচেষ্টা, মসজিদের মিম্বর থেকে সরকারী খুতবা দিতে বাধ্য করণ, মানবতা ও জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে দ্বীন ইসলামের সমালোচনা, মুক্তচিন্তা আর বাক-স্বাধীনতার নামে রাসূলুল্লাহর উপর আক্রমণ, ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানো, মানবাধিকারের নামে সমকামিতার মতো জঘন্য বিকৃতির প্রচার, যৌন শিক্ষার নামে পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদেরকে যিনা-ব্যাভিচার শিক্ষা দেয়া – এ সবকিছু এ যুদ্ধেরই অংশ।

আরাকানে মুসলমানদের উপর রাষ্ট্রীয় তদারকিতে বৌদ্ধদের চালিত জাতিগত নিধন, ভয়ানক মানবিক বিপর্যয়ের পরও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নির্লিপ্ততা, তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলোর উদাসীনতা, ব্যাপক মাত্রায় মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হবার পরও আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত জাতিসংঘের নিস্ক্রিয়তা, সর্বদা মানবাধিকারের সবক দেওয়া বুদ্ধি-ব্যবসায়ী আর 'শান্তির দূত'দের নির্বাক থাকা – এসবই ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সর্বাত্বক এ যুদ্ধেরই অংশ। জোরপূর্বক খিলাফতের দাবিদারদের কাছ থেকে কিছু ইয়াজিদিদের রক্ষা করার অজুহাতে যে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোট ইরাক ও সিরিয়া আক্রমণ করে, সেই একই পশ্চিমা-বিশ্ব রক্তে ভেসে যাওয়া আরাকানের ব্যাপারে থাকে নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, নির্বিকার। পোড়া মাংসের গন্ধ আর ধর্ষিতার আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে যাওয়া আরাকানের বাতাস এবং মুসলিমদের রক্তের নদী পশ্চিমা বিশ্বের 'মানবতাবোধ'কে জাগ্রত করে না। কিন্তু মানবতার নামে মুসলমানদের হত্যা করতে এই একই পশ্চিমা বিশ্ব কখনো পিছপা হয় না।

আরাকানের এ বাস্তবতা এই অঞ্চলের প্রতিটি মুসলমানদের সামনে আবারো এই সত্যকে সন্দেহাতীতভাবে তুলে ধরেছে যে, যদি অধিকার

আদায় করতে হয়, তবে তা মুসলমানদের নিজেদেরকেই করতে হবে কারণ পশ্চিমাদের সৃষ্ট 'মানবতার' সংজ্ঞায় মুসলিম রক্তের কোন দাম নেই। তাই কোন সংঘ, কোন সরকার, কোন সেনাবাহিনী, কোন সংস্থা, কোন শান্তি-পুরস্কার বিজেতা মুসলমানদের রক্ষা করতে আসবে না। যদি নিজেদের রক্ষা করতে হয়, যদি নির্যাতিত মুসলমান নর-নারী ও শিশুদেরকে কাফির-মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করতে হয় তাহলে মুসলমান যুবাদেরকেই সেই দায়িত্ব নিতে হবে।

যদি এ ভূখন্ডের মুসলমানরা তাদের নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্য করতে চান, যদি প্রবাহিত এই পবিত্র রক্ত তাদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে, যদি মহান আল্লাহর সামনে এই রক্তের দাবির ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবার ভয় তাদের অন্তরগুলোকে প্রকম্পিত করে, তাহলে তাদের এ সত্য অনুধাবন করতে হবে যে, নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এ ভূখন্ডের সকল উলামায়ে কিরাম, তলিবুল'ইলম, ইসলামী দলসমূহ এবং সাধারণ মুসলিমদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এই দায়িত্ব তাদের নিজেদের কাঁধেই নিতে হবে। পশ্চিমা ক্রুসেডার ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দালাল তাগুত সরকার কখনই মুসলমানদের সহায়তায় এগিয়ে যাবে না। প্রতারণা, নিফাকি আর বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এ অঞ্চলের মুসলমানদের করণীয় এবং এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা উপরোক্ত প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই নির্ধারন করতে হবে। কারণ বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ আপাতদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় কিংবা তৃপ্তিদায়ক হলেও আদতে তা মূল্যহীন। তাই এ অঞ্চলের তাওহিদী জনতা ও বিশেষভাবে মুসলিম যুবকদের প্রতি আমাদের আহবান হলঃ

প্রথমত, এ সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী সংঘাতের বাস্তবতা ও স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হোন, কারণ এ যুদ্ধের বাস্তবতা ও ব্যপ্তিকে স্বীকার ও অনুধাবন করা ছাড়া কার্যকরীভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সম্ভব না। তাওহিদবাদী প্রত্যেক যুবকের জন্য আবশ্যক হলো আত্মতৃপ্তি

ও গা-বাচানোর মনোভাব ঝেড়ে ফেলে ঐ দায়িত্বকে স্বীকার ও গ্রহণ করা, যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ প্রজন্মের মুসলিমদের কাছে অর্পণ করেছেন। নিশ্চয় রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টিজগতে দুর্ঘটনাবশত কিছু ঘটে না। এই সময়ে, এই প্রেক্ষাপটে, আপনার অবস্থানও কোন দুর্ঘটনা নয়। চারদিকে ঈমানের বাতাস বইছে, শাহাদাতের বাজার খুলে দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহর দ্বীনের সমর্থনে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের সুযোগ আজ মুমিনদের হাতের নাগালে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মুজাহিদিন সংগঠন, উমারা ও উলামগণের বক্তব্য, বিবৃতি ও কিতাবাদি অধ্যয়নে এবং তাদের দিকনির্দেশনা অনুসরণে মনোযোগী হোন। নিশ্চয়ই সঠিক মানহাজ, সঠিক আক্বিদা, যোগ্য নেতৃত্ব, উপযুক্ত পরিকল্পনা, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, শোনা ও মানার মনোভাব ছাড়া কেবল বিচ্ছিন্ন কিছু কর্মকান্ড কিংবা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তার অনুসরণের মাধ্যমে উম্মাহর পক্ষে এ যুদ্ধে বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সায়্যিদিনা উমর (রাঃ) এর সেই কথাঃ

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ

“জামায়াত ছাড়া ইসলাম নেই, ইমারাহ ছাড়া জামায়াত নেই, আনুগত্য ছাড়া ইমারাহ নেই”। (জামিউল বায়ানিল ইলম লি ইবনে আব্দুল বার)

তৃতীয়ত, এ যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক অক্ষ নিয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হোন। জিহাদী ময়দানের কেন্দ্রে অবস্থানকারী ব্যক্তিরাই হক্ব ও বাতিলের এ যুদ্ধে মিডিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ, হাকিমুল উম্মাহ শায়খ ডঃ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহসহ অন্যান্য মুজাহিদিন উমারাহ ও উলামাগণের বিভিন্ন বক্তব্যে বারংবার যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল, বর্তমান যুগে যুদ্ধের অর্ধেক কিংবা তার চেয়েও বেশী হল মিডিয়া। তাই এ মিডিয়া জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন ও হক্ব আদায় করা আমাদের সকলেরই একটি আবশ্য কর্তব্য। এটি এমন এক দায়িত্ব যার ব্যাপারে ময়দানে অবস্থান করা মুজাহিদিন আফসোস করেন! অতএব এ দায়িত্বকে, জিহাদি মিডিয়ার গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

চতুর্থত, আপনাদের প্রাণপ্রিয় তানজীম আল-কায়েদা শুধু একটি দলের নাম নয় বরং এটি একটি আদর্শ, একটি মানহাজ। এটি বর্তমান যুগে সফলভাবে আল্লাহর রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) আদর্শবাহী দলের নাম। তাই আপনারা এই আদর্শের শিক্ষাকে গ্রহণ করুন এবং এর উপর কায়েম হয়ে যান। যদি এই আদর্শ অনুসারে মুজাহিদিন নেতৃবৃন্দ ও উলামাগণের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী দাওয়াতি ও মিডিয়ার ময়দানে আপনি কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন, তাহলে আপাতত মুজাহিদিনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম না হলেও আপনি এই জিহাদী কাফেলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই গণ্য হবেন। অতএব, আমাদের সাথে সংযুক্তিকে কাজ শুরু করার একটি পূর্বশর্ত না বানিয়ে, আপনার কাজকে সংযুক্তির একটি মাধ্যমে পরিণত করুন। মুজাহিদিন ভাইদের সাথে সম্পর্কিত হবার আগ পর্যন্ত মিডিয়ার জিহাদ জারি রাখুন।

পঞ্চমত, নিজের সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করুন। নিশ্চয় এ সময়ের জন্য আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। হক্বকে বোঝার পর, তাওহিদের অর্থ বোঝার পর যে দায়িত্ব একজন মুসলিমদের উপর অর্পিত হয় অবশ্যই সে দায়িত্বের ব্যাপারে আমরা সবাই জিজ্ঞাসিত হব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমগ্র মানব জাতির মাঝে কিছু মানুষকে দ্বীন ইসলামের উপলব্ধি দান করেছেন। আর বর্তমান বাস্তবতা হল এই যে, এই পুরো মুসলিম উম্মাহর মাঝে কিছু মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশুদ্ধ তাওহিদ ও জিহাদের উপলব্ধি দান করেছেন। তাই এ নিয়ামত লাভ করার পরও যদি আপনি আপনার দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল থাকেন, তবে অবশ্যই তা হবে আল্লাহর এই নিয়ামতের না-শোকরী।

অতএব হেদায়েত দানের মাধ্যমে যে দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার উপর অর্পণ করেছেন, সেই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হোন। কোন ব্যক্তির মুজাহিদিনের সাথে সংযুক্ত হতে না পারা, কিংবা হিজরত করতে না পারা - তার উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়ার কারণ নয়। বরং আমরা প্রত্যেককেই আমাদের নিজ নিজ অবস্থানের প্রেক্ষিতে

জবাবদিহি করতে হবে। তাই নিজ অবস্থান থেকে সাধ্যমত আল্লাহর দ্বীনকে নুসরত করার কাজে সচেষ্ট হোন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন আমাদের অমুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কাফির ও মুমিনদের পৃথক করতে চান, তাঁর প্রিয় বান্দাদের জান্নাতে প্রবেশ করাতে চান, আর তাঁর কাছে আমাদের কাছ থেকে পৌছায় কেবল আমাদের তাক্বওয়া।

মনে রাখবেন ইসলামে জড়তার কোন স্থান নেই। হয় একজন ব্যক্তি ঈমানের পথে ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে অথবা তার অবস্থার অবনতি হবে। এর মাঝামাঝি কোন অবস্থান নেই। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি এই দুই অবস্থার কোনটিতে আছেন? আপনি কি সাধ্যমত নিজের উন্নতির চেষ্টা করছেন? নাকি আপনি এক ধরাবাঁধা ছাঁচে নিজেকে আটকে ফেলেছেন?

জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তার কোন সুযোগ আমাদের নেই। সেই জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হোন যা আসমান ও যমীনের চাইতে প্রশস্ত। আর তাই নিজের আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপটকে অজুহাত না বানিয়ে, হিজরত করতে না পারা কিংবা মুজাহিদিনের সাথে সংযুক্ত হতে না পারাকে নিজের নিষ্ক্রিয়তার পক্ষে যুক্তি হিসেবে উত্থাপন না করে, শয়তানের ওয়াসওয়াসায় কান না দিয়ে - নিজ অবস্থান থেকে নিজ দায়িত্ব পালনে, নিজ সময়ের সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

'বরং মানুষ নিজে নিজেকে খুব ভাল করে জানে। সে যতই অজুহাত পেশ করুক না কেন'। (সুরা কিয়ামাহ, আয়াতঃ ১৪-১৫)

নিশ্চয় সাফল্য আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমাদের কাজ হল ইখলাসের সাথে আমাদের সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দেয়া।

এই আমানতের হক্ব আদায় এবং অর্পিত এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সম্মানিত মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা আমরা তুলে ধরছি ইনশাআল্লাহ।

মনস্তাত্ত্বিক ও মিডিয়া জিহাদ

এ ভূখন্ডে যাদেরকে আল্লাহ তাওহিদ ও জিহাদের ব্যাপারে হেদায়েত দান করেছেন তাদের সকলের জন্য আবশ্যক হল সাধ্যমত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। তাই সকল তাওহিদবাদী ভাই-বোনদের আমরা এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহনের আহবান জানাচ্ছি। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন ময়দান হল মিডিয়া। মনস্তাত্ত্বিক ময়দানে তথা মিডিয়া জিহাদের ক্ষেত্রে মুজাহিদ ভাইদের বিশেষভাবে যে বিষয়গুলোর দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজনঃ

- সাধারণ মুসলিম জনগণকে সামনে রেখে মিডিয়া কার্যক্রমের ভিত্তি স্থাপন করুন। জনবিচ্ছিন্ন প্রচারণা, জনবিচ্ছিন্ন গেরিলার চাইতেও দুর্বল। মনে রাখুন, আমরা নিজেদেরকে উম্মাহর মাঝে অভিজাত কিছু বলে মনে করি না, বরং নিজেদেরকে উম্মাহর অংশ মনে করি। মিডিয়ার কার্যক্রম তখনই কার্যকর হয়, যখন তা গণমানুষের বোধগম্য করে উপস্থাপন করা হয়।

- আগ্রাসী ক্রুসেডার, যায়নবাদি ও ব্রাহ্মণ্যবাদি গোষ্ঠীর চক্রান্ত সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করে তুলুন। তাদের অনুগত শাসকগোষ্ঠী ও নিরাপত্তা বাহিনী এবং কাফির-মুশরিকদের আজ্ঞাবাহী মিডিয়ার অপকর্ম জনগণের সামনে তুলে ধরুন।

- তাওহিদের সম্পূর্ণ ও সঠিক ব্যাখ্যা উম্মাতের সামনে সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরুন। বিধান এবং সার্বভৌমত্ব যে কেবল একমাত্র আল্লাহরই - এ বিষয়টি তাদেরকে জানিয়ে দিন।

- গণতন্ত্রের বাস্তবতা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতারণা, গণতন্ত্র ও ইসলামের সংঘাত এবং সর্বোপরি মানব রচিত ব্যবস্থার বিভ্রান্তির মোকাবেলায় আসমানী বিধানের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরুন। বিভিন্ন মানবরচিত মতবাদের অনুসরণকারী দলের সাহায্য-সমর্থনের ঈমান-বিধ্বংসী পরিণাম সম্পর্কে মুসলিম জনগণকে সচেতন করে তুলুন।

- ইসলামভিত্তিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সকল ভূমিসমূহের মুসলমানদের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করুন। উম্মাহর উপর ক্রুসেডার, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইহুদিদের আক্রমণের ব্যাপারে আপনার চারপাশের মুসলিমদেরকে, উলামায়ে কিরামকে নিয়মিত অবহিত করুন।

- আল্লাহর রাহে ভালোবাসা এবং আল্লাহর রাহে শত্রুতার মূলনীতি সম্পর্কে উম্মাহকে অবহিত করুন। উম্মাহর এই কঠিন সময়ে যেন প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী উম্মাহর সাহায্যে এগিয়ে যায়, এর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করুন।

- তাগুতী শাসনব্যবস্থা ও মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করতে উম্মাতকে উদ্বুদ্ধ করুন। নিশ্চয় এ হল নবীওয়ালা একটি দাওয়াতী কাজ। আর এরা তো এমন পর্যায়ের তাগুত যারা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে মুশরিকদের আরাধ্য দেবী 'দুর্গার' কাছে প্রার্থনা করার আহবান জানায়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন উপাস্যের কাছে দুয়া করার আহবান জানানোর ধৃষ্টতা এ জমিনের অন্য কোন তাগুত এখন পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। হে মুসলমানগণ, এদেরকে সর্বাত্মকভাবে পরিহার করুন।

- শিথিলতা ও চরমপন্থা থেকে মুক্ত সঠিক মানহাজ, উম্মাহর কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগকারী মুজাহিদিন এবং উম্মাহর উপর জোরপূর্বক কর্তৃত্ব দাবিকারীদের মাঝে পার্থক্য সাধারণ মুসলিমদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন। নিশ্চয়ই এ দুটি অসম বিষয়কে সমান প্রমাণ করতে দাজ্জালী মিডিয়া সর্বদা সচেষ্ট।

- উম্মাহর প্রতি নবীওয়ালা মহব্বত রেখে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করুন, কঠোরতা পরিত্যাগ করুন। দাওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে উত্তম আদব বজায় রাখুন। অত্যাধিক হাসি-তামাশা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে বাক্-বিতন্ডা ইত্যাদি পরিত্যাগ করুন। নিশ্চয়ই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন উত্তম আদব ও আখলাকের অধিকারী। তারা আরামপ্রিয় কিংবা অলস ছিলেন না। নিশ্চয় তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা যৌবনে পদার্পনের পরও অধিকাংশ সময়ই কিশোরদের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকে। তারা ছিলেন উগ্রতা ও ভাঁড়ামিপূর্ণ আচরন থেকে মুক্ত।

- অনলাইনে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াহ ইলাল্লাহ জারি রাখুন। বিভিন্ন ই-মেইল গ্রুপ, ফেইসবুক, টুইটার, ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াহ, এ সংক্রান্ত বই, প্রশ্নোত্তর, অডিও, ভিডিও ছড়িয়ে দিন। মুজাহিদিনের প্রচারনার কাজে ইন্টারনেট, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে সময়ের অপচয় এবং অন্তরে নিফাক ও রিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক। এ হল এমন এক অস্ত্র যা অস্ত্রধারনকারী এবং শত্রু উভয়েরই ক্ষতি করতে সক্ষম। এ মাধ্যমকে কিভাবে আপনি ব্যবহার করবেন তা সম্পূর্ণভাবে আপনার সিদ্ধান্ত। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের এ ময়দানে আপনি সময় কাটাতে পারেন ইখলাসের সাথে আল্লাহর দ্বীনকে এবং মুজাহিদিনকে নুসরত করার কাজে অথবা আপনি এ মাধ্যমকে ব্যবহার করতে পারেন অলস বিনোদন, মূল্যহীন আড্ডা আর অপ্রয়োজনীয় কথার মাধ্যমে সময় নষ্ট করে।

- মনস্তাত্ত্বিক ও মিডিয়া জিহাদের এ ময়দানে উল্লেখিত কাজগুলোর গুরুত্ব যতটুকু, এগুলোর প্রচারের গুরুত্ব তার চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেশি। কোন মিডিয়ার সফলতা শুধুমাত্র প্রকাশনার সফলতার উপর নির্ভর করে না, এর প্রচারনার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। আর তাই শুধুমাত্র প্রকাশনা তৈরি করলেই হবে না, এসকল প্রকাশনাকে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই তাওহীদ ও জিহাদের উপর অনলাইনে মজুদ বই-প্রবন্ধ-অডিও-ভিডিও, বিশেষ করে মুজাহিদিনের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন মিডিয়ার প্রকাশনা যথাসম্ভব ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। মুজাহিদিনের বক্তব্য, বিশ্লেষন ও বার্তা প্রচারের মাধ্যমে উম্মাহর সামনে সঠিক দিক-নির্দেশনা তুলে ধরুন।

- শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যবইয়ের মধ্যে শিরক, কুফর ও ইসলামবিদ্বেষী যে সকল বিষয় ইসলামের শত্রুরা অন্তর্ভূক্ত করেছে, সেগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরুন। কাফির-মুশরিক এবং তাদের আজ্ঞাবহ মুরতাদ ও মুনাফিক গোষ্ঠী দীর্ঘদিনের প্রচারনার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজিক জীবনে

যে সকল কুফর, শিরক ও ঈমান-বিধ্বংসী বিষয়ের স্বাভাবিকীকরন করেছে, সেগুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করুন।

- সকল দাওয়াতি ও মিডিয়া কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমীরুল মুজাহিদীন শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরির (হাফিজাহুল্লাহ) এর 'জিহাদের ব্যাপারে সাধারণ দিক-নির্দেশনা'তে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহের আলোকে আপনার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করুন। যেমনঃ উম্মাহকে আগ্রাসী ক্রুসেডার, যায়নবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ব্যাপারে সচেতন করা, উম্মাহর মধ্যে তাওহীদ ও জিহাদের মানহাজের প্রচার ও এর যৌক্তিকতা দলীল-আদিল্লাসহ তুলে ধরা, মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং বর্তমান মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উম্মাহকে তাহরীদ করা।

উল্লেখ্যঃ শুধুমাত্র মুজাহিদিনের আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মিডিয়ার প্রকাশনা বা অডিও-ভিডিওর অনুবাদ কিংবা ডাবিং এর মাধ্যমে এই কাজ সম্পূর্ন হবে না যদিও এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মিডিয়ার মাধ্যমে যে বার্তাটি আপনি সাধারণ মুসলিমদের কাছে পৌছে দিতে চাচ্ছেন তা আপনাকে সাজাতে হবে এদেশের মানুষের উপযোগী করে, তাদের চিন্তা-চেতনা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে। অন্যথায় শত প্রচেষ্টার পরও আপনার দাওয়াতি কাজ কিংবা মিডিয়ার প্রকাশনা দেশের আপামর জনগণের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হবে না। শিক্ষা গ্রহণ করুন মুজাহিদিনদের ইমাম মুহাম্মাদ □ এর উদাহরন থেকে, যিনি মরুবাসী বেদুঈনের সাথে কথা বলতেন তার বোধগম্য ভাষায় এবং শহরবাসী সম্ভ্রান্তদের সাথে কথা বলতেন তাদের বোধগম্য ভাষায়। বাংলাদেশের পূর্ববর্তী জিহাদি সংগঠনগুলোর ইতিহাস এবং জোরপূর্বক খিলাফতের দাবিদারদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আর নিশ্চয় মুমিন একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

- আপনি সাধারণ মুসলিম জনগণের ইলম ও চিন্তা-চেতনাকে সামনে রেখে, তাদের উপযোগী দাওয়াতি ও মিডিয়ার প্রকাশনার প্রতি মনযোগী হোন। নিজেকে তাদের অবস্থানে কল্পনা করে চিন্তা করুন।

স্মরণ করে দেখুন, সর্বপ্রথম তাওহীদ কিংবা জিহাদের দাওয়াত পাবার পর আপনার মনে কোন প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? প্রথমেই কি জিহাদের কোন ময়দানের সূক্ষ কোন খবর কিংবা দূরবর্তী কোন ময়দানের কোন উমারাহ কিংবা উলামার ব্যাপারে জানাটাই আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল? নাকি এই মানহাজ হক্ব হবার ব্যাপারে, এই মানহাজ কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী ও ইসলামের জন্য কল্যাণকর হবার ব্যাপারে নানা প্রশ্নের উত্তর খুজে পাওয়া আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল? তাই, সাধারন জনগণের জন্য তাদের ভাষায়, তাদের অবস্থানে গিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে।

- একইভাবে বিভিন্ন ইসলামী দলের জন্য তাদের অবস্থান ও তাদের বিভিন্ন সংশয় ও ভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে কিছু প্রজেক্ট হাতে নিতে পারেন। এটা হতে পারে ছোট প্রবন্ধের আকারে কিংবা কোন ইমেজ কিংবা কয়েক মিনিটের একটা অডিও কিংবা ভিডিওর মাধ্যমে যা দিয়ে তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। তবে মনে রাখা উচিত, মানুষকে কথা দিয়ে আহত করে নিজের উদ্দিষ্ট দাওয়াত কবুল করানোর আশা বৃথা, বরং সেখানে থাকতে হবে উম্মাহর প্রতি নবী-ওয়ালা দরদ।

- বর্তমান যুগের গতিশীল জীবনপদ্ধতি ও কুফরপন্থী-ফাসেকী মিডিয়াগুলোর প্রভাবের কারণে যে কোন বিষয়ে সাধারণ মানুষ খুব অল্প সময়ই মনযোগ ধরে রাখতে পারে। তাই মিডিয়া কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরী। মিডিয়ার সফলতা নির্ভর করে দর্শকের কাছে নিজের বার্তা পৌছে দেয়া এবং দর্শককে এর দ্বারা প্রভাবিত করার মাধ্যমে। তাই অনেক বড় অডিও/ভিডিওর পরিবর্তে ছোট আকারের অডিও/ভিডিও তৈরী করা অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। অনেক সময় একটা ছোট ইমেজ কিংবা একটা ছোট কথাও জনগণের মনে ব্যাপক সারা ফেলে। কারণ সাধারন মুসলিমদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে একটি উচ্চমানের বড় ভিডিও দেখার চাইতে একটি মধ্যমমানের ছোট ভিডিও দেখার সম্ভাবনা বেশি। আপনারা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আমিরুল মুজাহিদিন শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরি (হাফিজাহুল্লাহ) এর সাম্প্রতিক বয়ানগুলোও সংক্ষিপ্ত

আকারের। তবে বছরে হয়তো দুই-একটা বড় ভিডিও তৈরী করা যেতে পারে কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য।

- সর্বশেষ যে বিষয়টার দিকে আপনাদের মনযোগ আকর্যন করবো তা হচ্ছে, মুজাহিদিনের মিডিয়ার প্রকাশনাগুলোকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আপনি বেশী বেশী চিন্তা-ফিকির করুন। অর্থাৎ কিভাবে তাওহিদ ও জিহাদের বার্তাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছে দেয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা করুন। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিভাবে আপনাদের তৈরী প্রকাশনাগুলোকে বেশী বেশী মানুষের কাছে পৌছানো যায়, এই ব্যাপারে আপনাদের মাশোয়ারাগুলো পরিচিত দ্বীনি ভাইদের কাছে তুলে ধরুন। এর গুরুত্ব বারংবার তাদের সামনে পেশ করুন। কারণ মিডিয়ার সাফল্য অনেকাংশেই তার প্রচারনার উপর নির্ভরশীল। সর্বোৎকৃষ্ট মানের একটি প্রকাশনাও যদি সাধারন মানুষের কাছে না পৌছায় তাহলে চূড়ান্ত হিসেবে মিডিয়া প্রকাশনা হিসেবে তা অনেকাংশেই ব্যর্থ, যদিও ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে এর জন্য প্রতিদান পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি কষ্ট করে একটি ইমেজ/অডিও/ভিডিও তৈরী করার পর যদি সেটা মাত্র একশত জনের কাছে পৌঁছায় তাহলে এই কষ্টের ফসলটা ঠিকমতো ঘরে তোলা হলো না। এর বিপরীতে যদি সেটা কয়েক হাজার কিংবা লক্ষাধিক মানুষের কাছে পৌছায়, তাহলে সেটা মূল উদ্দেশ্য অর্জনে অনেক বেশী এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে নির্দেশনা

সাধ্যমত মনস্তাত্ত্বিক ময়দানের লড়াইয়ে অংশগ্রহনের পাশাপাশি তাওহীদ ও জিহাদের মানহাজের পথিকদের জন্য ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু নির্দেশনা অনুসরণ করা জরুরী। ব্যক্তিগত পরিমন্ডলে করনীয়সমূহকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। দাওয়াহ ইলাল্লাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের (বিরোধীদের) সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক করুন যা সবচেয়ে ভাল"। (সূরা নাহল, আয়াতঃ ১২৫)

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে মিডিয়ার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নিজের পরিচিত পরিমন্ডলে সাধ্যমত দাওয়াহ ইলাল্লাহ জারি রাখা। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার আচরন, কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করা, নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধ্যমত ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা।

জেনে রাখুন, হিকমাহপূর্ণ উত্তম উপদেশ হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াতের পদ্ধতি। আর হিকমাহ মানে হচ্ছে সুন্নাহ, হক্ব ছেড়ে দেয়া কিংবা পরিবর্তন করা নয়। দাওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাহিদ ভাইদের যে সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিতঃ

- হাকিমুল উম্মাহ শায়খ আইমান আয যাওয়াহিরি (হাফিজাহুল্লাহ) এর 'জিহাদের ব্যাপারে সাধারণ দিক-নির্দেশনা' অনুযায়ী দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করুন।

- আল্লাহর পথে দাওয়াতকে সহজভাবে উপস্থাপন করুন যেমনভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াহ দিয়েছেন। সীরাত গ্রন্থগুলোতে দেখুন তিনি কত সহজ, সাবলীলভাবে মানুষকে হক্বের দিকে আহবান করেছেন। সবার আগে নিজ আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জনের কাছে তাওহীদের ও জিহাদের দাওয়াহ পৌঁছে দিন। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি ও মাদ্রাসাতে এই দাওয়াহ কার্যক্রম ছড়িয়ে দিন।

সামান্য বেতনের বিনিময়ে নিজের দ্বীন বিক্রি করে দেয়া তাগুতের এজেন্টদের হুমকি-ধমকিকে গুরুত্ব দিবেন না। আল্লাহর নবীগণকে (আঃ) আরো কত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে - সেটা মনে রাখুন। এই কঠিন পথ পাড়ি দেয়ার পরই বিজয় দান করা আল্লাহর সুন্নাত। তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করে অবশ্যই যাচাই করে নিবেন। এটা তাঁর ওয়াদা।

নিজ পরিবারকে দ্বীনের শিক্ষা দিন। বাচ্চাদেরকে মাদ্রাসায় শিক্ষা দিন বিশেষত কওমী মাদ্রাসায় দিন। অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন। নিজের বাসায়/বাড়িতে সাপ্তাহিক দ্বীনি হাল্ কা করার চেষ্টা করুন।

. তাওহিদ, জিহাদ, আল ওয়ালা ওয়াল বা'রা-সহ নানা বিষয়ে সঠিক শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনার বিভিন্ন উৎস যেমনঃ মুজাহিদিন উলামাদের লিখিত বই, প্রবন্ধ, অডিও, ভিডিও, এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়ার পেইজ ইত্যাদি সকলের মাঝে বেশী বেশী ছড়িয়ে দিন। আপনি বই কিনে বন্টন করুন, মেমোরী কার্ড কিনে সেটাতে এ সকল অডিও-ভিডিও কপি করে বন্টন করুন, সিডি-ডিভিডি আকারে এগুলো বিতরণ করতে থাকুন।

- ফুরুয়ী-ইখতিলাফী মাসআলার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। দ্বীনের মূল বিষয়সমূহ যথাঃ তাওহীদ, শিরক, কুফর, রিদ্দা, সুন্নাহ, বিদয়াত, জিহাদ ইত্যাদিতে মনোযোগ দিন। যে যে মাযহাব-মাসলাকে আছেন, তাকে সেটাতে রেখেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে শরীক করার চেষ্টা করুন। সবাইকে আপনার অনুসৃত মাজহাব-মাসলাকে শরীক করার চেষ্টা করবেন না। ফুরুয়ী মাসআলায় মুজতাহিদ উলামাগণের মতপার্থক্য শরীয়াতের একটি বৈধ বিষয়। এটা উম্মাহর জন্য প্রশস্ততা। তাই আপনি এসব মতপার্থক্যের পিছনে পড়ে থাকবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান সর্বদা সচেষ্ট থাকে মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার। আপনার মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হবার ব্যাপারে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে নিজের বিরুদ্ধে নিজে সাক্ষী হবার ব্যাপারে সতর্ক হোন।

- দাওয়াহ ইলাল্লাহ তথা জিহাদের সকল ক্ষেত্রেই একজন আলেম অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাই, আম্বিয়াদের উত্তরসূরী হিসেবে তারা যেন মসজিদের মিম্বর থেকে তাওহীদ ও জিহাদের কথা জনগণকে বলেন - সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করুন। তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন। তাদেরকে সম্মান করুন।

তাদের কাছে মুজাহিদ উলামাগণের বই / প্রবন্ধ পৌঁছে দিন। তারাই এগুলোর অধিক হক্বদার।

- আপনার আশেপাশের হক্বপন্থী আলেম ও তালেবুল ইলমদের খুতবা ও আলোচনাগুলো রেকর্ড করুন এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ফোরামে আপলোড করে উম্মাহর সকলকে শুনার সুযোগ করে দিন।

- আপনি যাদেরকে দাওয়াহ দিবেন তাদের তিন-চার জনকে নিয়ে একটি করে পাঠচক্র গড়ে তুলুন। প্রতি পাঠচক্রের জন্য একজন দায়িত্বশীল বা মাসউল ঠিক করে দিন। সেই দায়িত্বশীলের মাধ্যমে তাদের ইলম, তারবিয়্যাহ, দাওয়াহ, জিহাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যান।

- যাদের সামর্থ্য আছে, তারা উত্তম পদ্ধতিতে পিছনে বসে থাকা, জিহাদ বিরোধী ব্যক্তিদের সৃষ্ট বিভিন্ন সন্দেহ-শুবুহাত দূর করুন। উম্মাহকে নব্য-মুরজিয়া ও খারেজী গোষ্ঠীর বিষাক্ত থাবা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করুন। তাদের বিভিন্ন অযৌক্তিক দাবির অসারতা মুসলমানদের সামনে তুলে ধরুন।

- শরীয়াত কায়েমের এই জিহাদে যে যতটুকু সমর্থন করতে চায়, তাকে ততটুকুসহ কাজে শরীক রাখুন। কেউ যদি শুধু মুজাহিদিন এর জন্য দুয়া করতে রাজী থাকে, তাকে ততটুকুই করতে বলুন।

- তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

- আপনার এলাকার দ্বীনি ভাইগণ একত্রিত হয়ে জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করুন। সম্মিলিতভাবে দাওয়াতী কাজ করুন। সামর্থ্য অনুযায়ী দূর্গত, মজলুমদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। মনে রাখবেন, আপনার নিজের পাশের দুর্গত, মজলুমদের দেখার দায়িত্ব আপনারই। পর্যাপ্ত শক্তি অর্জিত হয়েছে মনে করলে, সামর্থ্য অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকায় আমরে বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকারের আ'মল শুরু করুন। এলাকার মুসলিম জনতাকে সাথে নিয়ে এলাকা থেকে মদ, গাঁজা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি দূর করার চেষ্টা করুন। নিজের দাওয়াতকে শুধুমাত্র জিহাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখবেন না।

- আপনি নিজ পরিসরে হক্ব দাওয়াত ছড়িয়ে দেন। আপনি নিজ পরিসরে আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর মিল্লাতের অনুসরণকারী একজন প্রতিনিধি হয়ে যান। যুবক ইব্রাহীম (আঃ) এর মত আপনি নিজ অবস্থানে অটল-অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে যান।

উল্লেখিত নির্দেশনার সবগুলোই হয়তো সবাই অনুসরণ করতে সক্ষম হবেন না। তবে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে নিজ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ না করে, হিকমতের সাথে এই নির্দেশনাগুলো যথাসাধ্য অনুসরণ করার।

২। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

"যদি সত্যিই জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের দৃঢ় সংকল্প থাকতো তাহলে অবশ্যই তারা যুদ্ধের জন্য কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনঃপুত ছিল না, তাই তাদের নিবৃত্ত রাখলেন এবং আদেশ হলো ঘরে বসা লোকদের মত তোমরা বসে থাকো।" (সূরা তওবা, আয়াতঃ ৪৬)

জেনে রাখুন, জিহাদ যেভাবে ফরজ, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণও সেভাবে স্বতন্ত্র আরেকটি ফরজ। মুজাহিদিনের সাথে শামিল হতে না পারার কারণে আপনি সরাসরি ক্বিতালে শরীক হতে না পারলেও, জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে কোন অজুহাত কাজে আসবে না।

জিহাদের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখুনঃ

- আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য নিজেকে শারিরীক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন। কঠিন পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন থাকার অভ্যাস করুন। আরাম-আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করুন। নিজ পরিবার-আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

ঘরকুনো মনোভাব ত্যাগ করে মাঝে মাঝে একা কয়েকদিন দূরের পথ সফর করুন। নিজেদের কুরবানীর পশু নিজে জবাই করুন। কঠিন ও পরিশ্রমের কাজ করুন। মাঝে মাঝে পায়ে হেটে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করুন, ক্যাম্পিং করুন। নিজেকে কষ্টসহিষ্ণুতার শিক্ষা দিন। নিজের কাজ নিজে করতে শিখুন। যেমনঃ রান্না করা, কাপড়-চোপড় ধোয়া, ঘর মোছা, টয়লেট পরিস্কার ইত্যাদি।

- নিজেকে আনসার হিসেবে গড়ে তুলুন। নিজের বাসায় একটি রুম মুজাহিদ ভাইদের জন্য বরাদ্ধ রাখুন। দুই-তিন জন মুজাহিদ ভাই যাতে দীর্ঘদিন আপনার বাসায় আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারেন, এ রকম ব্যবস্থা রাখুন।

- উলামায়ে রব্বানীদের সাথে থাকুন। উলামায়ে ছু'দেরকে পরিহার করুন। উলামায়ে হক্ব তো তারাই যারা আম্বিয়াগণের (আঃ) যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে জনগণকে কুফরের দিকে পরিচালনাকারী তাগুতকে বর্জনের আহবান জানান, ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের মতোই বর্তমান সময়ের তাগুত ও ইসলামের শত্রুরা তাদেরকে চক্ষুশূল মনে করে। তারা শাসকদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে নিরব দর্শক হয়ে থাকেন না। এটাই নববী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য। ঐ সকল উলামায়ে ছু'দের পরিহার করুন যারা আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী, বৃটিশদের রচিত আইনে শাসনকারী এ সকল শাসকদের সাথে উঠাবসা করে, তাদের অনুকম্পা ভিক্ষা করে এবং তাদের মসনদকে শক্তিশালী করে।

- যথাসম্ভব আরবী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করুন। তাওহীদ ও জিহাদের ইলম অর্জন করুন। সম্ভব হলে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যান। তাওহীদ ও জিহাদ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আরবী ও ইংরেজী যে সকল বই অনুবাদ হয়নি, সেগুলো অনুবাদ করতে থাকুন। অল্প অল্প করে হলেও এসকল কাজে সাধ্যমত সময় দিন। নিজের সময়কে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাজে খরচ করার চেষ্টা করুন।

- রাসূল ﷺ এর সীরাত এবং সাহাবা-তাবেয়ীগণের (রাঃ) জীবনী অধ্যয়ন করুন। মুসলিমদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই উম্মাহর জিহাদের ইতিহাস পড়ুন। ইসলামী খেলাফতের পতনের কারণ, খেলাফতের সময় রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন।

- চলমান দাজ্জালী-কুফরী বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দূর্বলতা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে সম্যক ধারণা অর্জন করুন। মুসলিম জনগণকে এর কুফল সম্পর্কে সতর্ক করুন।

- বিশেষভাবে পশ্চিমা সভ্যতার নগ্নতা, অনৈতিকতা, অসভ্যতা, মানবতা ও স্বাধীনতার গালভরা বুলির আড়ালে দ্বিমুখীতা ও ভন্ডামী সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করুন।

- জিহাদী নাশিদ তৈরী, অডিও, ভিডিও, ইমেজ এডিটিং শিখুন। ওয়েব সাইট তৈরী, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করুন।

- হ্যাকিং শিখুন। ইসলামের শত্রুদের বিভিন্ন সাইট ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য হ্যাক করে মুজাহিদিনের হাতে তুলে দিন।

- আমেরিকান, ভারতীয় ও অন্যান্য ক্রুসেডার দেশসমূহের বাসিন্দা, তাদের অফিস, থাকার জায়গা, বিনোদনকেন্দ্র, তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সাধ্যমত সংগ্রহ করুন ও সুযোগ মতো মুজাহিদনদেরকে পৌছে দিন। আপনার আশেপাশে তাগুতী সরকারের আজ্ঞাবহ মুরতাদ নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তা, ইসলামবিদ্বেষি বুদ্ধিজীবিদের কিংবা ইসলামের অবমাননাকারীদের অফিস, বাসা, দৈনন্দিন রুটিন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য নোট করে রাখুন। সুযোগমতো মুজাহিদিনের কাছে হস্তান্তর করুন।

- তাত্ত্বিকভাবে যথাসম্ভব অস্ত্র ও বোমা তৈরীর পদ্ধতি শিক্ষা করুন। এ সংক্রান্ত শিক্ষাকে ইন্টারনেটে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন।

- প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করুন।

- ইসলামী ব্যবস্থাপনা বিদ্যার বাস্তব কৌশলগুলো আয়ত্ব করুন। রাসুল ﷺ এর সীরাত, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনীতে এই ব্যাপারে ভাল ধারণা পাবেন। জিহাদী তানজীমগুলোর জন্য এটা খুবই জরুরী।

- সতর্কতার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। নিরাপত্তা বজায় রাখুন। মনে রাখবেন, আমরা অনলাইনে কাউকে আমাদের সাথে শরীক করি না। চেষ্টা জারি রাখলে একদিন আপনি বাস্তবে মুজাহিদিনের সাথে শরীক হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

এ প্রতিটি নির্দেশনা প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য না হলেও প্রত্যেকের উচিত সাধ্যমত এই নির্দেশনাগুলোর অনুসরণ করা। নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সাধ্যমত দ্বীনের জন্য কাজ করা এবং নিজেকে প্রস্তুত করা। মনে রাখবেন, আপনি যদি আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করেন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।

আপনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের সময়, শ্রম ব্যয় করুন, আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিদান দিবেন। সমস্ত মানবজাতি একত্রিত হয়েও আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, শুধুমাত্র আল্লাহ যা অনুমতি দিয়েছেন তা ব্যতীত। মনে রাখবেন, কলম তুলে নেয়া হয়েছে, কালি শুকিয়ে গেছে। আর মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

৩। তাযকিয়্যাতুন নফস।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়”। (সুরা আ'লা, আয়াত ১৪)

যুগে যুগে যারাই তাওহিদের ব্যাপারে আপোষ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থেকেছেন, তাদের সবাইকেই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যুগে যুগে তাওহিদের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরোধিতা করেছে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। আল্লাহর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে, তাওহীদি কাফেলার অভিযাত্রীরা দুর্গম পথে পরীক্ষিত হবেই।

আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক (تعلق مع الله) মজবুত না থাকলে এ পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব না। যদি ঈমান জীবন্ত না হয়, মজবুত না হয় তাহলে দুর্বল ভিত্তির উপর যতো বড়, যতো আলিশান দালানকোঠাই গড়ে তোলা হোক না কেন, তা যেকোন মূহুর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। আর তাই আত্মশুদ্ধি অর্জনের চেষ্টা জারি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের নফস তার সর্বাধিক নিকটবর্তী ও তার উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী শত্রু, তাই নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রনে আনুন, অন্যথায় সে আপনাকে নিয়ন্ত্রন করবে।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ

পবিত্র কুরআনের সাথে আপনার সম্পর্ক দৃঢ় করুন। নিয়মিত কুর'আন তিলাওয়াত করা। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমান কুর'আন পড়ার নিয়্যত করুন এবং চেষ্টা করুন। ধীরে ধীরে তিলাওয়াতের সময় বাড়াতে পারেন।

সকল প্রকার কবিরা গুনাহ থেকে নিজেকে হেফাজতে রাখুন। সগীরা গুনাহের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।

দৃষ্টির হেফাযত করুন। নিজের দৈনন্দিন রুটিনকে এমনভাবে সাজিয়ে নিন যাতে করে ফাহেশা ও অশ্লীলতা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা যায়।

পিতামাতার যথাসাধ্য খেদমত করুন। আল্লাহর হুকুমের মধ্যে থেকে তাদের আনুগত্য করুন। তাদের জন্য আপনার দয়ার ডানা বিছিয়ে দিন। আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায় করুন।

বেশী বেশী যিকির-আযকার করুন। বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যার আযকারগুলো আকড়ে ধরুন। জিহাদের ময়দানের মুজাহিদগণ এটা খুবই গুরুত্ব দিয়ে আ'মল করে থাকেন।

নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের চেষ্টা করুন। শেষ রাতে আল্লাহর নিকট নিজের ও উম্মাহর জন্যে কান্নাকাটি করে দোয়া করুন।

অন্তত দুই রাকাত হলেও নিয়মিত ইশরাকের নামাজে অভ্যস্ত হোন।

সপ্তাহে দুই দিন নফল রোযা রাখার চেষ্টা করুন। আইয়ামে বীজ এর রোযা রাখুন।

রাতে দীর্ঘসময় জেগে থাকার অভ্যাস ত্যাগ করুন, ফযরের পর না ঘুমানোর অভ্যাস করুন।

অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, আড্ডার অভ্যাস ত্যাগ করুন। কথার মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে দূরে থাকুন।

আমোদ-প্রমোদ ও হাসি-ঠাট্টায় সময় ব্যয় করার অভ্যাস ত্যাগ করুন। নিশ্চয় অত্যাধিক হাসি ও কৌতুক মানুষের অন্তরকে শক্ত করে দেয়।

নিজের আচরণ ও কথার ক্ষেত্রে রাসুল □ এর সুন্নাহর অনুসরণের চেষ্টা করুন। সবার সাথে আদব বজায় রেখে কথা বলুন, মুসলিম ভাইকে অগ্রাধিকার দিন, আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

স্থিতধী হবার চেষ্টা করুন। তাড়াহুড়া প্রবণতা ত্যাগ করুন।

নেককার, আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে অবসর সময় কাটান। আর মৃত্যুর আগে মুমিনদের অবসরই বা কোথায়!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে যথাসাধ্য আমল করার তাউফিক দান করুন।

আর সর্বশেষ কথা হল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ □, তাঁর পরিবার ও সাহাবা আজমা'য়ীনদের উপর।

("আনসার আল-ইসলাম", আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশ)

সূত্রঃ দাওয়াহ ইলাল্লাহ সাইট ও আনসার আল-ইসলামের ব্লগ

ভারতবর্ষের মুসলিমদের প্রতি মাওলানা আসিম উমার হফিযাহুল্লাহ -এর একটি বার্তা

আপনাদের মহাসাগরে কোনো ঝড় নেই কেন?

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম সর্বশেষ রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর বর্ষিত হোক।

প্রথমেই আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় ও অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়াতাআলা) বলেন:

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَي الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙوَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

"তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে (যথার্থ) পথনির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে করে আল্লাহর রসূল (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করতে পারেন, (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।"[১]

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

"وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰي لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ"

"(হে ইমানদারগণ) তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না (আল্লাহর যমীনে কুফরির) ফিতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে, (হাঁ) তারা যদি (কুফর থেকে) নিবৃত্ত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলাই হবেন তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী।"[২]

---

১. সুরাঃ আল-ফাতহ; আয়াতঃ ২৮

২. সুরাঃ আল-আনফাল; আয়াতঃ ৩৯

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

"(আসলে) আল্লাহ তাআলা যদি (যুগে যুগে) একদল লোককে দিয়ে আরেক দল লোককে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে এই ভূখণ্ড ফিতনা ফাসাদে ভরে যেতো, (কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা চাননি কেননা) আল্লাহ তাআলা এ সৃষ্টিকুলের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল!"[৩]

আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"আল্লাহ আমার উম্মাতের দুই দলকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন; সেই দল যারা আল হিন্দ (উপমহাদেশ) আক্রমণ করবে এবং সেই দল যারা মারিয়াম আলাইহিস সাল্লামের পুত্র ঈসা আলাইহিস সাল্লামের সঙ্গে থাকবে।"

আবু হুরায়রাহ রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে হিন্দ (উপমহাদেশ) বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি এতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হই, তাহলে আমার মাল ও জানের দুটোই এতে ব্যয় করবো। যদি আমি নিহত হই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্যতম হবো। আর যদি আমি ফিরে আসি আমি হবো আবু হুরায়রাহ যে কিনা মুক্ত (জাহান্নাম থেকে)।"

বাজপাখি গেছে উড়ে বন্দীদশা হতে, পাখীদের বলে

কারাগারের ডাণ্ডায় তোমরা নিজেদের করো আঘাত, রক্তে ভিজে উড়ো

নিজেদের শক্তিতে যদি থাকে বিশ্বাস তাহলে করো না ভয়

এ জন্যই যে তুমি গতানুশোচনা করবে এ বয়সে কারাপালের দরজায় ঠুকা দিয়ে

---

[৩]. সূরাঃ আল-বাকারা; আয়াতঃ ২৫১

দিল্লীর মাটি কি একজন শাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী কে জন্ম দিতে পারে না যিনি আবার ভারতীয় মুসলিমদের ভুলে যাওয়া জিহাদের অনুশীলনীর শিক্ষা দিবেন ও তাদের উদ্বুদ্ধ করবেন জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে? সেই দলের কি আর কোনও উত্তরাধিকারী নেই যারা বালাকোটে নিজেদের রক্তে সিক্ত করেছিলো যাদের কুফরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার সাহস আছে ও যাদের সাহস আছে আল্লাহর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার? উত্তর প্রদেশে কি এমন কোনও মা নেই যারা তাদের সন্তানদের এমন ঘুমপাড়ানি গান শুনাবে যা শুনে তাদের সন্তানেরা বাজার, পার্ক ও খেলার মাঠে যাওয়ার পরিবর্তে শামিলির যুদ্ধক্ষেত্র মঞ্চস্থ করবে? শায়খুল হিন্দের পরবর্তীরা কি আজীবনের জন্য হিজরত এবং জিহাদ পরিত্যাগ করলো? বিহারের মাটি কি এতোই অনুর্বর হয়েছে যে আযিমাবাদের মুজাহিদীনের মতো একটি দল তৈরি করতে তারা অক্ষম? কোন ধর্মদ্রোহীর বদ নজর বাংলার মাটি দগ্ধ করেছে যার ফলে ইতিহাস আরেক সিরাজউদ্দৌলা প্রত্যক্ষ করতে পারছে না? ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের মুসলিমগণ যেন পুরোপুরি ভুলে গেছে মহিশূরের সিংহের সেই কথা যা আজও ধর্মদ্রোহীদের ভয়ে কাঁপায় : সিংহের একদিনের জীবন শিয়ালের হাজার বছরের জীবনের চেয়েও শ্রেয়। গুজরাটের মাটি কি এমন হল যেখানে কিনা আগে কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে তাকবীরের আওয়াজ উঠত, যা আজও ওঠে তবে কেন তা সৌমনাথকে ভয়ে কম্পিত করে না? এসব প্রশ্ন ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ন্যায়সঙ্গতভাবে ভারতের মুসলিমদেরকে করতে হবে।

আজ সারাবিশ্বে যখন জিহাদের ডাক দেয়া হচ্ছে এবং এমন সময় যখন প্রত্যেক অঞ্চলের মুসলিমরা তাদের নিজ ভূমিতে জিহাদ শুরু করে দিয়েছেন কুফর ভিত্তিক ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন করতে। তাই আজ শুধুমাত্র আলীমদেরকে প্রশ্ন করা ছাড়াও বিশ্বব্যাপী জিহাদের নেতৃবৃন্দের হিন্দের সাধারণ মুসলিমদের এই প্রশ্ন করার অধিকার আছে যে, হিন্দের সেই মুসলিমরা কোথায়, ইতিহাস যাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে তারা প্রতি যুগে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সত্যের পতাকা আরোহণ করেছিলেন? হিন্দের সেই আলীমরা কোথায় যাদের পূর্ববর্তীরা সবচেয়ে কঠিন অগ্নিপরীক্ষা পড়া সত্ত্বেও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিত্যাগ করেননি? কেন ভারতীয় মুসলিমরা জিহাদের ময়দানগুলো থেকে পুরোপুরি

অনুপস্থিত? হে উম্মাহর যুবকেরা, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভারতীয় অনুসারীরা, দিল্লীর জামে মসজিদের অবস্থান স্মরণ করিয়ে দেয় তার অতীতের কথা। এই জামে মসজিদের সামনে যে লালকেল্লা দাঁড়িয়ে আছে এই সেই একই লাল কেল্লা যেখানে মুসলিমদের পতাকা উড়েছে শত শত বছর জুড়ে তা থেকে হিন্দুরা আজ আপনাদের রক্তের অশ্রু ঝরায় এবং দাঙ্গায় হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে আপনাদের রক্ত প্রবাহিত করাকে সস্তায় পরিণত করেছে। আপনাদের বিজয়ের প্রতীক কুতুব মিনার কি এই বার্তা পৌছানোর জন্য যথেষ্ট নয় যে এই মসজিদই আজীবন শাসন করবে এই ভূমি যা থেকে মুসলিমরা একবার নেমেছিলো? এই মসজিদ এবং যারা এই মসজিদে ইবাদত করেন তারাই এখানের কর্তৃত্বে থাকবে। তারা সেখানের শাসক থাকবে কারণ তারাই আল্লাহতে বিশ্বাস করেন যেখানে বাকীরা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আর যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা কখনও বিশ্বাসীদের উপর শাসক হতে পারবে না। ধর্মদ্রোহীরা কখনও বিশ্বাসীদের শাসন করতে পারে না; আল্লাহর শত্রুরা কখনও আল্লাহর বন্ধুদের চেয়ে বেশি সম্মানিত হতে পারে না। কীভাবে কেউ আপনাদের রক্তপাতের ও জাতিগত নির্মূলকরণের ভয় দেখাতে পারে? আপনারাই পানিপথের রণক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন একবার নয় বরং কয়েকবার। আল্লাহ আপনাদেরকে বুদ্ধি দিয়েছেন। নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিন আপনাদের জন্য কি ভালো ছিলো পানিপথের রক্ত ক্ষয় না আহমেদাবাদ ও সুরাতের দাঙ্গায় রক্ত ক্ষয়? কারা বুদ্ধিমান যারা আমেরিকার কাছে মাথা নত হয়ে নতি স্বীকার করে, না যারা এ যুগের ফিরআউনের মোকাবেলা করে শামিলির রণক্ষেত্রে? না কি তারা যারা কার্যালয় ও পদবী গ্রহণ করেছে মুসলিমদের আদর্শিকভাবে তাদের দাসত্ব করার বিনিময়ে বা যারা স্বেচ্ছায় ফাঁসির কাষ্ঠে গিয়েছে স্বাধীনতা ও সংগ্রামের জন্য? প্রথম উল্লিখিতরা আপনাদের আদর্শ? না যারা তাদের জীবন কাটিয়ে দিয়েছে মাল্টার কারাগারে যাদের শূলে চড়ানো হয় জলন্ত লোহার রডে, তাদের মাদ্রাসাগুলি বিপদে আপতিত করে এবং তাদের পদ কুরবানি করে। হে মুসলিমগণ, দুর্বলতা আপনাদের অজুহাত হওয়া উচিৎ নয়। আমার মুসলিম ভাইয়েরা, এটা এমন একটি বিষয় যা অনুধাবন করা প্রয়োজন। একজনের নিঃশ্বাস ধরে রাখাটাই জীবনের সব কিছু নয়।

জীবনের সবটুকুই সম্ভ্রম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। কোনও জাতি কখনও তাদের শেষ নি:শ্বাস ফেলে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের সম্মান ও উৎসাহ বজায় রাখে। কিন্তু, যদি এই দুই অংশ বাদ পড়ে যায়, তাহলে সেই জাতির মৃত্যু অনিবার্য, যদিও বাহ্যিকভাবে তা দেখে জীবিত মনে হতে পারে এবং আরও হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে। এটাই সেই অন্তর্নিহিত রহস্য যা মাহিশুরের সিংহ আপনাদেরকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছিলেন সিংহের একদিনের জীবন শিয়ালের হাজার বছরের জীবনের চেয়েও শ্রেয়। ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ যদি এই হয় যে বাহ্যিক কিছু ইবাদত করা যাবে কিন্তু কুফরের দাসত্ব করতে হবে, তাহলে ভুলে যাবেন না দিল্লী ও লৌখনো এর সেই ধর্মভীরু পুরুষেরা যারা নিজেদের আবাস ত্যাগ করে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বালাকোটে শাহাদাতকে বরণ করে নিয়েছেন, তারাও এই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতেন। শামিলির মুজাহিদীনরাও একই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু ফকিহ ও হাদিস বিশারদরা শামিলি রণক্ষেত্রে ব্রিটিশদের মোকাবেলা করেছিলেন! হে মুসলিম উম্মাহর যুবকেরা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) পবিত্র কুরআনে বলেনঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

"(আসলে) আল্লাহ তাআলা যদি (যুগে যুগে) একদল লোককে দিয়ে আরেকদল লোককে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে এই ভূখণ্ড ফিতনা ফাসাদে ভরে যেতো (কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা চাননি কেননা) আল্লাহ তাআলা এ সৃষ্টিকুলের প্রতি বড়োই অনুগ্রহশীল!"[১]

তার মানে এই যে, যদি জিহাদ না থাকতো তবে সারাবিশ্ব ফাসাদে ভরে যেতো। পৃথিবীর কোনও কিছুই তার প্রাকৃতিক অবস্থানে থাকতো না। জিহাদ ব্যতীত মানুষ তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য থেকে বিপথগামী হয়ে যায়। তার রক্তক্ষরণ করা হয়। সর্বত্র অন্যায় অবিচার প্রাদুর্ভূত হয়। দুর্বলদের অধিকার বঞ্চিত করা হয় আর সবলরা এমন আচরণ করে যেন তারা প্রভু বনে গেছে। ধনীরা গরীবদের দাসে পরিণত করে। আমার রব

---

১. সূরাঃ আল-বাকারা; আয়াতঃ ২৫১

বলেন,তাহলে এই ভূখণ্ড ফিতনা ফাসাদে ভরে যেতো। ভুলবেন না যে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত ব্যবস্থা দ্বারা বিশ্ব পরিচালনা করার চেয়ে বড় কোনও ফাসাদ নেই। যদি তাই ঘটে, তবে ফাসাদ বাকী সব কিছুর উপর জয় লাভ করবে। মানুষের কথা বাদই দিলাম, এমনকি পশুপাখিরাও বিলুপ্তির সম্মুখীন হবে। জমি ফসল উৎপন্ন করা বন্ধ করে দিবে। কেন? তা এ কারণেই যে পৃথিবীটা আল্লাহর পৃথিবী। পৃথিবী আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) নির্দেশ মেনে চলে। যদি এ পৃথিবীতে আল্লাহর কিতাব দ্বারা শাসন করা না হয়, আর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মানব রচিত সংবিধান অনুসারে...যদি আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা বাদে অন্য কোনও ব্যবস্থা এই পৃথিবীতে জারী করা হয়, পৃথিবী বেদনায় কিলবিল করবে। তা ক্রোধে অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। পর্বতমালা ভয়ে কাঁপতে থাকে পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান অমান্য করায়। বিশ্ববাসীরা যখন তাদের শাসনকর্তা ও প্রতিপালককে ছেড়ে আমেরিকা ও ব্রিটেনকে তাদের শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেয়, তাতে মহাসমুদ্রগুলোও ক্রুদ্ধ হয়। আজ আমেরিকা ও জাতিসংঘ যে আইন পাস করে তা জারী করা হয় অথচ সামান্যতমও ভ্রুক্ষেপ করা হয় না আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আইনের প্রতি।

যদি জিহাদ পরিত্যাগ করা হয়, ভূখণ্ড ফাসাদে ভরে যাবে। শুনুন! শুধুমাত্র পুরুষ নয়...শুধুমাত্র পশুপাখি নয়...শুধুমাত্র শস্য ও পানি ফাসাদে ভরবে না, এমনকি ফুলেরাও তাদের সুগন্ধি থেকে বঞ্চিত হবে। ফুলকুঁড়ি তাদের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবে। ফলমূল তাদের মধুরতা ও স্বাদ হারাবে। না কোনও খাঁটি দুধ পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ পানি। হ্যাঁ, এমনকি বিশুদ্ধ পানিও! প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য শূন্য করে, রাসায়নিক মিশ্রণ করে ও বোতলজাত করে আপনাদের এসবের উপর নির্ভরশীল করা হবে। আমার রব যা ঘোষণা করেছেন তা কতই না সঠিক, "তাহলে এই ভূখণ্ড ফিতনা ফাসাদে ভরে যেতো..." এমনকি বায়ু, জীবনের মৌলিক শর্ত, তার প্রাকৃতিক অবস্থায় বিরাজমান থাকবে না। যদি আপনারা জিহাদ পরিহার করেন...যদি পৃথিবীতে আর খিলাফাহ বহাল না থাকে...যদি এই পৃথিবীতে ইসলামী ব্যবস্থা বহাল না থাকে...যদি পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বহাল না থাকে...যদি এই পৃথিবী আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) কিতাব অনুযায়ী

পরিচালনা করা না হয় যা তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) তার প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি নাযিল করেছেন পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃতি বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নিষ্কাশন করতে এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে- যা হচ্ছে খিলাফাহ - ...তাহলে ভূখণ্ড ফাসাদে ভরপুর হয়ে যাবে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন:

"তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে (যথার্থ) পথনির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে আল্লাহর রসূল (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করতে পারেন, (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তআলাই যথেষ্ট।"

তিনিই আল্লাহ যিনি তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পথ নির্দেশ ও এই ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন যার ভিত্তি সত্য। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন যার ভিত্তি সত্য যাতে করে আল্লাহর রসূল (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করতে পারেন। যে ব্যবস্থা-এর বিপরীত, যে বিধান -এর বিপরীত, তা অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে ও ইসলামকে এর উপর বিজয়ী করতে হবে। যদি কোনও শক্তি সেই পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তবে এ ব্যাপারে আমাদেরকে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

"(হে ইমানদারগণ) তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না (আল্লাহর যমীনে কুফরির) ফিতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে...।"

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা এই ব্যবস্থাকে বাঁধা প্রদান করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের শক্তি সন্দেহাতীতভাবে ভেঙ্গে ফেলা হয় ও তাদের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটানো হয়। তারপর, সারাবিশ্ব জুড়ে জীবন বিধান হবে আল-কুরআন। কিন্তু কোনও ধর্মদ্রোহীকে জোরপূর্বক শাহাদাহ পাঠ করাবেন না। এটা তার পছন্দ। এটা তার সিদ্ধান্ত যে সে একজন মুসলিম হবে নাকি তার পুরাতন ধর্ম পালন করবে। যেহেতু এই পৃথিবী আল্লাহর তাই, এতে আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অতীব জরুরি। এটা জরুরি এ জন্যই যে অবিশ্বাসীরাও প্রাকৃতিকভাবে এতে জীবনযাপন করতে পারবে ও

পৃথিবী ফাসাদমুক্ত হবে। যদি আপনারা জিহাদ পরিহার করেন বা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ না করেন তাহলে খিলাফাহ বহাল থাকবে না। সারাবিশ্ব ফাসাদে ভরে যাবে। পৃথিবী ও তার ভূগর্ভে যা কিছু আছে তা ফাসাদে ভরে যাবে। মনে রাখবেন আপনারা মাসজিদে সালাত পড়াবেন কিন্তু ঐ সময়ও আপনারা বাজনার শব্দ শুনতে পাবেন কারণ শয়তানের ব্যবস্থা এ পৃথিবীতে প্রভাবশালী। পৃথিবীতে এতো পরিমানে ফাসাদ ছড়াবে যে পরিবেশও তার বিশুদ্ধতা ধরে রাখতে পারবে না। পরিবেশ দূষিত ও পরিবর্তন করা হবে। সন্তানরা মাতাপিতার অবাধ্য হবে। "ভূখণ্ড আসলেই ফিতনায় ভরপুর হয়ে যাবে!" ভাই ভাই কে খুন করবে। মায়ের মমতা মায়েদের থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। সবকিছু ফাসাদে ভরে যাবে। এমনকি ভালোবাসাও বিশুদ্ধ থাকবে না। প্রতিবেশীরা অনিষ্টপ্রবণ হবে। সমাজের সম্মানিত বৃত্তাংশ...যেমন আলীমরা তাদেরকে অসম্মান করা হবে। আমার সর্দার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ফাসাদকে বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্ত ও যথাযথভাবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

প্রথমে নবুওয়াত থাকবে যা বহাল থাকবে যতদিন আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) ইচ্ছা, তারপর তার সমাপ্তি ঘটবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন তারপর নাবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ থাকবে যা বহাল থাকবে যতদিন আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) ইচ্ছা তারপর তাতেও সমাপ্তি ঘটবে। এই পর্যায়ের পর স্বৈরশাসিত রাজতন্ত্র থাকবে যা বহাল থাকবে যতদিন আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) ইচ্ছা, তারপর তারও সমাপ্তি ঘটবে। পরবর্তীতে পৃথিবীতে ফাসাদের পর্যায় আসবে, যারপর খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে উসমানী খিলাফাহর অবসানের পরের পর্যায়টাই হচ্ছে ভূখণ্ডে ফাসাদের যুগ। সর্বত্র ফাসাদ বিরাজ করছে। বাণিজ্য সুদের ফাসাদে ভরপুর। বিচারবিভাগ মানব রচিত আইনের ফাসাদে ভরপুর। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই হাদিস আমাদের সুসংবাদ প্রদান করে যে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে এই পর্যায়ের পর যার মাধ্যমে পৃথিবীকে ফাসাদ থেকে পবিত্র করা হবে। পৃথিবীতে ফাসাদের সমাপ্তি ঘটবে। ভূমি আবারও ফসল উৎপাদন করা শুরু করবে। সমৃদ্ধি

পৃথিবীতে ফিরে আসবে। দুর্বলরা ন্যায়বিচার পাবে ও প্রাপ্যরা পাবে তাদের অধিকার। সমৃদ্ধি এতো মাত্রায় হবে যে ভিক্ষা বা দাতব্য গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না।

ওহে যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ভালোবাসেন! সময় কি আসলেই ঘনিয়ে আসেনি যখন আমরা দেখবো আমাদের সর্দার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথাগুলো পূর্ণ হতে? এই বিশ্বে আরেকবার খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসারীরা রণক্ষেত্রে এসে গেছে তাদের জীবন বিসর্জন দিতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠাকরণে। এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণে সবচেয়ে বড়া বাধা আমেরিকা আফগানিস্তানে তাদের জখম চাটছে। যারা আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে তারা আল্লাহর সাহায্যে আমেরিকান প্রযুক্তির সর্বনাশ করে দিয়েছেন। ইরাকের পর খুরাসানের কালো পতাকা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নবী আলাইহিস সাল্লামদের ভূমি, বরকতময় ও বিজয়ের ভূমি সিরিয়ায় কালো পতাকাবাহী মুজাহিদীনরা তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছেন খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) এই জিহাদকে এমন বরকত দ্বারা অলঙ্কৃত করেছেন যে এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে মুজাহিদীনরা এই পর্যায়ে চলে গেছেন যে তারা নুসাইরিদের হাত থেকে মুসলিমদের মুক্ত করার কিনারে পৌঁছে গেছেন। আমেরিকানরা ও অবিশ্বাসী বিশ্বের অন্যান্য শক্তিধররা তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে দেখে আঘাতপ্রাপ্ত। আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) সাহায্যে, আল-কায়িদাহ ও অন্যান্য মুজাহিদীনরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। আফগানিস্তান থেকে কয়েকটি দল সিরিয়ায় গিয়েছে ও তারা সেখানে জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ওহে যারা ভারত ৮০০ বৎসর শাসন করেছেন! হে পৌত্তলিকতার অন্ধকারে তাওহীদের মশালধারীরা! আপনারা কেমন করে ঘুমিয়ে থাকতে পারেন যখন সারাবিশ্বের মুসলিমরা জাগ্রত হচ্ছে! যদি মুসলিম বিশ্বের যুবকেরা রণক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে "হয়তো শরিআহ নয়তো শাহাদাহ" স্লোগানে ও তাদের জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য, আপনারা কেমন করে তাদের পেছনে পড়ে থাকতে পারেন? উসমানী খিলাফাহ রক্ষার্থে

আপনারাই জিহাদে নিযুক্ত ছিলেন। যদি ফিলিপাইন থেকে মরক্কোর মুসলিমরা আশাবাদী হতে পারে, তবে আপনাদের নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। উঠে দাঁড়ান! জেগে উঠুন! সার্বজনীন জিহাদে অংশগ্রহণ করুণ আমেরিকার প্রাসাদ ধরে চূড়ান্ত ধাক্কা দিতে উঠে পড়ুন। এই জিহাদ কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং, এই জিহাদে জীবন উৎসর্গ করা হচ্ছে সর্বত্র আমেরিকা ও তার দোসরদের পরাজিত করতে।

আমার মুসলিম ভাই! সামনের দিকে অগ্রসর হোন! শাসনকার্যের নিয়ম আপনাদের জন্য নতুন কিছু নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী আপনারা সারাবিশ্বকে শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে শাসন করতে হয়। আপনারা মুসলিমদের সম্মান ও গৌরবের পতাকা বহন করেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। সেই মানসে আবারও জ্বলে উঠুন! আবারও সেই ঝড়কে পুনরুজ্জীবিত করুন যা আপনাদের অন্তরে গর্জন করেছে! সময় এসেছে সেই ধাতুনিঃশ্রব জিহাদের অগ্নিশিখা দিয়ে প্রজ্বলনের যা আপনারা নিজেদের অন্তরে দমিত করে রেখেছেন সেই ১৮৭৫ সাল থেকে। এখন সময় দেবত্বের দাবীদারদের দেখানোর যে আপনাদের শিরায় শিরায় এখনও মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম এর রক্ত দৌড়ে। এটা সময় তাদের দেখানোর যে মুসলিম মায়েরা গাওরী ও গাযনাভীর কাহিনী এখনও তাদের সন্তানদের কাছে বর্ণনা করেন। এটা সময় তাদের দেখানোর আওরঙ্গজেব -এর লোককাহিনী এখনও ভারতীয় মুসলিমদের বিবেক জাগ্রত করে এবং মহিশূরের সিংহের বিখ্যাত মন্তব্য এখনও ভারতীয় মুসলিম যুবকদের প্রণোদিত করে মৃত্যুর জন্য-একটি সম্মানিত মৃত্যু। সারা বিশ্বে আজ মুসলিমরা জেগে উঠেছে কুফরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। জিহাদের রঙ্গভূমি এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য। জিহাদের রঙ্গভূমি ভারতীয় মুসলিম যুবকদের অপেক্ষায়। তারা অপেক্ষা করছে আওরঙ্গজেব ও টিপুর সন্তানদের জন্য। মনে রাখবেন: অবিশ্বাসী বিশ্ব যেকোনো মূল্যে আমাদের ধ্বংস করতে চায়। চাই তা গণহত্যার মাধ্যমে হোক বা আমাদের জীবন্ত দগ্ধকরণের মাধ্যমে হোক বা আমাদের সম্পদ লুট করার মাধ্যমে হোক বা 'আমাদের বোন ও মেয়েদের সম্ভ্রমহানীর মাধ্যমে হোক। অবিশ্বাসী বিশ্ব সর্বত্র মুসলিমদের ধ্বংস করতে চায়; চাই বোমাবাজি

করে তাদের ধ্বংস করা হোক বা ড্রোন হামলার মাধ্যমে হোক বা তাদের দারিদ্র্যতার বেড়ি পরিয়ে হোক বা দাঙ্গা উসকানি দিয়ে হোক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"কাফেররা একটি একক জাতি।"

আর তাই তারা আমাদের ধোঁকা দিতে মায়াকান্না দেখিয়ে থাকে। অন্যথায়, বাস্তবে তারা সবাই আমাদের বিরুদ্ধে সজ্ঞবদ্ধ। তারা সবাই একমত আমাদের প্রজন্মগুলি ধ্বংসকরণে ও তাদের দ্বীন বিমুখ করণে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে জিহাদের ডাক আসছে ও ঘোষণা করা হচ্ছে নতুন এক উদয় ঘটেছে মুসলিম উম্মাহর। সম্মানিত বোনেরা যারা তাদের নিজ গায়ে বিস্ফোরক বাঁধেন এবং শত্রুদের সারিতে ঢুকে পড়েন, নিজেদের উৎসাহ জাগানোর জন্য তারা আপনাদের অনুপ্রেরণা । তারা ভারতে তাদের ভাইদের কাছে এই বার্তা পাঠাচ্ছেন যে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) জিহাদে এমন অসাধারণ শক্তি দান করেছেন যে বেয়াল্লিশটি কাফের দেশ তাদেরকে সম্মিলিত ভাবে পরাজিত করতে পারছে না। আমেরিকা তার সকল ড্রোন ও কৃত্তিম উপগ্রহ নিয়ে না পেন্টাগনে নিরাপদ না বাগ্রামে। মাত্র কিছুসংখ্যক শাহাদাত-অন্বেষণকারী যুবক তাদের নিরাপদ স্থাপনগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) সাহায্যে। শুধু একবার তাকিয়ে দেখুন কি ঘটছে ইয়েমেন ও ইরাকে। ইউফ্রেটাস ও টিগ্রিস এর ভূমির যুদ্ধের গানের প্রতিধ্বনিত থেকে অনুপ্রেরণা নিন।

আফগানিস্তান থেকে তাকবীরের প্রতিধ্বনি শুনুন। আপনাদের ভাইয়েরা মরণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত হয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন রণক্ষেত্রে। তারা এ জীবন বিক্রি করছেন জান্নাতের জন্য। তাদের অন্তর্ভুক্ত শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ, এমনকি মা ও বোনেরা। তারা সবাই আপনাদের অপেক্ষায়। তারা সবাই ভারতীয় মুসলিমদের সাথে আছেন। আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রবের শপথ নিয়ে বলছি, আপনারা যদি একবার জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যান, ফিলিপাইন থেকে মরক্কোর মুজাহিদীন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনাদের সাথে দাঁড়াবেন। মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো এবং বিশ্বের প্রতিটি কোণের মুজাহিদীনরা আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন

যেভাবে তারা এই অঞ্চলের মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন অতীত ইতিহাসের ন্যায়। আফগান ভূখণ্ড আপনাদের সাহায্যের ডাকের অপেক্ষায়। আপনারা দেখবেন যেখানে আপনাদের অশ্রু পড়ে সেখানে মুজাহিদীনরা তাদের রক্ত উৎসর্গ করবেন। যে হাত আপনাদের ক্ষতি করতে চাইবে তা একেবারে কেটে ফেলা হবে। আমি হুনাইনের রবের শপথ নিয়ে বলছি, যারা আপনাদের সন্তান ও নারীদের জীবন্ত দগ্ধ করেছিলো মুজাহিদীনরা তাদের আবাসকে পানিপথের রণক্ষেত্রে পরিণত করবেন। শুধুমাত্র একটি বার আপনাদের ভাইদের আহবান জানান। তারা আপনাদের জন্য তাদের সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করবেন কারণ তারা তাদের জীবন বিক্রি করে দিয়েছেন যাতে করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মাহ তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্মান ফিরে পান এবং নিজেদের মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের অর্পণ করেন। তারা এই পথ বেছে নিয়েছেন এ জন্যই যে, এই উম্মাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করছে অবিশ্বাসীদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং নিজেদের জীবন গঠন করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ব্যবস্থা অনুসারে।

হে মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের সন্তানরা! হে আওরঙ্গজেব ও গাযনাভীর উত্তরসূরীরা, উঠে দাঁড়ান ও জিহাদের ময়দানের দিকে অগ্রসর হোন একজন বোনের পর্দা কেড়ে নেয়ার আগে...মুসলিমদের আবারও একত্রে জীবন্ত দগ্ধকরণের আগে। আবারও খিলাফাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণে জিহাদের রঙ্গভূমির দিকে অগ্রসর হোন! সার্বজনীন জিহাদের বাহিনীতে যোগ দিন! আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আপনাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আপনাদের সাহস যোগাবেন! আপনারা যদি এই পথ বেছে নেন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আপনাদের এই জাতিকে সম্মানিত করবেন।

আমাদের শেষ দুআ এই যে সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা জাহানের রব।

কাশ্মীরকে ভুলে যেও না!

শাইখ আইমান আল-জাওয়াহেরী হাফিজাহুল্লাহ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

বিশ্বের প্রতিটি স্থানে অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

আজ আমি আপনাদের সামনে ৭০ বছরের অধিক সময় ধরে চলে আসা একটি ট্র্যাজেডি নিয়ে কথা বলবো। এ কথা কাশ্মিরের মুসলমানদের দুঃখ ও কষ্ট নিয়ে। তারা বহুকাল ধরে হিন্দুদের অত্যাচার ও নির্যাতনের তলে নিস্পেষিত হয়ে আসছে! তাদের এ দুঃখ-কষ্ট হিন্দুদের একার সৃষ্টি নয়। বরং একদিকে হিন্দুদের এ জুলুম-অত্যাচার অন্যদিকে সেক্যুলার পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা; দুদিক থেকেই তারা নিস্পেষিত হয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে।

দুঃখ-কষ্টের এ এক নৃশংস সিলসিলা! আমাদের কর্তব্য, তাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, তাদের কষ্টে ব্যথাতুর হওয়া। আমাদের উপর আবশ্যক, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। আমাদের দায়িত্ব, আমাদের যা আছে সবটা দিয়ে কাশ্মীরের মুসলিমদের সাহায্য করা তাদের শক্তিশালী করা।

নিশ্চয়ই তাদের ব্যথা আমাদেরই ব্যথা। তাদের শরীরের লাগা প্রতিটি আঘাত, আমাদের শরীরে ক্ষত তৈরি করে। তাদের উপর চলা এ জুলুম-নির্যাতন আমাদেরই উপর চলা জুলুম-নির্যাতন। তাদের মান-সম্মান ধূলিস্মাৎ হওয়ার অর্থ আমাদের মান-সম্মান ধূলিস্মাৎ হওয়া। কাশ্মীর আমাদের হৃদয়ের জীবন্ত দগদগে একটি ক্ষতের নাম। যে ক্ষত থেকে অনবরত রক্ত ঝরে যাচ্ছে। আমাদের এ হৃদয়ে এমন কত ক্ষতই না ব্যথা দিয়ে যাচ্ছে!

এ কথাটি স্পষ্ট করে দেয়া আমাদের উপর কর্তব্য যে, কাশ্মীরের উপর যে কোনো ধরনের জুলুম-নির্যাতন করার অর্থ আমাদের উপর জুলুম-নির্যাতন। কাশ্মীরের উপর করা প্রতিটি সীমালঙ্ঘন আমাদের উপর করা সীমালঙ্ঘন। যেমনিভাবে পৃথিবীর বুকে যে কোনো জায়গাতে মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘন করা যেন কাশ্মীরের উপর সীমালঙ্ঘন করা।

আমরা এক উম্মাহ। এসব ঠুনকো ভৌগোলিক-সীমানা আমাদের আলাদা করতে সক্ষম নয়। জাতীয়বাদী বিবাদ আমাদের মাঝে বিভেদ ঘটাতে সমর্থ্য নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ

'এই যে তোমাদের জাতি এটাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব আমার ইবাদাত কর।'[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

'এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাচীরের মত, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। (এ বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো একটার মধ্যে আরেকটা প্রবেশ করে মিলিয়ে দেখালেন।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ. يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

"সকল মুসলমানের রক্তের পবিত্রতা সমান। একজন সাধারণ মুসলিমও যদি কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সকলের দায়িত্বে বর্তায়। এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে দূরতম ব্যক্তিটিও তাদের প্রত্যেকের ডাকে সাড়া দেয়। এবং তাঁরা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক বাহুর ন্যায়।

---

[১]. সুরা আম্বিয়া: ৯২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"পারস্পরিক ভালবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহায়তার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৃষ্টান্ত হলো একটি দেহের ন্যায়; যদি দেহের কোন অঙ্গ ব্যথার অভিযোগ করে, তবে পুরো দেহ রাত-জাগরণ ও জোরের মাধ্যমে সে ব্যথায় সাড়া দেয়।

এই কারণেই আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ানদের বিতাড়িত করার পর আরব মুজাহিদরা কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, পাকিস্তান সরকার এবং আমেরিকার আজ্ঞাবহ তাদের সেনাবাহিনী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল।

রুশ ভল্লুকদের চলে যাওয়ার পর পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনী আরব মুজাহিদদের সাথে খুবই অমর্যাদাকর ও কলঙ্কজনক আচরণ করেছে। এরপর তারা একই ধরনের কলঙ্কজনক ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ করেছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান, ও ইমরাতে ইসলামিয়ায় থাকা মুহাজির ও মুজাহিদদের সাথে। একই আচরণনীতি তারা অবলম্বন করেছে এবং করছে কাশ্মীরের মুজাহিদদের সাথে।

পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনী নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও সুবিধা হাসিলের জন্য মুজাহিদদের ব্যবহার করতে চায়। এরপর স্বার্থ হাসিল হয়ে গেলে তাদের পরিত্যাগ করে বা তাদের বিতাড়িত করে দেয়, দিনশেষে বিশ্বাসঘাতকদের পকেট ঘুষ ও হারাম সম্পদে ভরপুর হয়ে যায় কানায় কানায়।

পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইমারাতে ইসলামিয়া ও মুজাহিদদের বিভিন্ন তথ্য ক্রুসেডারদের সরবরাহ করে তাদের সাহায্য করেছে। এরা আল-কায়েদা ও ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের গ্রেফতার করে তাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, এরপর ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দিয়েছে মুজাহিদদের। পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের জেলখানায় অনেক মুজাহিদকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে। এসকল গোয়েন্দা সংস্থার আসল পরিচয় হচ্ছে, এরা আমেরিকানদের সেইফ হাউজ থেকে শুরু করে গোপন কারাগারে প্রবেশিধার, লজিস্টিক রুট ও সরঞ্জামসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়েছে।

ক্রুসেডারদের নিরাপদ রাস্তায় আফগানিস্তান পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এ সংস্থাগুলো। আর তাদের থেকে ঘুষ নিয়ে নিজেদের পকেটে পুরেছে।

এ সংস্থাগুলো ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা করবে, মুসলমানদের প্রতিরক্ষা অথবা মুসলিম ভূমির এক বিঘত হলেও মুক্ত করবে—এগুলো আকাশ কুসুম কল্পনা। ভারতের সাথে তাদের দ্বন্দ্বটি মূলত ভৌগলিক বর্ডারগুলো নিয়ে এবং আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সেক্যুলারময় সংঘর্ষ।

কিছু মানুষ ধারণা করে আমেরিকান ও পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার মাঝে বেশ পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু তাদের মধ্যে ঠিক তেমনি পার্থক্য বিদ্যমান যেমনটি এক ছিঁচকে চোর এবং চোরদের বড় সর্দারের মাঝে থাকে।

চোরদের সর্দার ছিঁচকে চোরকে বলে: আমি তোমাকে অনেক টাকা খাইয়েছি, কিন্তু তুমি এর বিনিময়ে আমার জন্য খুব কমই করেছো।

তখন ছিঁচকে চোর জবাব দেয়: তুমি আমাকে সামান্য টাকা দিয়েছো কিন্তু আমি তোমার জন্য অনেক কিছু করেছি।

তবে চোরদের সর্দারের সাথে ছিঁচকে চোরের আনুগত্য বজায় থাকে সবসময় এবং অনবরত ছিঁচকে চোর সর্দার চোরের জন্যই কাজ করে যায়।

পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আমেরিকাকে অভিযোগ করে: তুমি ভারত ও তাদের সংস্থাগুলোকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সীমা অতিক্রম করেছো।

আর আমেরিকানরা পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ও তাদের সেনানায়ককে উত্তর দেয়: আমরা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে এবং গোপনে ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের অর্থ প্রদান করেছি, কিন্তু যারা আমাদের ও আমাদের এজেন্টদের হত্যা করছে তোমরা তাদের কিছুই করছো না।

যাই হোক, দুই পক্ষের পারস্পারিক সম্পর্ক ক্রমেই উন্নতিলাভ করতে থাকে। চোরদের এই জোট মূলত মুসলিমদের রক্ত, তাদের শরীয়া, এবং তাদের ইজ্জত নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

এখানে, আমি শরিয়াতের আলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ব্যাখ্যা করতে চাই। সেটা হচ্ছে, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ইসলামের শত্রুদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুসলমানদের এবং মুজাহিদীনদের

ফায়দা হাসিল করা জায়েজ, বড় চোর ও ছোট চোরের মাঝে যে মতপার্থক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, অথবা পূর্ব (রাশিয়া) এবং পশ্চিম ব্লকের (আমেরিকা) মাঝে মতপার্থক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, এগুলো কাজে লাগাতে কোনো অসুবিধে নেই ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী।

তবে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের হয়ে কর্মরত এ ছিঁচকে চোর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করা, নিজদের গোপন বিষয়, নিজেদের লক্ষ্য, নিজেদের সিদ্ধান্ত তাদের কাছে নিবেদন করা একটি নিশ্চিত দুর্যোগ থেকে কোন অংশে কম নয় এবং এটি স্পষ্টভাবে শরীয়াহর লজ্ঘন, এটি সুস্পষ্টভাবে শরীয়াহ নিষিদ্ধ কাজ।

পাকিস্তানী সরকার এবং সেনাবাহিনী যদি দাবী করে থাকে যে তারা আমেরিকান পলিসির বিরুদ্ধে কাজ করে, এবং তারা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকার পরিচালনা করছে, তবে আমি তাদের কাছে দুটি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই:

পাকিস্তান সরকার ও তার সেনাবাহিনী কি পারবে, পাকিস্তানের আকাশসীমায় মার্কিন ড্রোন ওড়া বন্ধ করতে?

পাকিস্তান সরকার ও তার সেনাবাহিনী কি পারবে, পাকিস্তানের ভূখণ্ড দিয়ে পরিচালিত আফগানিস্তানে অবস্থানরত মার্কিন সেনাবাহিনীর নিরবিচ্ছিন্ন রসদ সরবরাহ বন্ধ করতে?

পাকিস্তান সরকার এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কাশ্মীরকে মুক্ত করার ব্যাপারে বিশ্বস্ত নয়। কারণ তাদের ইতিহাস ব্যর্থতা, পরাজয়, দুর্নীতিতে ভরা। বরং তারা তো বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশির চেয়ে বেশি তারা এটা আশা করে যে, তারা বিগত ৭০ বছরের ক্ষয়ে যাওয়া পাকিস্তানের দুর্নীতি ও দু:খ-কষ্ট তারা কাশ্মীরে রপ্তানী করতে পারবে।

বিধি প্রণয়নগত বিশৃংখলা, রাজ নৈতিক বিশৃংখলা, নৈতিক বিশৃংখলা, আর্থিক বিশৃংখলা, এসবে সম্মিলিত এক যৌথ প্যাকেজ!

মুসলমানদের প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কালো উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। এ হলো সেই সেনাবাহিনী; যারা আফগানিস্তানকে ধ্বংস করতে আমেরিকাকে সাহায্য করেছিল, যারা বাংলাদেশকে ভারতের কাছে সমর্পণ

করেছিলো, যারা বেলুচিস্তানের মুসলিমদের গণহত্যা করেছিলো, যারা ওয়াজিরিস্তান ও সোয়াতের মুসলমানদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করেছিল। এমন বাহিনীকে কোন জায়গায় মুসলমানদের প্রতীরক্ষা করবে এ আশ্বাস করা যায় না তাদের উপর।

অতএব, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জিহাদ নয় বরং কাশ্মীরের জিহাদকে "আল্লাহর পথের জিহাদে" পরিণত করার জন্য প্রথম জরুরি পদক্ষেপ হলো, পাকিস্তান-গোয়েন্দা সংস্থার থাবা থেকে কাশ্মীরের জিহাদকে মুক্ত করা।

এই মুক্তি অর্জনের পর, শরিয়তের নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত মুক্ত ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মুজাহিদিনকে তাদের জিহাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

আমি মনে করি যে, কাশ্মিরে মুজাহিদীন এ পর্যায়ে ভারতীয় সেনা ও সরকারের উপর অবিচলিত বোমা হামলার জন্য এককভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। যাতে করে ভারতীয়দের হত্যা করা যায়, ভারতীয় অর্থনীতিতে ধ্বস নামানো যায়, ভারতকে তার জনশক্তি ও সরঞ্জামগুলোতে স্থায়ী ক্ষতি ভোগ করানো যায়। আর এর উপরে মুজাহিদিনকে ধৈর্য ধরে চলতে হবে। সাথে সাথে তাদের ইসলামি বিশ্বের মুসলিম ভাইদের সাথে যোগাযোগের শক্তিশালী চ্যানেল স্থাপন করতে হবে।

কাশ্মিরের মুজাহিদিনকে জিহাদের বিভিন্ন ময়দানের জিহাদী জাগরণ থেকে শিখতে হবে, উপকৃত হতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন ময়দানের মুজাহিদদের সাথে তাদের অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে। এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন তাদের আহবান সবার কাছে পৌঁছায়, যাতে পুরো উম্মাহর মাঝে ব্যাপকভাবে কাশ্মীরের জিহাদ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় এবং এর ধারাবাহিক অগ্রগতি সফলতা লাভ করে।

অবশ্যই পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ হলো, পাকিস্তানে আমেরিকার প্রধান সাহায্যকারী। তারা মুজাহিদিনকে এই পদ্ধতিতে কাজ করতে দেবে না কিছুতেই। তারা চাইবে মুজাহিদরা যেন চিরতরে রাজনৈতিক দরকষাকষির হাতিয়ার হিসাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কাশ্মীর, পাকিস্তান, এবং বিশ্বজুড়ে সকল মুজাহিদদের অবশ্যই শরীয়াহর আলোকে তাদের জিহাদ পরিচালনা করা উচিত এবং এটা খেয়াল রাখা উচিত, যেন কখনো মুসলমানদের পবিত্রতা লঙ্ঘন না হয়ে পড়ে।

কোন ভুল সংঘটিত হয়ে গেলে অবশ্যই তা সংশোধন করতে হবে। মুসলিমদের রক্ত ও তাদের সম্মানের বিষয়টি হালকাভাবে বিবেচনা করা যাবে না। পিতা মুরতাদ হওয়ার ব্যক্তি পুত্রকে শাস্তি দেওয়া অথবা নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে অথবা দুর্বল সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নিরাপরাধ লোককে হত্যা কোনো ভাবেই হতে দেয়া যাবে না। মসজিদ, মুসলমানদের বাজার এবং সমাবেশের জায়গাও এলোপাতাড়ি বিস্ফোরণের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না।

এই অপরাধগুলো মুজাহিদদের ভাবমূর্তি বিকৃত করে এবং মুসলিম জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে মূল বিষয়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং তাবা স্থানীয় সরকার ও ক্রুসেডার নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার প্রপাগান্ডার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন মিডিয়া জিহাদকে বিকৃত করতে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘটিত অসংখ্য অপরাধ ও নৃশংসতাকে যৌক্তিক প্রমাণ করার জন্য এই বিচ্যুতিগুলো কাজে লাগায়।

শরয়ী নির্দেশনা মেনে না চলা একটি মুজাহিদ দলকে হত্যাকারী ও মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণে জড়িত ডাকাত দলে পরিণত করে।

দুর্ভাগ্যবশত, এই সকল বিভ্রান্তি ও ব্যাধি কিছু মুজাহিদিনের মাঝে প্রবেশ করেছে। তাই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে এ ব্যাপারটি মোকাবিলা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

অন্য সবার আগে, সম্মানিত আলিমদের উপর এটি বাধ্যতামূলক। উম্মাহর কাছে সত্যকে স্পষ্ট করা, বিশৃংখলাকারীদের উত্থাপিত আপত্তির অপনোদন করা তাদের কর্তব্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রতন্ত্র থেকে শরিয়াহ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত এবং পাকিস্তানের সংবিধান ও তার বিচারব্যবস্থা শরীয়াহর সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক এ কথা মুসলিম সাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করা আলিমদের কর্তব্য।

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম!

উম্মাহকে স্পষ্ট জানিয়ে দিন, যেমনিভাবে তিন দশক আগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ ছিল; অনুরূপভাবে আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধেও জিহাদ আজ ফরজে আইন। এবং মুজাহিদীন বা যারা মুজাহিদিনের সাথে যুক্ত যদিও তারাও কিছু ভুল করে অথবা এমনকি অপরাধও করে তথাপি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থা লাখ লাখ মুসলমানের বিরুদ্ধে হাজার হাজার জঘন্য অপরাধ করেছে।

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম!

উম্মাহকে স্পষ্ট জানিয়ে দিন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কাফেরদের সাহায্য করবে, সে তাদের মতই কাফের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[১]

উম্মাহকে স্পষ্ট জানিয়ে দিন যে, জিহাদ ও দাওয়াহ ব্যতীত ইসলাম কখনই বিজয়ী হবে না। মিথ্যা গণতান্ত্রিক খেল-তামাসার মাধ্যমে কখনও ইসলামের বিজয় সম্ভব নয়। এ গণতন্ত্রই উম্মাহকে দূরে ঠেলে দিয়েছে শরীয়াহ থেকে।

উম্মাহকে স্পষ্ট বলে দিন যে, আমরা এক উম্মাহ। আমাদের জিহাদ অভিন্ন জিহাদ। ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানকে সহায়তা করা প্রত্যেক আফগানীর উপর ফরজে আইন, এভাবে তাদের প্রতিবেশী এলাকার মুসলমানদের উপরও ফরজে আইন এবং এভাবে সকল মুসলিমদের উপর ফরজে আইন। অ্যামেরিকা ও তার দোসরদের পরাজিত করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত ফরজে আইন হওয়ার এ মাসআলা বৃত্তাকারে সকলের উপর বর্তিত হবে।

উম্মাহকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে যে কাশ্মির, ফিলিপাইন, চেচনিয়া, মধ্য এশিয়া, ইরাক, সিরিয়া, আরব উপদ্বীপ, সোমালিয়া, ইসলামী মাগরেব

---

[১]. সূরা মায়িদা :৫১

এবং তুর্কিস্তানের জিহাদ হলো সকল মুসলমানের উপর ফরজে আইন। যতক্ষণ মুসলিমদের এলাকাগুলো থেকে আগ্রাসী কাফেরদের বিতাড়িত করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন না হচ্ছে ততক্ষণ এ বিধান বজায় থাকবে।

কাশ্মীরে আমাদের ভাইদের বলবো, আল্লাহ এই সত্যের সাক্ষী যে, আমরা আপনাদের ভুলে যাইনি এবং আমাদের সর্বোচ্চ সাধ্য নিয়ে আমরা আপনাদের পাশে আছি। এমনকি যদি দুআই হয় আমাদের একমাত্র সাধ্য, তবে তা-ই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত সুসংবাদে আনন্দিত হোন,

عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

"আল্লাহ আমার উম্মতের দুটি দলকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন: একটি দল হিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং অন্যদল ঈসা ইবনে মরয়িমের সাথী হবে।"

পরিশিষ্ট

গাজওয়াতুল হিন্দ শুরু হওয়ার পূর্বেই আমাদের করণীয়

গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য প্রস্তুতি নিন। বর্তমানে গোটা বিশ্বে মুসলমানরা নির্যাতিত। অসহায়ের মতো মার খাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র। এ থেকে প্রতিয়মান হয়, আমরা খুব শীঘ্রই সে প্রতিশ্রুত মালহামা ও গাজওয়াতুল হিন্দের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এই দুটি যুদ্ধে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বিলুপ্ত হবার আশংকা রয়েছে। তাই ধরে নিতে হবে আপনিও তাদের মধ্যে একজন হতে পারেন। আর যদি বেঁচেও যান, তবুও প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কোন বিকল্প নেই। তাহলে আশা করা যায়, কল্যাণের পথে ধাবিত হবেন। মনে রাখবেন, সবাই কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে না। তাই বলে তারা কি বেঁচে থাকবে না? সুতরাং এই ফিতনাপূর্ণ যুদ্ধে বেঁচে থাকারও প্রয়োজন আছে। কিছুদিন পূর্বে আপনারা জেনেছেন রাশিয়া তার দেশের প্রায় চার কোটি নাগরিকদের ট্রেনিং করিয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কিভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখবে এবং তাদের জন্য মাথাপিছু খাদ্যও বরাদ্ধ করা আছে। তলে তলে পরাশক্তিগুলো ঠিকই তাদের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। তাহলে আমরা অজ্ঞ থাকবো কোন ভরসায়? আমাদের উচিত সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যুদ্ধের অপেক্ষা করা।

এ দিকে সিরিয়ায় শুরু হওয়া যুদ্ধ , যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে ক্রমান্বয়ে গোটা পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। আবার ভৌগলিকভাবে আমরা এমন একটি এলাকায় বসবাস করছি, যেখানে সংঘটিত হবে হাদিসে বর্ণিত সেই প্রতিশ্রুত গাজওয়াতুল হিন্দ। সর্বশেষ যা গিয়ে মিলিত হবে মালহামাতুল কুবরা তথা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে। সুতরাং আমাদের প্রস্তুতিটাও হতে হবে এই উভয় সংকট মাথায় রেখেই। সার্বিক প্রস্তুতিটা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিলে পাঠকদের বুঝতে ও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সুবিধা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন।

১. আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি

১. মুসলিম হওয়ার জন্য কুরআন-হাদিসে যেসব শর্ত বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা যথাযথভাবে মেনে চলার চেষ্টা করা।

২. সকল ফরজসমূহের ব্যাপারে কঠোর ও যত্নবান হওয়া।

৩. সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন মুখস্ত করা। কমপক্ষে নামাজের প্রয়োজনীয় সূরা ও দুআসমূহ এবং সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত ও শেষ দশ আয়াত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দুআসমূহ।

৪. সকলের সাথে লেন-দেন ও দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলা।

৫. ভুলত্রুটি বা কারও সাথে ঝগড়া-বিবাধ ও মনোমালিন্য থাকলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। বেশি বেশি তাওবা-ইস্তেগফার করা।

৬. প্রতিদিন নিয়মিত যতটুকু সম্ভব কুরআন-হাদিস অধ্যায়ন করা।

৭. কুরআন-হাদিস, তাফসিরসহ প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বইপত্রের হার্ড কপি নিজ সংগ্রহে বাড়ির সবচেয়ে নিরাপদ এবং গোপনীয় স্থানে সংরক্ষণ করা।

৮. অশ্লীল সিনেমা, গান, নাটক ও অসৎ সঙ্গ পরিহার করা।

৯. পরিবার-পরিজন ও নিকট আত্মীয়দেরকে এসব ব্যাপারে সতর্ক করা।

২. শারীরিক প্রস্তুতি

১. সব রকমের GMO food বা প্যাকেটজাত খাবার পরিত্যাগ করা।

২. এলোপ্যাথিক ঔষধ বর্জন করা।

৩. ভেষজ ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৪. নিয়মিত শরীরচর্চা করা। বিশেষ করে দৌড়ানো, সাঁতার কাটা ইত্যাদি শেখা।

৫. কমন রোগ যেমনঃ গ্যাসট্রিক, ডায়াবেটিস, জ্বর, মাথা ব্যথা, সর্দি-কাশি ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন গাছ-গাছরা ও ভেষজ ঔষধগুলো বাড়িতে সংরক্ষণ করা।

৬. সাপ্লাইর পানির উপর নির্ভরতা পরিহার করে বাড়িতে টিউবয়েল বা চাপকল বসানো।

৭. নুন্যতম দুই বছরের জন্য সাবান, ব্যান্ডেজ, স্যাভলন, ব্লেড, সুঁই-সুতা, দিয়াশলাই, মোমবাতি,ব্যাটারি চালিত টর্চ লাইট ও ব্যাটারি ক্রয় করে রাখা।

৮. জ্বালানীবিহীন বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থ করে রাখা।

৯. পরিবারের সকলের জন্য কমপক্ষে ২ টি করে রেইন কোর্ট, পর্যাপ্ত পরিমান শীতের গরম কাপড় সংগ্রহ করে রাখা। শূণ্য ডিগ্রি বা মাইনাস ডিগ্রি তাপমাত্রার উপযোগী পোশাক সংগ্রহ করে রাখা।

১০. পরিবারের সকলের জন্য ফিউম মাস্ক বা গ্যাস মাস্ক একটি করে এবং ডাষ্ট মাস্ক পর্যাপ্ত পরিমানে সংগ্রহ করে রাখা। তাহলে বোম্বিং হলে যে গ্যাস নির্গত হবে তা থেকে রক্ষা পাবেন।

১১. বসবাসের জন্য শহর-বন্দর ত্যাগ করে গ্রামে চলে যাওয়া। যত অঁজপাড়া গাঁ হবে ততই ভালো। সবচেয়ে উত্তম হবে পাহাড়ি এলাকা ও প্রাকৃতিক ঝর্না বা অধিক বৃষ্টি হয় এমন এলাকা। অধিক জনবসতিপূর্ণ এলাকা পরিহার করা। (ঢাকা-চিটাগাংসহ সকল বিভাগীয় সিটির ভাই-বোনদের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রইলো।)

১২. যারা একত্রে বসবাস করবেন, তাদের নিরাপত্তার জন্য সকল নিরাপত্তাজনিত জিনিসপত্র হাতের কাছেই কোথাও লুকিয়ে রাখা।

১৩. সকল পুরুষ সদস্য একত্রে ঘুমাতে কিংবা কোথাও সফরে না যাওয়া। গ্রুপ করে পালাক্রমে পাহারা দেওয়া। গ্রুপ করে ঘুমাতে যাওয়া ও বাহিরে যাওয়া।

১৪. আশেপশের জনপদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বাইসাইকেল সংগ্রহ করে রাখা। দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য নিজেদের মধ্যে কোন পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করা।

১৫. ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করার অভ্যাস করা।

১৬. মাটির নিচে ঘর তৈরি করা। বাড়ি থেকে সহজে বের হওয়ার পথ তৈরি করে রাখা।

১৭. তাবু তৈরির সরঞ্জাম ব্যবস্থা করে রাখা।

১৮. নিজ এলাকার অবসরপ্রাপ্ত বা কর্তব্যরত ডিফেন্স বাহিনীর সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার চেষ্টা করা।

১৯. পাড়ায় পাড়ায় সেচ্ছসেবক টিম গঠন করার চেষ্টা করা।

৩. মানসিক প্রস্তুতি

১. এ যুদ্ধের শুরুতেই গোটা পৃথিবীর ইন্টারনেট, মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হতে পারে। ফলে দেশ-বিদেশে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি পরিবারের কেউ যদি প্রবাসে বা এলাকার বাহিরে থাকে, তবে তার সাথেও চিরদিনের মতো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা।

২. বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আমদানিকৃত পণ্য, বিদেশে উৎপাদিত জরুরি ঔষধ ও যন্ত্রপাতি আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আপনার কাছের মানুষজন যারা ঔষধের উপর ডিপেন্ডেন্ট, তারা চিকিৎসাহীনতায় ভুগবে এবং ইমারজেন্সি রোগীরা এক পর্যায়ে মারা যাবে। এ জন্যও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা।

৩. চারিদিকে মৃত্যু, লাশ এবং বিভিন্নরকম অঘটন শুনতে পাবেন যা এখন কল্পনাতেও আসে না। এমন সব অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য মনকে শক্ত করা।

৪. নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তীব্র সংকট শুরু হবে। চাল, ডাল, তেল, লবনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দুর্লভ হয়ে যাবে। আপনার কাছে টাকা থাকবে হাজার হাজার, কিন্তু ঐ টাকার বিনিময়েও আপনি জিনিসপত্র কিনতে পারবেন না। ফলে পারিবারিক খাদ্যসংকট কিভাবে সামাল দেবেন তা চিন্তা করা। মনকে শক্ত রাখা। কারণ, এ সময় আপনি ভেঙ্গে পড়লে বাকিরাও টিকতে পারবে না।

৫. হয়তো নিজ পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য মারা যাবে, আহত হবে, অসুস্থ হয়ে পড়বে, নিখোঁজ হয়ে যাবে, এসব কিছুর জন্যও মনকে প্রস্তুত রাখা।

৬. এ জাতীয় যে কোন সমস্যাই আসুক না কেন, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত থেকে গাফেল হওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে এই দুনিয়াটাই পরীক্ষার ক্ষেত্র। এ ধরনের বিপদ-আপদ দিয়ে আসলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের যাচাই করছেন, আমরা জান্নাতের উপযুক্ত কিনা।

৭. প্রচণ্ড অভাবের তাড়নায় আপনার বাড়িতে লুটপাট হতে পারে, হিংস্র হয়ে উঠতে পারে আশেপাশের মানুষগুলো। তাই আসন্ন পরিস্থিতি সামাল দিতে আপনার প্রতিবেশীদের এ ব্যাপারে এখনই বুঝাতে হবে।

তাদেরকে নিয়েই পরিকল্পনা করতে হবে। যতটা সফল হবেন, পরবর্তীতে ততটাই নিরাপদ থাকতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনরাও একত্রে গ্রুপ হয়ে বসবাস শুরু করা।

৮. ভৌগলিকভাবে আমরা গাজওয়াতুল হিন্দের মাঝামাঝি এলাকায় বসবাস করছি। সুতরাং শত্রুপক্ষ থেকে আক্রান্ত হওয়া প্রায় নিশ্চিত। আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করা সকলের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রতিরোধ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখা। দেশীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা।

৯. জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষনিকভাবে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে বা হিজরত করার প্রয়োজন পড়তে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, অন্য এলাকা থেকে আপনার এলাকায় লোকজন নিরাপত্তার বা আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসতে পারে। সুতরাং মুহাজির বা আনসার উভয়টির জন্যই হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর মতো প্রস্তুত থাকা।

৪. মূল জিহাদের প্রস্তুতি

১. ময়দানে দৈনিক/নিয়মিত গোসলের কোন ব্যবস্থা থাকে না। তাই মাসে ১/২/৩ বার গোসলের অভ্যাস করা। অন্যথায় ময়দান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হবেন।

২. বেশী করে কাঁচা মরিচ খাওয়ার অভ্যাস করা জরুরি। যাতে আপনার রক্ত খেয়ে ডেংগু মশা নিজেই মারা যায় এবং আপনি ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে পারেন। ময়দানে ম্যালিরিয়ার চিকিৎসা খুবই কষ্টকর।

৩. পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে বেশি বেশি হাঁটার অভ্যাস করা। ময়দানে পায়ের গোড়ালির চেয়ে পায়ের পাতায় বেশি ভর দিয়ে চলতে হয়। পায়ের গোড়ালির চেয়ে পায়ের পাতার ব্যবহার বেশি হয়। তাই ভারী বস্তুসহ প্রচুর দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

৪. সংক্ষিপ্ত ও শুকনো খাবার এবং পানি ছাড়া দ্রুত খাওয়ার অভ্যাস করা।

৫. ঠান্ডা ও গরম উভয় মৌসুমে মোটা কাপড় ও মোটা চামড়ার উঁচু জুতা ব্যবহারের অভ্যাস করা এবং সেই মোটা/ময়লা (তবে পবিত্র) কাপড়ে ঘুমানোর অভ্যাস করা।

৬. আলো ও প্রচণ্ড আওয়াজের মাঝে জুতা পায়ে থাকাবস্থায় কম ঘুমের অভ্যাস করা এবং সুস্থ থাকারও অভ্যাস করা।

৭. প্রত্যেক জিহাদপ্রিয় মুমিনদের মা-বাবাসহ পরিবারকে নির্যাতিত মুসলিম বিশ্বের অবস্থা, জিহাদে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি সাহায্যের কাহিনী এবং বিশ্বব্যাপী জিহাদী তৎপরতা ও সফলতা তুলে ধরে কৌশলে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। অন্যথায় পরবর্তীকালে আপনার পরিবার-পরিজনই হবে আপনার পথে প্রতিবন্ধক, হয়ে উঠবে আপনার শত্রু।

৮. জিহাদের জন্য অর্থ বা কাঁচা সোনা সংগ্রহ করে জমা রাখতে হবে। মুজাহিদদের অর্থ সংকট বেশি। কারণ কুফরি বিশ্ব তাদের সকল লেনদেনের মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে, যাতে মুজাহিদরা ইন্টারন্যাশনালভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে না পারে।

৫. অর্থনৈতিক ও খাদ্যের প্রস্তুতি

১. নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করা। যেমন: ধান, গম, আলু, শাক-শব্জি ইত্যাদি। কৃষিকাজের মাধ্যমে চাষাবাদ করা।

২. বাড়ির আঙ্গিনায় পুকুর কেটে সেখানে মাছ চাষ করা।

৩. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গবাদীপশু পালন করা। যেমন: গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। হাদিসে আলাদাভাবে এর নির্দেশনা রয়েছে।

৪. টিউবয়েল বা চাপকল মাটির অনেক গভীরে স্থাপন করা। সাধারণত যতটুকু নীচ থেকে পানি উঠে তার চাইতে আরও ৫০-১০০ ফুট নীচে স্থাপন করা। এ ছাড়াও নদী, পুকুর ও ঝর্নার পানি বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করার পদ্ধতি জেনে নেওয়া। টিউবয়েল বা চাপকলের যাবতীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে রাখা।

৫. পর্যাপ্ত পরিমাণ শুকনো খাবার সংগ্রহ করে রাখা। যেমন: চিড়া, মুড়ি, সীম বা কুমড়ার বিচি, বাদাম, ছোলা, কিসমিস ইত্যাদি।

৬. ব্যাংক একাউন্ট, ডিপোজিট বা এ জাতীয় খাতে যত টাকা আছে তা মোটেও নিরাপদ নয়। তাই এগুলো দ্রুত তুলে এগুলো দিয়ে স্বর্ণ কিংবা

গবাদীপশু ক্রয় করে রাখা। মনে রাখবেন, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলে ব্যাংকে টাকা থাকলেও আর তুলতে পারবেন না।

৭. বাড়ির আঙ্গিনা কিংবা বাসস্থানের আশেপাশে পর্যাপ্ত পরিমান ফলগাছ রোপন করা।

৮. বাচ্চাদেরকে এখন থেকেই চিপস, চকলেট ও আইসক্রিম জাতীয় খাবার থেকে বিরত রাখার অভ্যাস করা।

৯. পর্যাপ্ত পরিমান শুকনো লাকড়ির ব্যবস্থা করে রাখা।

উপরে যেসব প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে, তা কেবল মৌলিক ধারণা দেওয়ার জন্য। এলাকাভেদে উক্ত প্রস্তুতিতে কম-বেশি হতে পারে। তা নিজেই চিন্তা-গবেষনা করে বের করতে হবে। সর্বশেষ যে কথাটি বলে রাখতে চাই, তা এখনই বলে রাখি। প্রযুক্তি ধ্বংস হবার ফলে হয়তো উপযুক্ত সময়ে তা জানাতে পারবো না।

মনে রাখবেন, মালহামা তথা মহাযুদ্ধের পরপরই দাজ্জাল বের হবে। বের হবার দুই, তিন বছর আগে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্য-শষ্য উৎপাদন কমে যাবে। শেষ বছর একেবারেই খাদ্য উৎপাদন হবে না। আর সে তখন রুটির পাহাড় বা ত্রাণ নিয়ে হাজির হবে। ঘরে ক্ষুধার্ত স্ত্রী-সন্তান রেখে সে ত্রাণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা বড়ই কঠিন পরীক্ষা। আর এ মুহূর্তে যদি ধৈর্য ধরতে পারেন, তাহলে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবারের জিকির আপনার ক্ষুধা দূর করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তার রহমত ও বরকতে ঢেকে রাখুন। আমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে পৌঁছে দিন। আমিন।

বি. দ্র.: হয়তো জানা-অজানা আরও অনেক ভীতিকর পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাই ধৈর্য্য হারাবেন না। অচিরেই সুদিন আসবে ইনশা আল্লাহ। নাসরুম-মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব।

সমাপ্ত

আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গাযওয়াতুল হিন্দের অঙ্গীকার করেছেন। আমি তা পেলে তাতে আমার জান ও মাল উৎসর্গ করে দিব। যদি শহীদ হয়ে যাই, তবে আমি উত্তম শহীদ হব, আর যদি ফিরে আসি, তবে আমি আবু হুরাইরাহ (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত। [আস সুনানুল মুযতাবা ৬/৪২ কিতাবুল জিহাদ, বাব- গাযওয়াতুল হিন্দ, হাদিস ৩১৭৩,৩১৭৪ । আস সুনানুল কুবরা লিননাসায়ী ৩/২৮, বাব- গাযওয়াতুল হিন্দ হাদিস ৪৩৮২,৪৩৮৩। আল জিহাদ, পরিচ্ছেদ- নৌ যুদ্ধের ফযিলত, ২/৬৬৮, হাদিস ২৯১]

গাযওয়াতুল হিন্দ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জবাননিসৃত দুটি শব্দ। ১৪০০ বছরের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস জড়িয়ে আছে মধু মাখা শব্দ যুগলে। কাঙ্খিত স্বপ্ন পুঁজি করে কত সাহাবী ও তাবেয়ী লহু লাল ঝরিয়েছেন এই পবিত্র মাটিতে। নাম না জানা কত তাবেয়ী ও আইম্মাহ জীবনের শেষ রক্তটুকু উৎসর্গ করেছেন এই হিন্দের মাটিতে। লাখো কোটি মুসলিম এই পবিত্র মাটির বরকত উসিলায় পেয়েছেন শহিদ-গাজীর মর্যাদা। ইনশাআল্লাহ এ লড়াই চলবে। কেয়ামত অবধি চলবে সভ্যতার এ সংঘাত। পৃথিবীতে হক ও বাতিলের, সত্য ও মিথ্যার, আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চিরন্তন ও আপোষহীন। ইসলামের শুরুলগ্ন থেকেই দানা বেঁধেছে হক ও বাতিলের চিরন্তন সেই সংঘাত। সর্বপ্রকার বাঁধা বিপত্তি, বিরোধিতা ও আক্রমণের ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে ইসলাম সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছে। ঠিক তেমনই ইতিহাসের এই অন্তিমলগ্নে আপনার ও আমার অবস্থান কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। ইসলামকে কফিনবদ্ধ করে যখন শেষ পেরেকটি এঁটে দেয়া হচ্ছে এমন সময়ে আমার আপনার অবস্থান কোনো নিছক ঘটনা প্রবাহ নয়। বরং আলিমুন হাকিম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোন কিছুই খেলতামাশা নয়। অবশ্যই আপনার আমার অবস্থানের পেছনে রয়েছে ঐশী ভাবধারার এক গভীর অন্তমিল। দিলের কান দিয়ে, গভীর নিঃশ্বাস ফেলে, আঁখিদ্বয় বন্ধ করে অন্তত একবার চিন্তা করুন, কেন? কোন ঐশী প্রেক্ষাপটকে বাস্তবায়নের জন্য উম্মাহর বাহাত্তুর লগ্নে আপনাকে প্রেরণ করেছেন?

প্রকাশনায়
শায়েখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম রিসার্চ সেন্টার